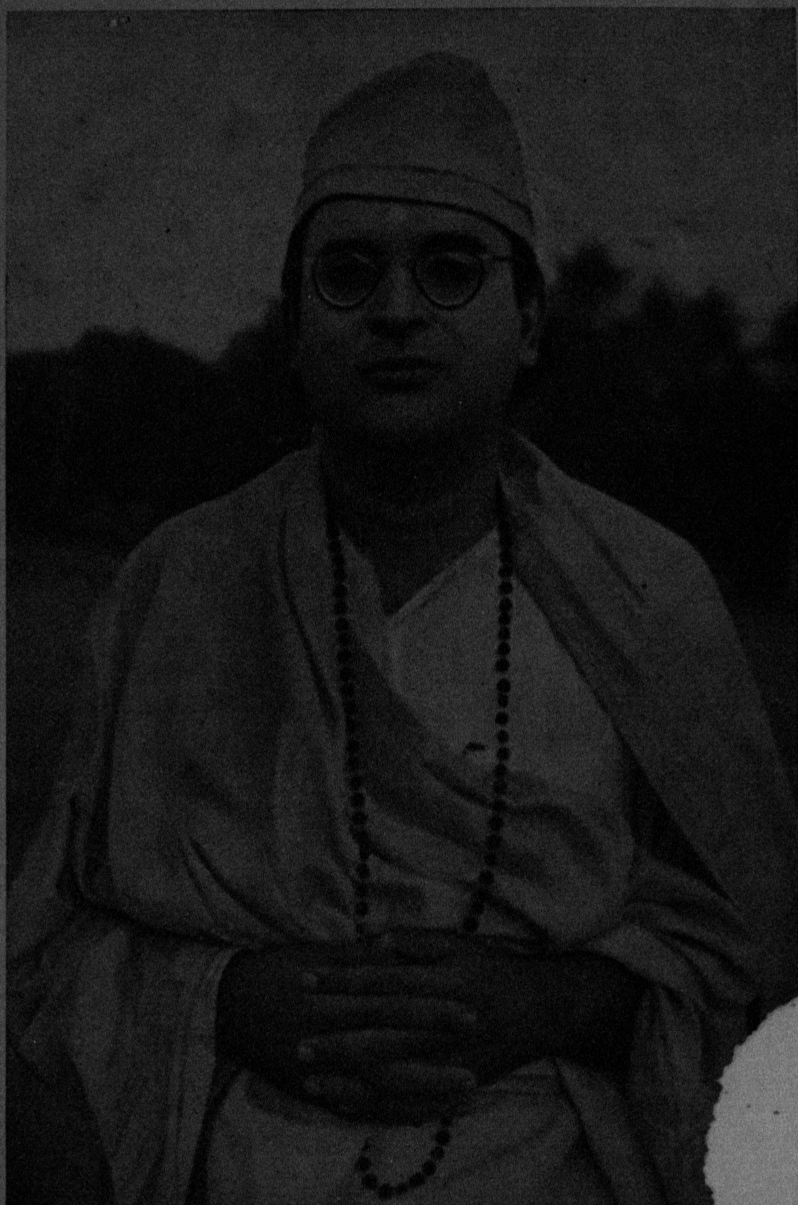
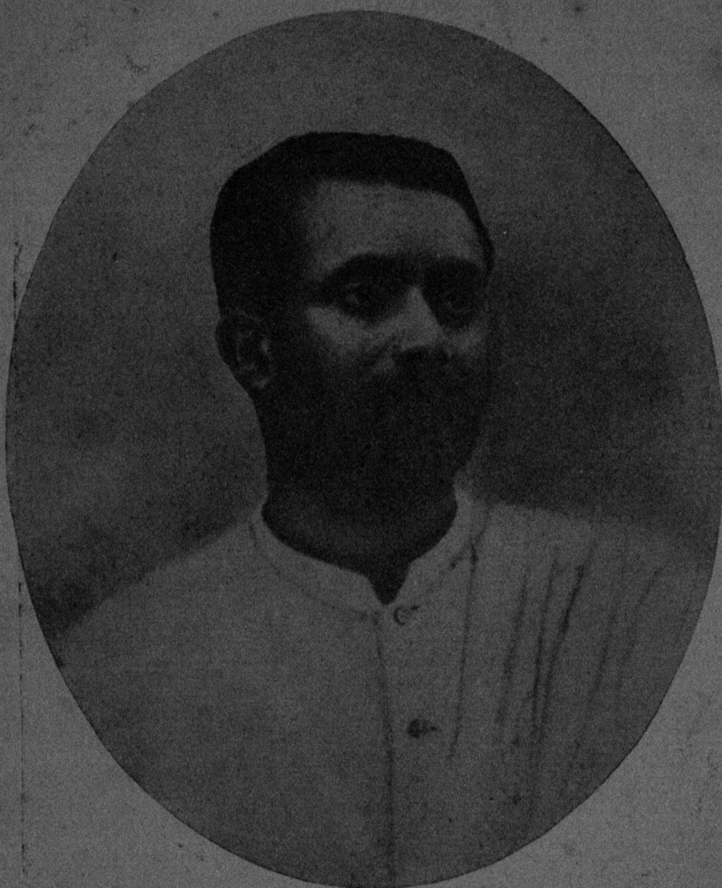
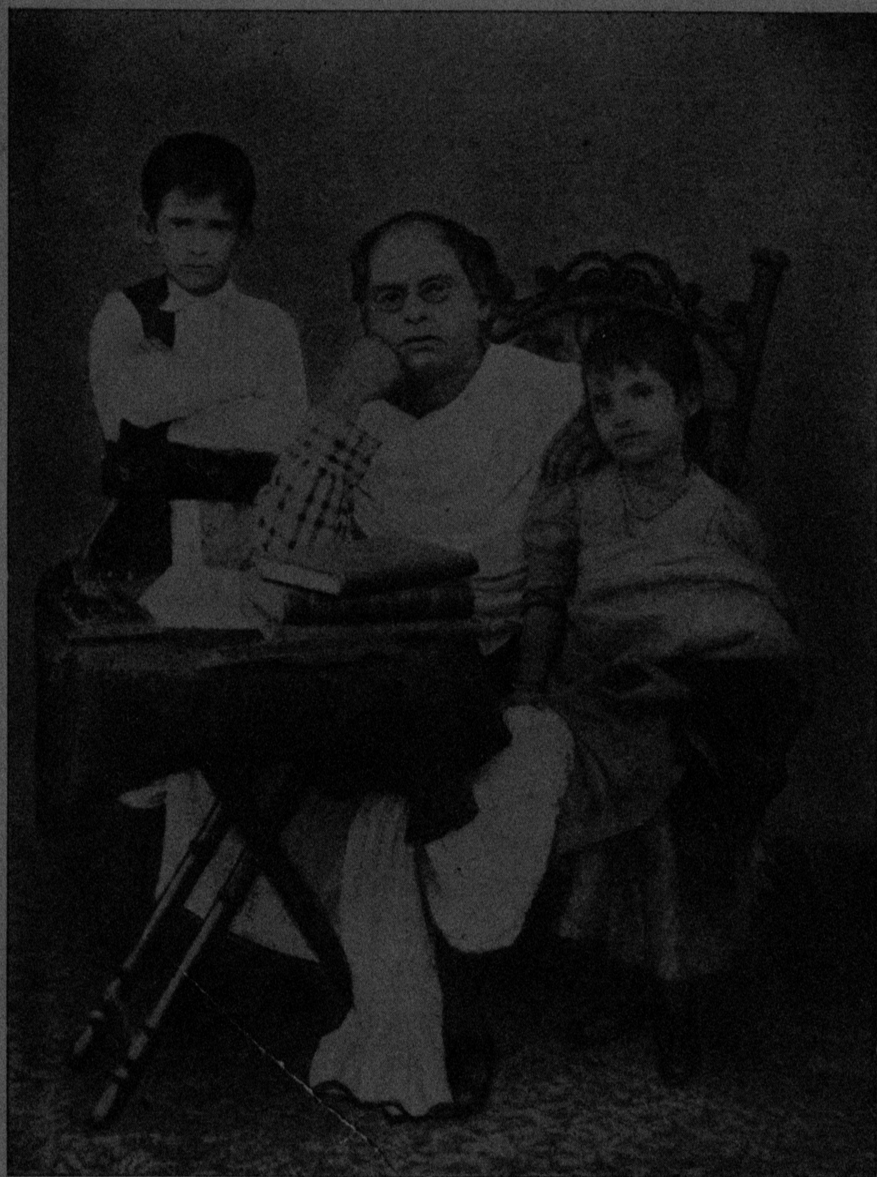


দীলিপকুমার রায়



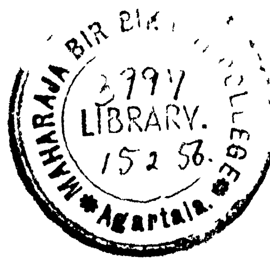
গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল



দিলীপ দ্বিজেন্দ্রলাল মায়া

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল



শ্রীদিলীপকুমার রায়

—চার টাকা—

ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা হইতে পি. মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রভু প্রেস, ৩০নং
কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

ভাগবত :

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥

ক্ষমতাশালীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম লংঘন করার দৃশ্য দেখা যায়। এ-সাহস কেবল তাঁদেরই সাজে যেমন কেবল আগুনকেই সাজে সর্বভুক হওয়া। তেজস্বীদের পক্ষে অনেক কিছুই দোষের নয়--যা সাধারণের পক্ষে মারাত্মক।

ভূমিকা

ওয়েল্‌স সাহেব একটি বৃহৎ আত্মজীবনী লিখেছেন। তার একটি সমালোচনা পড়ছিলাম। সমালোচক উদ্ধৃত করেছেন জীবনীকারের একটি কথা। উদ্ধৃতিটি হাতের কাছে নেই কিন্তু ছত্রটি এই ধরণের :

Those who do not want to explore an egoism
Should not approach a biography.

"উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল" জীবনচরিতের কোঠায়ই পড়ে। কাজেই এর মধ্যে কবির 'অহং'-এর ইতিহাস থাকতে বাধ্য : শুধু তাঁর নয় তাঁর জীবনীকারেরও। না থাকলে স্মৃতিকথার স্বধর্ম রক্ষিত হ'ত না। কারণ স্মৃতিকথা—reminiscences—স্মরণীয়কে বড় ক'রে তোলে নিজের স্মৃতির 'পরে ভর ক'রেই তো। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবির চরিত্র ফুটিয়ে তুলবার জন্যেই স্মরণকর্তার নিজেকেও খানিকটা আঁকতে হয়েছে। কেউ কেউ আমাকে এ বিষয়ে ভুল বুঝতে পারেন ভেবেই ব'লে রাখা।

কিন্তু আরো একটি বৃহত্তর ভুলবোঝার সম্ভাবনা রয়েছে ব'লে অনেক ভেবেচিন্তে শেষটায় এ সম্পর্কে যা মনে হয় খোলাখুলি লেখাই ভালো মনে করছি : যাঁরা আমার প্রতি বা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি স্বভাবতই বিমুখ তাঁদের জন্যে নয়—যাঁরা স্বভাবে নিরপেক্ষ ও সত্যসন্ধী তাঁদের জন্যেই বিশেষ ক'রে।

প্রথম কথা এই যে, আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত আমি সত্যনিষ্ঠ হ'তেই চেয়েছি। "মিথ্যা কথা কখনো বলি না" একথা বলতে পারেন কেবল যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়—আমি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে "চাই" এইটুকুই বলব, এ-আদর্শ সর্বত্রই পালন করতে "পারি" বললে গোড়ায়ই হবে সত্যের অপলাপ। জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই রোখের মাথায় অত্যুক্তি অতিরঞ্জন মিথ্যাভাষণ এসবই করেছি যদিও পরে সেজন্যে অনুতপ্ত হয়েছি এবং যেখানেই কারুর 'পরে অবিচার করেছি ব'লে মনে হয়েছে অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছি জানা সত্ত্বেও যে তাঁরা ক্ষমা করবেন না—কেউ কেউ করেন নি আজো। কিন্তু তবু একথা বললে সেটা মিথ্যাভাষণ হবে না যে আমি স্বভাবে সত্যাশ্রয়ী ও সত্যসন্ধানী। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আমার যা সত্য মনে হয়েছে তা-ই লিখেছি যা তিনি নন ভক্তিবশেও তাঁকে সে-পদবী দিতে চাই নি। কারণ পিতৃভক্তির চেয়ে সত্যনিষ্ঠা আমার কাছে

বড়। ,তাই নানা সময়ে নানা লোকের সঙ্গে তর্ক পর্যন্ত করেছি যখন তাঁর কোনো ভক্ত ভক্তির বশে তাঁকে অন্য কারুর 'চেয়ে কোনো বিষয়ে বড় বলেছেন, অর্থাৎ যেখানে আমার মনে হয়েছে দাবিটা সত্যভিত্তি নয়। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই যেখানে তাঁকে অন্যকারুর চেয়ে কোনো বিষয়ে বড় ব'লে আমার দৃঢ় ধারণা সেখানে আমি সেকথাও অকুতোভয়েই বলেছি—বলা উচিত মনে করি ব'লে। এতে অনেক সময়ে অনেকে রুষ্ট হয়েছেন—কিন্তু তবু লোকাচার মেনে, বা বহুর বিরাগভাজন হবার ভয়ে, যা আমার সত্য মনে হয়েছে তাকে গোপন করিনি। কেন না করলে সেটাই হ'ত মিথ্যাচার।

কথাটা প্রধানত ওঠে তাঁর স্বরপ্রতিভা নিয়ে। আগেকার সঙ্গীতের রসে আমি পুষ্ট। শুধু আমাদের দেশের সঙ্গীত নয়, বিদেশী নানা সঙ্গীতের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। তাছাড়া এযাবৎ আমি অন্ততঃ তিন চারশো গানের সুর দিয়েছি যাদের মধ্যে দেড়শ দুশো গান আমার নিজের বাঁধা। সে সব গানের স্বরলিপি কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বার আনাই এখনো অপ্রকাশিত। পরে যখন প্রকাশ করব সেসব সুরের গাওয়ার পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করতে হবে বিশদ ক'রে। এ পদ্ধতির একটি প্রধান পন্থার পুনরুল্লেখ করি: যাকে আমি নাম দিয়েছি "সুরবিহার" (improvisation) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই নিয়ে বহু তর্ক আলোচনা ক'রে আমি বুঝতে পেরেছি যে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পথ যে সুরবিহারের, এটি তিনি যে কারণেই হোক বুঝতে পারেন নি। তিনি এক্ষেত্রে চেয়েছিলেন হুবহু বিদেশী ভঙ্গির আমদানি—যেখানে সুরকারই (composer) হবেন সর্বেসর্বা, গায়ক তাঁর হুকুমবরদার মাত্র। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতে গায়ক প্রতিপদে নিজেই সুরকার। অর্থাৎ যে রাগ সে গাইছে তার ঠাট ও কাঠামো বজায় রেখেও সে সে-রাগে নব সুরমূর্তির পরিকল্পনা দিতে চায় সাধ্যমত। একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করতেন কিন্তু বলতেন আধুনিক বাংলা গানে এ পন্থা বর্জনীয়—সুরকার যা করবেন গায়ককে পুরোপুরি তারই আনুগত্য স্বীকার করতে হবে - ঠিক যেমন বিলিতি গায়কেরা করেন আর কি। এ বিষয়ে যাঁরা আরো জানতে চান তাঁরা যেন আমার "সাঙ্গীতিকী" ও "তীর্থংকর" পড়েন, এখানে সে দুরন্ত আলোচনার স্থানাভাব।

আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান নিয়ে বহু আলোচনা ক'রে ও নানা বিষয়ে অনেক কিছু লাভ ক'রেও শেষটায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি (যে ধারণা সুররচনা করতে গিয়ে আরো দৃঢ়ই হয়েছে) যে, তিনি আমাদের বাংলাগানকে যে পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সে-পথ তার পক্ষে বিপথ। য়ুরোপীয় গান বড় নয়—বাজনাই বড়। আর গান বড়

হ'তে পারে নি এই জন্যেই যে সেখানে গায়ক সুরকারের তাঁবেদার। একথা অনেক ভেবেচিন্তেই বলছি ও য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসত্ত্বেও। ওদের শ্রেষ্ঠ গান কী তা যে শুধু আমি জানি তা নয়—শিক্ষা করেছি Schubert, Schumann, Brahm, Chopin প্রভৃতির গান শুধু যে আজো গেয়ে আনন্দ পাই তাই নয়—এদের অনেক গানের সুর থেকে বাংলা গানে নবসুরভঙ্গির সৃষ্টি-প্রেরণা পেয়েছি। সেই সূত্রে আমি আরো উপলব্ধি করেছি যে আমাদের গানের অন্তরাত্মা নিহিত—সুরবিহারের অনেকখানি স্বাধীনতায় ও অবকাশে। * এ স্বাধীনতা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সে হবে স্বধর্মভ্রষ্ট যাকে কেউ কখনো পারে নি অকালমৃত্যু থেকে বাঁচাতে। একথা আমি রবীন্দ্রনাথকেও বলতাম। অনেকে তাঁকে অসহিষ্ণু বলেন কেন জানি না—আমি তার সহিষ্ণু রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়েছি- যদিও স্পর্শকাতর তিনি ছিলেন যথেষ্ট। তাই তো তাঁর সহিষ্ণুতার মূল্যও ছিল বেশি। কথাটা বলছি এইজন্যে যে রবীন্দ্রনাথকে আমি বহুবার অকুতোভয়েই বলেছি যে তাঁর গান বড় হ'তে পারল না এই বিলিতি ভঙ্গির অনুকরণ করতে গিয়ে। একথা আজো আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে প্রতি শ্রেষ্ঠ সুরকারের সুরভঙ্গি বজায় রেখেও বড় গায়ক স্বকীয় সুরবিহারের পথে সে গানের সমৃদ্ধি বাড়াতে পারেন। কী ভাবে এটা সাধনীয় সে-আলোচনার স্থান এ নয়—আমি এসূত্রে শুধু উল্লেখ করছি আমার বহু পরীক্ষা ও উপলব্ধি-প্রসূত এই প্রত্যয়টি যে ভারতীয় গানের একটি গভীর স্বকীয় ধারা আছে যে-ধারা থেকে চ্যুত হওয়ার ফলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পথভ্রষ্ট হয়েছে। একথা আমি বলছি না তাঁর গানের মধ্যে কোনো কলাকারুই নেই। তাঁর গান থেকে অনেক কিছুই শেখবার আছে। তাঁর রচনাভঙ্গির মধ্যে স্বকীয়তাও ছিল একথাও সানন্দেই স্বীকার করব। গানে প্রথম শিক্ষার্থীরা তাঁর গান গেয়ে লাভবান হবেন এও সত্য। তাছাড়া বাংলাগানকে তিনি তার আত্ম-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন এজন্যেও প্রতি বাঙালি চিরদিনই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন—যেকথা আমি বহুবার বলেছি নানা প্রবন্ধে, নানা পুস্তকে। কিন্তু তবু একথাও আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে বাধ্য যে রবীন্দ্রনাথ যে পথে বাংলা গানকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন সে-পথে চললে তার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হ'য়ে যাবেই যাবে—
—আজ না হোক দুদিন পরে। ভারতীয় গায়ক যদি সুরকারের শুধু হুকুম তামিল ক'রেই

* একথা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রোলাঁ, ফক্স ষ্ট্রাঙ্গোয়েজ প্রভৃতি অনেক য়ুরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞও স্বীকার করেন। আমার "তীর্থংকর" "এদেশে ওদেশে" "ভূস্বর্গচঞ্চল" প্রভৃতি নানা বইয়েই একথা লিখেছি দৃষ্টান্ত দিয়ে।'

চলেন, তা'হলে তাঁর পদবীও হবে ওদের ভাষায় বাহনের (executant)—সুরকারের (composer) নয়। ভারতীয় গানের ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হবে: সুরের ক্ষেত্রে—সুরবিহারের পথে, কথার ক্ষেত্রে—আঁখরের পথে। এককথায়, যে-গায়ক গানে প্রতিপদে স্রষ্টা নন—সুরকারের আজ্ঞাবাহীমাত্র, তিনি অ গায়ক বা কু-গায়ক না হ'তে পারেন কিন্তু বড় গায়ক নন—এবং যে গানের সুরভঙ্গিতে এই সুরবিহারের অবসর নেই সে গান ভালো হ'তে পারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ গানের পর্যায়ে পড়তে পারে না।

"উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল"-এ একথাটি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করবার চেষ্টা করেছি। দেখাবার চেষ্টা করেছি কেন তাঁকে আমি দ্বিজেন্দ্র-অতুল রবীন্দ্রনাথ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ "সুরকার" মনে করি। কাজি নজরুল ইসলামের অভ্যুদয় এর পরে, তাই ত্রয়ীর সঙ্গে তাঁর নাম জুড়লাম না কিন্তু বাংলা সুরকারদের মধ্যে তাঁকেও একজন যথার্থ সুরকার ব'লে গণ্য করতে হবে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে, আরো এই জন্যে যে তিনি এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় গানকে আষ্টে পিষ্টে বাঁধলে সে গান হবে চৈনিক রমণীর পাদ-পল্লবের ম'ত। কাজি ছিল বড় রসিক লোক। তাই তার "কে বিদেশী", "আমারে চোখ ইশারায়", "এত জল ও কাজল চোখে", "রুম ঝুম রুম ঝুম", "গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু"…প্রভৃতি গান আমি যখন সর্বত্র গেয়ে বেড়াতাম তখন তার সুরভঙ্গিকে আস্থায়ী অন্তরা ভাবে বজায় রেখেও নিজের মতন তানালাপ-সমৃদ্ধ ক'রে গাইলে সে আপত্তি করা তো দূরের কথা রসে মশগুলই হয়ে উঠত। মনে আছে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই নিয়ে কত যে তর্ক হ'ত! রবীন্দ্রনাথ চাইতেন না গায়ককে এ স্বাধীনতা দিতে। তাই কাজিকে একদিন বলেছিলাম ঠাট্টা ক'রে যদি সে আমাকে না দেয় সুরবিহারের স্বাধীনতা তাহ'লে সভাসমিতিতে যেমন রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বন্ধ করেছি তেমনি তার গান গাওয়াও বন্ধ ক'রে দেব। তাতে উদার সঙ্গীতজ্ঞ মানুষটি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিল তার প্রাণখোলা হাসি হেসে: "আমি যে এবিষয় আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তা কতবার বলব দিলীপবাবু! আমার গান আমারই মেয়ে বটে, কিন্তু আপনি যখন গাইছেন তখন আপনি যে বাপকেও ছাড়িয়ে হ্লেন জামাই। যে-শ্বশুর জামাইয়ের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করার সময় বলে—'বাবা মেয়েকে মারধোর কোরো না' তার বুদ্ধির কসুর আছে—হা হা হা হা হা।" এ দিলদরিয়া স্রষ্টা শিল্পী ও সুরকারের কথা আজ বেশি ক'রেই মনে হয় তার জীবনের দুঃখ লগ্নে।

এ নিয়ে মাথা ঘামানো আমার আজকের নয়। তাই আমি বহু চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে। করতে না পেরে আমি কবিকে দুঃখ দিয়েছি

তাঁর কাছে বহু স্নেহ, আশীর্বাদ পেয়েও। ওতে নিজেও দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু প্রতিবিধানের পথ খুঁজে পাই নি। কারণ আমার বরাবরই মনে হয়েছে শীলতার চেয়ে সত্যনিষ্ঠা বড়। একথা বলছি এইজন্যে যে আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে কবির সুর যাঁদের তেমন ভালো লাগে না তাঁরাও তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর গানের সম্বন্ধে নিজেদের স্বাধীন মতামত চেপে গিয়ে সবার জয়ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। বহুর টান বড় বিষম টান। অনেকে যেখানে ভালো বলছে সেখানে সে বহুর মিলিত মতের স্রোতে গা ভাসিয়ে শুধু যে নিরাপদ তাই নয় তাতে সুবিধাও প্রচুর। আমি বলছি না অবশ্য যে তাঁর সুরে যাঁরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন তাঁরা সবাই "সুশীল উচ্ছ্বাসী" ছিলেন, কিন্তু একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে কবি অনেকের সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়ে চলতেন যে তাঁর সুরে তারা মুগ্ধ যারা তাঁর সুর আদৌ উচ্চশ্রেণী মনে করত না—অথচ মুখ ফুটে বলত না কিছু। একটা দৃষ্টান্ত দিই: অতুলপ্রসাদ সেন। মানুষ ও সুরকার হিসেবে তাঁকে আমি গভীর শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি বরাবরই—যেকথা "এদেশে ওদেশে"-তে লিখেছি "সুরেলা" নিবন্ধে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যখন তাঁর গানের অনুরাগীদের সঙ্গে আমার সংঘাত বেজে উঠত তখন তাঁরা অনেকে অতুল-প্রসাদকে আমার প্রতিপক্ষ খাড়া করতেন—"এই তো এতবড় সুরকার, তাঁর ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের গান—তবে?"—এই ই ছিল তাঁদের যুক্তি। তাই আমি একদিন অতুলপ্রসাদকে চেপে ধরেছিলাম: "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না অতুলদা! বলুন, বলতেই হবে আপনাকে বুকে হাত দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের সুরে আপনার হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে। তাহ'লে আমি আর একবার চেষ্টা করব রবীন্দ্রনাথের গানকে গ্রহণ করতে—কারণ এক্ষেত্রে আপনার মতের বিশেষ মূল্য আছে একথা মতভেদ হ'লেও আমি মানব। কেবল দোহাই আপনার সত্যি কথা বলবেন।" তাতে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলেছিলেন: "দিলীপ তোমার কাছে কোনো কথা বলা বড় বিপদ তুমি ব'লে দাও সবাইকে। আমি প্রকাশ্যে কেমন করে বলি বলো তো কবির সুর আমাকে স্পর্শ করে না? তাঁর কাব্যের কাছে আমরা কতদিক দিয়ে ঋণী"—ইত্যাদি। ব'লেই পই পই ক'রে মানা ক'রে দিয়েছিলেন একথা কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজো মনে পড়ে তাঁর দরদী কোমল দৃষ্টি: "কবি শুনলে বড্ড ব্যথা পাবেন দিলীপ, তাঁকে জানো তো।"

তাই একথা প্রকাশ করতে পারি নি রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের জীবদ্দশায়। আজও প্রকাশ করতাম না যদি অনেকে অত্যন্ত জোর দিয়ে এই কথা না বলতেন যে রবীন্দ্রনাথ যে বাংলার প্রধান সুরকার এ-বিষয়ে গীতজ্ঞ সমাজে মতদ্বৈধ নেই বা

থাকতেই পারে না। যাঁরা প্রকৃতিতে সুরকার গায়ক বা সমজদার তাঁদের মধ্যে এমন লোক আরো অনেক দেখেছি যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মস্ত কবি ব'লে গ্রহণ ক'রেও মস্ত সুরকার ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি। বিখ্যাত গায়ক ও সুরস্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার আমার একথার স্বপক্ষে আর একটি দৃষ্টান্ত যিনি রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর স্বরচিত সুরেই গাইতেন—রবীন্দ্রনাথের সুরে না।

কাজি নজরুলও বহুবার আমার কাছে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের সুরপ্রতিভা প্রথম শ্রেণীর নয়। এঁরা কি রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করতেন না? বিখ্যাত শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী যিনি নিজে শুধু সুরজ্ঞ নন গুণী, বহুবার আমাকে বলেছেন, চিঠিতেও লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের সুর কোনো গভীর রসসৃষ্টি করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের ইনি কি রকম ভক্ত কে না জানেন? তবু আমাকে বহু আঘাত সইতে হয়েছে এই একটি কারণে যে আমি প্রকাশ্যে লিখেছি রবীন্দ্রনাথের সুরপ্রতিভা বড় উপলব্ধির পথে চলে নি। কিন্তু যা আমার কাছে একটি গভীর সাঙ্গীতিক উপলব্ধি তাকে প্রকাশ করতে পাব না? নিজের স্বাধীন মতামত প্রচার করার অধিকার সর্বদেশে ও সর্বকালেই বিদগ্ধসম্মত হ'য়ে এসেছে—শুধু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হবে তার ব্যতিক্রম—ভালো না লাগলেও বলা চলবে না "ভালো লাগল না"—তাতে কবির প্রতি কল্পিত অসম্মানের ভয়ে?

একটু খুঁটিয়েই লিখলাম কথাগুলি শুধু নিজের মতামত প্রচার করতে নয়—রবীন্দ্রনাথের যাঁরা ভক্ত তাঁরা অনেক সময়ে অকারণ আমাকে ভুল বুঝে ব্যথা পেয়েছেন এইজন্যে। এক সময় ছিল যখন অতুলপ্রসাদের সুশীলতাকে অন্যায় মনে হ'ত। এখন মনে হয় সময়ে সময়ে -হয়ত তিনিই ঠিক করতেন কে জানে? মনে হয় না যদি বহু ঘা খেয়ে ক্রমশ টের না পেতাম যে আমাদের অনেক কর্মেরই মূল প্রেরণা আসে যে অজ্ঞাত মনোরাজ্য থেকে তার খুব কম খবরই আমরা রাখি। তাই না জীবনে এত অহংকারের ঠোকাঠুকি। এ বইটিতে যে দ্বিতীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের কথা লিখেছি তিনি প্রায়ই বলতেন হেসে একটি কথা: "দেখ মন্টু, সবারই ধারণা যে সে-ই জগতে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্, কেবল আমার বেলা (ব'লে নিজের বুকে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে) ধারণাটি সত্যি।"

কথাটা হাসবার না কাঁদবার আজো ঠাহর পাই নি। রাসেলের একটি কথা আমি ভুলব না! "Our unconscious is more malevolent than it pays us to be" * কথাটাকে অন্যভাবে বললে বলা যায়:—আমাদের মধ্যে এমন অনেক

Sceptical Essays on Introduction,

দ্বেষবৃত্তি আছে যার আনন্দ আনে নিরানন্দ। কথাটা যদি সত্যি না হ'ত তাহ'লে এ সুন্দর জগৎ আজ এমন হানাহানির নরককুণ্ড হ'য়ে উঠত না। এইজন্যেই আজ আর চাই না নিজের মতামত জোর ক'রে ব'লে কাউকে দুঃখ দিতে। কিন্তু তবু এখনো মনে হয় যে আন্তরিক হ'লে আলো পাওয়া যায়। সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা আমার আন্তরিক—এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইজন্যেই আমি রবীন্দ্রনাথের গানকে ভালোবাসতে পারি নি। এ বিশ্বাস যদি না থাকত তাহ'লে বলতাম না আজ এত জোর ক'রে যে রবীন্দ্রনাথের পথে গেলে আমাদের সঙ্গীতের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এখানে শেষ একটি কথা ব'লতে চাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে প্রশংসার কিছুই নেই একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার এও মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক আদর্শ আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের শাশ্বত আদর্শের পথ-রোধ ক'রে দাঁড়াবে যদি না আমরা সঙ্গীতের চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বড় মনে ক'রে বসি। রবীন্দ্রনাথের সুর থেকে আমরা নানা দিক দিয়ে লাভবান হ'তে পারি যদি আমরা "হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" তাঁর সঙ্গীত থেকে জলটুকু বাদ দিয়ে দুধটুকু গ্রহণ করতে শিখি: এককথায়, যদি আমরা নির্বিচারী উচ্ছ্বাসী না হ'য়ে তাঁর সঙ্গীতের যথার্থ সমালোচক হই। নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী সমালোচনার প্রয়োজন আছে—বিশেষ করে শিল্পের বিচারে, যেখানে স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মেরই মূল্য বেশি। এ-সূক্ষ্মের রসজ্ঞ সবাই নয়—কোনোদেশেই নয়। তাই নিরপেক্ষ সমালোচনা চিরদিনই রসবোধের একটি বড় দিশারি ব'লে সর্বদেশে সর্বকালে পূজা পেয়ে এসেছে—ভাল কী ও কেন ভালো সে সম্বন্ধে সে আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে ব'লে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের যথার্থ সমালোচনার সময় এখনো আসে নি। এখনো আমরা মহাকবির তিরোধানের ব্যথায় আচ্ছন্ন। মনের বেদনাতুর অবস্থা নিন্দনীয় এমন ইঙ্গিত করছি না—এ অবস্থায় যথার্থ নিরপেক্ষ সমালোচনা সম্ভব নয় এই কথাই বলতে চাইছি। যেদিন সম্ভব হবে সেদিন রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করার ইচ্ছা রইল।

এ বইটি প্রকাশের জন্যে প্রধানত আমি বন্ধুবর শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাছে ঋণী—কারণ "স্মৃতিকথা" তিনিই চেয়েছিলেন। আর ঋণী শ্রীনলিনাকান্ত সরকারের কাছে যিনি এ বইটির প্রুফ দেখেছেন।

ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরি

উৎসর্গ

৺গিরীশচন্দ্র শর্মা

অমরণেষু,

ধার্মিকের যে আচার করো নাই অঙ্গীকার তুমি ,
ব্রত পূজা স্তব ধ্যান—শঙ্খ ঘণ্টা পুষ্প উপচারে
আরাধ্যের আরাধনা করো নাই বরণ আভূমি-
প্রণত উচ্ছ্বাসরাগে—বহির্মুখী নিয়মঝংকারে।

তবুও হে ধর্মপ্রাণ ! কয়জন ধর্মের সাধনা
করেছে তোমার ম'ত ? ধর্ম কারো কাছে হয় ছল
অভিমান-অগ্নির ইন্ধন : কারো কাছে—উন্মাদনা :
কারো কাছে—যোগবীজ বুনি' চাওয়া ভোগের ফসল।

সে-ধর্ম চাহোনি তুমি। মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিয়া
আন্তরিকতার সত্যে দেব-সম—সাধি' আচরণে
তাহারি অভ্রান্ত পথে আনন্দের পূজা—বিসর্জিয়া
ক্ষোভের ক্ষুদ্রতা—মর্তে শংকামুক্ত ছিলে এ জীবনে।

করিলে উৎসর্গ তব পুণ্যপ্রাণ হে পরার্থব্রতী !—
নহে পরলোক তরে—ইহলোকে সর্বসেবাসুখে :
দিয়ে দান করো নাই গণনা কখনো লাভক্ষতি
তব সম অবণিক কজন দেখেছি বৈশ্যযুগে ?

যত দিন যায় বন্ধু, চিনি তব মহিমা মহান্
পবিত্রতা ছিল যার অঙ্গের কবচ—কাজলের
গৃহে করি' বাস যার ছিল তনু মানস অম্লান,
রমণীরঞ্জন হ'য়ে লভি' শুভ্রসিদ্ধি তান্ত্রিকের।

[২]

শাশ্বতের তীর্থযাত্রী চিরদিন অমিত-পূজারী
অকৃপণ বীতশোক— একথা শিখালে তুমি যেন
দুহাতে বিলায়ে তব পরমায়ু। মরণবিহারী !
লভিলে, কী মন্ত্র জপি', সব হারাবার সিদ্ধি হেন ?

দিনে দিনে যায় দিন·· সমীপেরে তবু মৃত্যুঞ্জয়
পণি' হায় চলন্ত ঢেউয়ের বুকে রচে পান্থ গেহ
ভ্রান্তির-বিলাস জপি'। হে সুদূরদৃষ্টি নিঃসঞ্চয় !
কোন্ সে পথান্ত দিল পথে তব অনন্ত পাথেয় ?

শৈশবের রঙ্গমঞ্চে ক্ষণজন্মা হে সঙ্গী আমার !
তোমারে চিনালো যেই নাট্যকার—আজো নমি তারে।
অন্তরে বুনিলে যে-অঙ্কুর নাই পরাভব তার,
জানি—যবে লভি শক্তি আজো গুরু, স্মরিয়া তোমারে।

তর্পণ

কবি

অতুলনীয়েষু

ছিলে না তো পিতা শুধু, ছিলে বন্ধু—আনন্দ-নিলয়।
দিতে দান সখা সম—গানে হাস্যে সাহচর্যে তব…
বিলায়ে কৌতুক কত আঁখিঠারে, ঝরায়ে প্রণয়
তর্কে, ভাব বিনিময়ে—বিনা উপদেশের গৌরব।

জননীর স্নেহে ধরি'—জনকের রক্ষাকবচের
ম'ত ছিলে দুর্যোগের অন্ধকারে—প্রহরী কিরণ…
খেলায় খেলার সাথী! বিলায়ে যৌতুক সহজের
সহজিয়া ছন্দে—তীর্থপথে সঙ্গী মনের মতন।

সবার উপরে ছিলে সহায় তুমি এ-জীবনের
অন্বেষণে হে সন্ধানী, বরসম যে আসে ধরায়:
গানে তব, স্তোত্রে তব, কল্পনায় শিল্পী অন্তরের
বিছায়ে ভক্তির মন্ত্র ঔদার্যের আন্তরিকতায়।

শৈশব-উষায় তুমি মৃদু মন্দ্র, তেজস্বি কোমল
চরিত্রের স্বর্ণরাগে এনেছিলে অরুণ অচিনে…
সে উদীয়মান আভা স্মরি' নমি তোমারে উচ্ছল
কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে—স্মরণীয় প্রয়াণের দিনে।

(প্রয়াণ—১৭ মে, ১৯১৩)

স্মরণীয়—বরণীয়!…যত দিন যায় বন্ধু, চিনি
তোমারে গভীরে আরো…অন্তরের ঐশ্বর্য তোমার
এ বণিক যুগে আরো ওঠে সমুজ্জ্বলি'—বিকিকিনি
যেথায় মর্যাদা পায়—পায় না প্রাণের অঙ্গীকার।

সে প্রতিভা বহুমুখী···আভিজাত্য—স্বচ্ছ, আত্মভোলা··
প্রচুর স্ফটিক হাস্য কলকণ্ঠ নির্ঝরের সম···
সঙ্গীতের, কবিত্বের অফুরন্ত আনন্দ হিল্লোলা···
কৃত্রিমতা 'পরে ব্যঙ্গ···মিথ্যা 'পরে সে-কশা নির্মম ··

সে বন্ধুত্ব···সে আতিথ্য—জানিত না দিতে যে দুয়ার···
বিচার করিত না যে-হৃদয়—কে পর, কে আপন···
করিত বিশ্বাস সবে প্রবঞ্চিত হ'য়ে বার বার ··
ধনগর্বে সে বিতৃষ্ণা···অভাজনে দেওয়া আলিঙ্গন ·

সব চেয়ে—প্রতি পদে সে নিঃশঙ্ক সন্ধানী শ্রদ্ধায়
সত্যেরে বরণ করা···ভ্রান্তি তরে শান্ত ক্ষমা-চাওয়া···
যত মনে পড়ে—তত শুনি কানে ঃ "আন্তরিকতায়
অচলপ্রতিষ্ঠ যিনি—সার্থক তাঁহার তরী বাওয়া।"

———

প্রথম উল্লাস

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। আমার "স্মৃতিকথা" চেয়েছেন। সেটি হচ্ছে না। তবে আপনি সুহৃৎ তদুপরি সজ্জন। তাই আপনার অনুরোধে "৺পিতৃদেবের" স্মৃতিকথা কিছু লিখে রাখতে কলম ধরেছি আজ সকালে—শুভদিনে বৈশাখস্য প্রথম দিবসে। ইতি ১৩৫১।

কিন্তু পুত্রের স্মৃতিকথা না ব'লে পিতার স্মৃতিকথা বলতে যাওয়ারও বিপদ আছে, যেহেতু স্মৃতিকথার কেন্দ্রীয় বস্তুটি nucleus—হ'ল "আমি"। শাস্ত্রে আছে শুম্ভ অসুর ছিল "অস্মিতা"র প্রতীক—কি না, সে সর্বত্রই দেখত "অস্মি"—আমিকে। আর নিশুম্ভ ছিল "মমতা"র প্রতীক, দেখত সর্বত্রই "মম"—আমারকে। তাই এরা অসুরের দলে ভর্তি হ'য়ে অম্বিকার হাতে কবন্ধ হ'ল। ভয় করে। তবে আশা করি স্মৃতিকথার "আমি"-পাঠ শ্রুতিকটু কি দূষ্য হ'লেও অম্বিকা লঘুপাপে এতবড় গুরুদণ্ড দেবেন না।

৺পিতৃদেবকে এ নিবন্ধে আমি "কবি" নামেই ডাকব। কারণ আমি তাঁকে সব আগে কবি ব'লেই বিশ্বাস করি। লোকের কাছে প্রায়ই শুনি তিনি ছিলেন প্রথমে নাট্যকার ও হাসির গানের কবি। আমি বলি না, তিনি ছিলেন সব আগে কবি, গীতিকার ও সুরকার—composer—তার পরে আর যা বলতে চান বলুন। আমার নিজের ধারণা আমি অকুতোভয়ে বলার অধিকারী ভুলে আমার আপত্তি নেই, ভয়ের নামেই আমার আসে বিদ্রোহ। তাই আমি বলব যে অদূরভবিষ্যতে তাঁকে রসিক-ভক্তসমাজ শিরোপা দেবেন বাংলাদেশের একজন বড় "কবি" ব'লে ও সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার ব'লে। তাঁর পরে তাঁর চেয়ে বড় সুরকার জন্মাবে না একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না—সবাই চাইবে জন্মাক—কিন্তু তাঁর আগে বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে বড় সুরকার কেউ জন্মায় নি একথা মনে করার স্বপক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ আছে। আমি তাই তাঁর কবি ও সুরকার রূপের 'পরেই জোর দেব এ স্মৃতিকথায়। কবি বলতে—তাঁর ক্ষেত্রে—আমি গীতিকারও বুঝছি, যদিও সব কবিই যে গীতিকার নন, এ অত্যন্ত জানা কথা।

এবার নারায়ণং নমস্কৃত্য সুরু করি বাল্যকথা বেপরোয়া হ'য়ে।

*   *   *   *

আমার যতদূর মনে পড়ে চার কি পাঁচ বৎসর বয়সেই আমি গাইতে শিখি। আমার মা র এক সই ছিলেন, তাঁকে আমি গোলাপ মা ডাকতাম বোধহয় তিন বৎসর বয়স থেকে। তাঁর কাছে (পরে) শুনেছিলাম যে যখন আমার বয়স দুবৎসর তখন আমি গানে তাল দিতে পারতাম নির্ভুল। কথাটা সম্ভবত সত্য, তবে যদি নাও হয় সে অসত্য আমাকে স্পর্শাবে না এটা অম্বিকা দেবী যেন মনে রাখেন, কারণ এটা স্মৃতিকথা, প্রত্নতত্ত্ব নয় ইতিহাসও নয়। যা শুনেছি দেখেছি ভেবেছি অনুভব করেছি কল্পনা করেছি লিখে যাওয়ার নামই স্মৃতিচারণ—reminiscing.

আমি ও আমার বোন মায়া খুব ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটার দেখতে যেতাম—কবির প্রহসনই দেখি সব আগে। সেই সব শোনা গানই গাইতাম ভাইবোনে। ভুল নিশ্চয়ই হ'ত অনেক, কিন্তু শুনতে পাই আমাদের স্মৃতিশক্তি না কি খুব ভালো ছিল। পরে—আমার মনে আছে—এক একটা থিয়েটার থেকে যখন ফিরতাম কবি পরীক্ষা করতেন, কার কটা গানের সুর মনে আছে? গুণ গুণ ক'রে শোনাতাম। ধরুন বারটা গান শুনেছি আমার হয়ত মনে রইল পাঁচটা গানের প্রথম দুএক লাইনের সুর, মায়ার—চারটে। কিন্তু সময়ে সময়ে আমার সাত ও তার আট এ-ও হ'ত। সবাই আশ্চর্য হ'ত এ দুটি শিশুর সাঙ্গীতিক মেধা দেখে ঐ বয়সে। তখন আমার বয়স ছয়ের বেশি নয়—মায়ার পাঁচের কিছু কম। "প্রডিজি" বলতেন কেউ কেউ। কবি হাসতেন পিতৃগর্বে।

কিন্তু পুরো গান শেখার তখনো অনেক দেরি। নানা গানের এক দুই তিন চরণ—ব্যস্। না না—একটি গান পুরো গাইতে আমি শিখেছিলাম বেশ মনে আছে। সেই হয়ত আমার প্রথম একটা "গোটা" গান গাওয়া। গানটি কবির দুর্গাদাস নাটকের। গানটি মাত্র চার লাইনের ব'লেই বোধহয় গোটা গানটা গাইতে রাজি হ'তাম। বড় গান গাইতে আমার সে-সময়ে অত্যন্ত বিরক্তি লাগত, কারণ সুর মনে থাকলেও কথা ভুল হ'ত, আর ভুল নিয়ে টুকলে আমি মোটেই প্রসন্ন হ'তাম না। যে সুবোধ বালকের নাম গোপাল তাকে আমি সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করতাম। কিন্তু গানটা কি শুনুন। গাইছে এটি রাজিয়া বিরহিণী :

(তবে) আর কেন বহে মলয় পবন আর কেন পাখি গায় গান!
(মোর) হৃদয়কুঞ্জে সুখমধুমাস হ'য়ে গেছে যবে অবসান!

সুরটি খাম্বাজ ভঙ্গির কিন্তু ঠিক মামুলি খাম্বাজ নয়—কবি প্রায় কোনো রাগই ঠিক মামুলি আরোহ অবরোহে গাইতেন না। শেষে গান-এর গা-তে একটি নাতিদীর্ঘ তান আছে—খাম্বাজেরি। আমার কণ্ঠে ঐ অল্পবয়সে সেই তানটি শুনে আমার এক

মেশোমহাশয় (৺গিরিশচন্দ্র শর্মা—এঁর কথা পরে বলছি) একেবারে অস্থির ! ফুটফুটে ছেলেটিকে লোকে "ফাজিল" উপাধি দিলেও তিনি বলতেন "সপ্রতিভ"। স্নেহের চোখ আর অ-স্নেহের চোখ যে এক নয় সেটা এই বয়সেই একটু একটু ক'রে বুঝতে শিখি। "ফাজিল আমি মেশোমশায় ?" বলতাম কখনো গভীর দুঃখে। ঠোঁট ফুলে উঠত। মেশো আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন : "না না। তোমার নাম সপ্রতিভ।" এহেন মেশোর নেওটো হব না তো হব কার ?

কিন্তু যা বলছিলাম। মেশো আমাকে এখানে ওখানে নিয়ে যেতেন, বলতেন সগৌরবে : "ওহে অমুক, শোনো একবার এইটুকু ছেলের গলা কি আশ্চর্য কাঁপে !"

সেই সময়ে চার বৎসর বয়স্ক মাষ্টার মদনের গান শুনি। সে কী জয় জয়কার আমাদের বাড়িতে। একটি তাকিয়ার উপর ব'সে তাকে গাওয়ানো হ'ল। সে গাইল বালক ধ্রুবর গান (মাত্র দুটি লাইন মনে আছে)

কোথা হে প্রাণসখা কোথা তুমি দয়াময় !
অসময়ে রাসবিহারী ঠেলো নাকো পায়।

কিছুদিন আগে ভ্রমরের বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিল সবাই বলতেন : "হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড গোবিন্দলাল অন হর্স্‌ব্যাক্‌।" স্টেজে গোবিন্দলালের ঘোড়ায় চ'ড়ে আবির্ভাব - সে কী কাণ্ড ! মাষ্টার মদনের আবির্ভাবের পরে একথাটি আমরা প্রায়ই বলতাম সোচ্ছ্বাসে।

সত্যিই এত মুগ্ধ হয়েছিলাম তার গলা শুনে যে সাংঘাতিক গলা-সাধা সুরু ক'রে দিলাম। কারণ মেশো বলতেন আমার গলা যেমন "কাঁপে" তেমন "মিষ্টি" নয়। ছ'মাস সাধার পরে মেশো একদিন বললেন : "একী ! মণ্টু ! তোমার গলা যেন মিষ্টিও হয়েছে মনে হচ্ছে ?" সগর্বে কী বললাম মনে নেই তবে নিশ্চয়ই খুব একটা পাকা কথা। কেউ অমুক কিছু পারো না ব'লে ছুয়ো দিলেই আমার রোখ চেপে যেত। অহঙ্কারী ছিলাম আমি দারুণ—ঐ বয়স থেকেই। মেয়েরা বলত ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর—কথা কি তেম্‌নিই পাকাপাকা গা ?

কিন্তু কবির কর্ণে পুত্রের এই পাকাপাকা কথাও সুধাবর্ষণ করত। তিনি কখনো আমাকে শাসন করতেন না পাকাপাকা কথা বলার জন্যে। লোকের কাছে কেবলই শোনাতেন আমার গলা কি রকম "কাঁপে"। কিছুদিন বাদে গ্রামাফোনে আমাদের শৈশবের হিরো লালচাঁদ বড়ালের গান শুনে মহা উৎসাহে আমি তুললাম তাঁর গানের অধিকাংশই। বিশেষ ক'রে তাঁর বারো ইঞ্চি রেকর্ডের একী রূপ হেরি হরি, মনেরি বাসনা ও অনুগত জনে কেন এই তিনটি গান ঐ সব জাঁদরেল তান সমেত। তখন

কবি আনন্দ যেন আর রাখতে পারতেন না। বলতেন একে ওকে তাকে: "শোনো একবার ওর তান! ছেলে আমার সাংঘাতিক গাইয়ে হবে বড় হ'লে, দেখে নিও— সারা বাংলায় ওর জুড়ি থাকবে না—" ইত্যাদি। সেই old old story! বহুদিন পরে বিলেতে ৺শরৎ দত্ত এঞ্জিনিয়র মহাশয় বলেছিলেন, "দিলীপ, প্রতি বাপ মা-ই মনে করে ছেলে একেবারে বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। আমি ভাবি তাহ'লে জগতে এত অর্বাচীন এল কোত্থেকে?" একথা শুনে যখন হাসতাম তখন ভাবতাম কবির কথা। কে জানে আমি কোন্ দল পুরু করব?

* * *

কিন্তু গ্রামাফোন থেকে গান শিখে কণ্ঠের উন্নতি হওয়ায় বিপন্ন হ'য়ে পড়তে হ'ল বৈকি। কবি প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন আমাকে পুরাণ মহাভারত নাটক নভেল পড়ার মাঝখানে। শেষটায় লালচাঁদি তান সবাইকে শোনাতে শোনাতে আমি তিতিবিরক্ত হ'য়ে কবিকে সাফ ব'লে দিলাম: "গান ছেড়ে দিলাম।"

তাঁর মুখের সে-বেদনার ছবি ভুলব না কোনোদিন: "কেন রে?"

"ভালো লাগে না গাইতে।"

* * *

জানতাম তিনি জোর করবেন না তাই নিলাম এ-ওজরের আশ্রয়। ঐ বয়সেই তিনি ছিলেন আমাদের দুই ভাই বোনের বন্ধু—এ একটুও বাড়ানো কথা নয়। শুধু আমাদের ব'লে নয়—সব শিশুদেরই বন্ধু। মনে আছে আমার ছোট মামা ভাংচা (আমার চেয়ে ছ'মাসের ছোট) ও মাসিমা সুষমা (আমার চেয়ে ছ'মাসের বড়) যখনই আসত আমাদের বাড়িতে কবি বিস্কুট লবেঞ্চুষ দিতেন, গল্প করতেন, গল্প শুনতেন: ঠিক যেমন করে সমবয়সীরা। কাউকেই জোর ক'রে কিছু করাতেন না—আমাকে তো শাসন পর্যন্ত করতেন না—জীবনে সবশুদ্ধ হয়ত দু তিনবারের বেশি তাঁর কাছে রুক্ষ কথা শুনিনি। মাত্র একবার চড় খেয়েছিলাম মায়াকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সিঁড়ি দিয়ে টেনে তুলেছিলাম ব'লে।

এত প্রশ্রয়ে অনেকে আপত্তি করত। এসময়ে আমার মেজমামা মাঝে মাঝে আসতেন। আমাকে তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু তিনি ডিসিপ্লিনের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন—যাকে বলে martinet। একদিন কবি আমাকে বললেন হেসে: "ওরে, তোর নাকি আমি মস্তক ভক্ষণ করেছি খবর পেলাম।"

"কার কাছে?"

"তোর মেজমামার। তাঁর কথা শুনিসনি বুঝি?"

আমি বিরসমুখে বললাম : "তা গাইতে বললেই গাইতে হবে না কি ? বা রে !"

"ও।"

এই ধরণের কথাবার্তা।

* * *

কবি জিজ্ঞাসা করতেন, খবর নিতেন, জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন তাঁর মতে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ—কিন্তু জোর করা তো দূরের কথা কড়া স্বরে হুকুম করা পর্যন্ত তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই ব'লে ভেবে বসবেন না যেন যে তিনি একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখলে আমাদের তল্লাটের সবাইকার প্রাণ কেঁপে উঠত, তিনি রাগলে তো বাড়িশুদ্ধু লোক চোখে সর্ষের ফুল দেখত। যখন বারান্দায় পায়চারি ক'রে গুন গুন ক'রে গান গাইতেন তখন তাঁর মুখ যেমন সদাশিবের মতন প্রসন্ন দেখাত, যখন তিনি কোনো কিছুতে একটুও বিরক্ত হ'তেন তখন ঠিক তেম্‌নি মনে হ'ত যে এ মানুষের ছায়া মাড়ায় লোকে কী ক'রে ? কথায় যাকে বলে রগচটা মানুষ তিনি সেই ধরনের ছিলেনও বটে ছিলেন না ও বটে—কারণ একদিকে তাঁর রাগ ছিল যেমন ঝাঁঝালো অন্যদিকে তাঁর সংযমও ছিল তেম্‌নি জোরালো। একদিন আমার 'পরে কিরকম রাগ করেছিলেন তার কাহিনী বললে বোধ হয় আমার বক্তব্যটা বিশদ হবে।

কবি চাকরবাকরকে মারা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। সাহেবকে তিনি মেরেছিলেন দু'একবার—(একথা তাঁর জীবনীতে হয়ত পড়েছেন ?)—কিন্তু চাকরকে কক্ষনো না। প্রায়ই বলতেন : চাকরবাকর বেয়াদবি করলে জরিমানা করতে পারো, বরখাস্ত করতে পারো কিন্তু গায়ে হাত তুলতে পারো না। একথা অনেক দয়াময় প্রভুই ব'লে থাকেন, কিন্তু তিনি চাকরবাকরকে মারা খারাপ বলতেন যে-বিশেষ কারণে সেটি একটু অদ্ভুত। অর্থাৎ মারা র পরে মারি প্রত্যয়টির অসদ্ভাবে। এইবার ভূমিকা রেখে নাটকে নামি।

একদিন আমি এক একগুঁয়ে চাকরকে মেরেছিলাম এক চড়। সে কবির কাছে গিয়ে নালিশ করে। কবি তলব করলেন আমাকে। তাঁর মুখ দেখেই আমি প্রমাদ গণলাম। প্রভাতী মুখেই সাঁঝের আঁধার !

"ওকে মেরেছ ?" তাঁর স্বর কাঁপছিল রাগে।

"তাতে কী হয়েছে ?"

"কী হয়েছে ? জানো না ? কাওয়ার্ডিস হয়েছে ?"

"সবাই তো মারে"—বললাম ভয়ে ভয়ে।

"না। মারে তারাই যারা কাপুরুষ।"

"কেন।"

"কারণ তুমি তাকে মারছ এইটে জেনে যে সে তোমায় ফিরে মারতে পারবে না। তোমাকে আমার মারতে ইচ্ছে হ'লেও আমি মারি না যে কারণে।"

আমি কেঁদে ফেললাম। কবি আদর করলেন না। বললেনঃ "যাও। আর কখনো মেরো না।" ব'লেই চাকরকে একটা পাঁচটাকার নোট বখশিশ দিয়ে দিলেন।

তিনি প্রায়ই বলতেনঃ "আমি পুরুষমানুষের সব সইতে পারি কেবল কাওয়ার্ডিস ছাড়া।"

ঠিক এই কারণেই তিনি অপছন্দ করতেন কেউ মিথ্যা কথা বললে। "পুরুষমানুষ (পুরুষ কথাটায় খুব জোর গমক লাগাতেন বরাবর) যা করবে তার দায়িত্ব নিবে।" এ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায়ও আমি তাঁকে খুব তর্ক করতে শুনেছি। কী ভাবে একটু নমুনা দিই অবিশ্যি আমার নিজেরি ভাষায়। (এখানে ব'লে রাখি আমি যা লিখব সব নিজেরি ভাষায় লিখব—ভাবটা বর্ণিতদের, ভাষাটা আমার।)

"দ্বিজুবাবু! লোকজন যখন দেখা করতে আসবে তখন পেগ-টা টেবিলের উপর নাই রাখলেন। লোকে যখন ভুল বোঝে --"

"ভুল কোথায় বোঝে—ঠিকই তো বোঝে। আমি মদ খাই—তারা বলে এর নাম সুরাপান।"

"শুধু ঐটুকু ব'লেই তো তারা থামে না। অসত্যও বলে।"

"যেটুকু অসত্য সেটুকু তারা অক্লান্তভাবে বললেও তো সত্য হবে না। যে মদ খায় সে-ই মাতাল নয়। আমার সম্বন্ধে প্রথমটা যদি বলে আপত্তি করবার কিছু নেই কারণ সত্য। দ্বিতীয়টা যখন বলে আপত্তি করাও undignified—কারণ ওটা সম্পূর্ণ অসত্য।"

লোকমতের সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল গভীর। এটা তিনি তাঁর রসাল ভাষায় বলেছেন তাঁর "মদ্যপ" কবিতায় (আলেখ্য):

বলবে তুমি মদ্য খেলে লোকে বড় নিন্দা করে।
সে তো মানুষ চিরকালটা ক'রেই আসছে পরস্পরে।
নিন্দাভাজন হ'লেই কেহ মন্দ কি তায় হ'তেই হবে?
ভারি বড় ছিলেন যাঁরা নিন্দাভাজন ছিলেন সবে।
নিন্দা করে—আমার সঙ্গে মেলে না কো ব'লে না কি?
আমিও ছাই তাঁদের কেবল প্রশংসাই কি ক'রে থাকি?

নিন্দা সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল বেপরোয়া। যা ভালো লাগে না নিন্দা করব কিন্তু

প্রকাশ্যে। যদি ভুল শুনে নিন্দা করি ক্ষমা চাইব, কিন্তু ভুল না বুঝলে ক্ষমা চাইব না কেননা নিন্দা যদি সত্য হয় তবে তাকে মিথ্যাচার বলা চলে না—এইই ছিল তাঁর মনের ভাব।

এ কথার উল্লেখ করছি এই জন্যে যে তাঁর জীবনচরিতে লিখেছেন দেবকুমার বাবু যে নিন্দা ক'রেই তিনি অনুতপ্ত হ'তেন। এধরণের নীতি তাঁর কাছে ছিল অগ্রাহ্য। অনুতপ্ত হ'তে তাঁকে দেখেছি কিন্তু তখনই যখন তিনি ভুল রিপোর্টের উপর কাউকে নিন্দা করেছেন। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু ভুল না বুঝলে ক্ষমা চাওয়া তিনি বিশ্বাস করতেন না। মন্দ্রে তিনি লিখেছেন তাই ব্যঙ্গ ক'রে "শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা।"

আমার মনে আছে ৺চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র শ্রীহরনাথ বসু মহাশয় একদিন এসে তাঁর কাছে নিজের নাটকের একটি অঙ্ক পড়েন।

"কেমন হয়েছে দ্বিজদা ?"

"কিচ্ছু হয় নি।"

শীলতার তিনি ধার ধারতেন না। এই জন্যে বহু বন্ধুকেই তাঁর প্রতি বিরূপ হ'তে দেখেছি যার দরুণ তিনি শেষের জীবনে একটু সিনিক হয়ে গিয়েছিলেন। উদাহরণ— আলেখ্য-তে পুত্র-কন্যার বিবাদ কবিতা।

ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। হয়েছিল কি মায়া ছিল একটা রঙচঙে পিঁড়িতে ব'সে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে নিচের তলায়। কবি খাচ্ছেন। আমি চাইছি ক্রমাগত সেই পিঁড়িটিই—কারণ আমার পিঁড়িটি রঙিন ছিল না। কবি দেখছেন আমরা চেঁচামেচি করছি কিন্তু

অন্তরে বিরক্ত হচ্ছি ক্রমেই
কথা কিচ্ছু কচ্ছি না কো কাকে
বিচার করছি কেবল মনে মনে ;
ছেলে পিলে অমন ক'রেই থাকে।

এমন সময়ে আমার ধাক্কায় মায়া প'ড়ে গেল। তখন কবি আমাকে দিলেন এক দারুণ ধমক। আমি চমকে উঠে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। মায়া তখন ছ বছরের মেয়ে। আমার কাছে এসে হাত ধরে বলল : "বোসো দাদা চাই না ও পিঁড়ি—তুমিই বোসো।" আমার বয়স তখন সাত কি আট—মায়া আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট।

পুরুষরা তো স্বার্থমগ্ন ; যদি
রৈত স্বার্থ নারীর প্রেমমূলে
আমাদের এই পাপের বসুন্ধরা
পাপে ভ'রে উঠত কূলে কূলে।
মরি মরি ! এ কী দৃশ্য ! এ কী
ধরিলিরে আমার চোখের কাছে
এ পদার্থ কোথা থেকে এল !
এ ও না কি পৃথিবীতে আছে !
মিথ্যা দ্বন্দ্ব হিংসা লিপ্সা ভরা
স্বার্থময় এ-শুষ্ক ধরাতলে
এ ও আছে ? দেখে যে এ-ছবি
চক্ষু ভ'রে আসে বাষ্প জলে।
মনে হ'ল : শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ-সংসারে।
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি
তত খারাপ না হ'তেও পারে।'

কথা হচ্ছিল প্রকাশ্যে সুরাপান নিয়ে। এই নিয়ে প্রায়ই ওঁর শুভার্থী বন্ধুরা তর্ক করত ব'লে কবি একদিন মজা ক'রে লেখেন ঐ মত্তপ কবিতাটি। তার অধিকাংশ যুক্তিই যাকে বলে just for fun : তবে কয়েকটি নীতি আছে যা তাকে অনুসরণ করতে দেখেছি। অর্থাৎ মদ খাওয়া খারাপ নয় কিন্তু মাতাল হওয়া খারাপ। যথা (কবির ভাষায়) :

তবে যদি মাত্রা চড়ে ? সেটা বটে গুরুতর।
তবে কি না চড়ে না সে—ইচ্ছা যদি নাহি করো।...
সুরা যদি চালায় তোমায়—তা'লে সুরা মহা অরি,
সুরায় যদি চালাও তুমি—তা'লে সুরা শুভঙ্করী।

সুরা তাঁকে চালালো এ কখনো দেখি নি, কেউ কখনো দেখে নি তাঁর পা টলতে কি অসংলগ্ন কথা বলতে বরং উল্টোটাই দেখেছি গয়ায়। তখন আমার বয়স বছর দশেক। বিখ্যাত মনীষী, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়বন্ধু, উদারচরিত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

আসতেন রোজ আমাদের ওখানে। (মায়া ও আমি তাঁকে কাকা বলতাম। কী যে কমনীয় মানুষটি!) এসে রোজই অনেক রাত অবধি নানা তর্ক আলোচনা চলত দুই বন্ধুতে। কাকা ইংরাজি সাহিত্যে ছিলেন মহাপণ্ডিত। নানা কাব্য প'ড়ে কবিকে বলতেন তাঁর নানা রসবোধের কথা। রবীন্দ্রনাথ এঁর কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি কবিকে আকৃষ্ট করেন প্রথম কাকাই। আজও মনে পড়ে কবির কাছে তাঁর পড়া সুর ক'রে "দে দোল্ দোল্" আর "পুরাতন ভৃত্য" আর বুঝি "নিরুদ্দেশ যাত্রা" ঠিক মনে নেই। তার আগে কবি রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না তাই প্রায়ই বলতেন সকৃতজ্ঞে: "লোকেনের কাছে কত যে শিখেছি!" কারুর কাছে কিছু বোলে ঋণ স্বীকার করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু যা বলছিলাম।

দেখেছি উল্টোটাই: দুই বন্ধুতে রাত দুপুর পর্যন্ত গল্পালাপ ও তর্কালাপ চলত— টেবিলে রঙিন পানীয় থাকত সমস্তক্ষণ। কবি তিন পেগ এর পরে আর খেতেন না। কিন্তু কাকা আট দশের আগে "আর না" বলতেন না। কিন্তু এত পান ক'রেও তখনো তাঁর বুদ্ধিকে ঝাপসা হ'তে দেখি নি। শরৎ বাবু বলতেন আফিং খেলে তাঁর লেখা খুলত। কাকার খুলত তর্ক। কবি সুরার এই শক্তিকে স্তব করেছেন অকুতো ভয়ে তাঁর হাসির গানে।

> হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবি
> বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয় তা অবশ্যম্ভাবী রে।

কিন্তু কবির এখানে সংযমশক্তি অসামান্য হ'লেও (কারণ তিন পেগের বেশি তিনি কিছুতে খেতেন না, বলতেন তার পরে তাঁর বুদ্ধি ঝাপসা হ'য়ে আসে) কাকার মতন সহ্য-শক্তি ছিল না। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি কাকার পা টলত উঠতে। কিন্তু বুদ্ধি থাকত অটল। তবে কাকাও ছিলেন একটি অসামান্য মানুষ—কাজেই কবির মন্তপ কবিতার ওকালতির উত্তর দেওয়া চলত যে অসামান্যে যা পারে তা সাধারণে পারে না। কিন্তু এ যুক্তি কেউ দেয় নি যে তিন পেগের পরে "আর না" বলবার শক্তিও গড়পড়তা নয়। একথা বুঝতে পেরেছিলাম কারুর কারুর বেচাল দেখে। যেমন ধরুন কবিকে সুরাপান করতে দেখে তাঁর দু এক বন্ধু সুরু করলেন—কিন্তু তারপরেই একেবারে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ যাকে বলে! একদিন তাঁর এক ব্রাহ্ম বন্ধু ঐ অবস্থায় এক ডাক্তারের প্রণয়িনীকে প্রেমজ্ঞাপন করেন! ডাক্তার ও তাঁর প্রণয়িনী কবিকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ডাক্তার এসে কবিকে বললেন ব্রাহ্ম বন্ধুটির সামনেই "এমন বন্ধু আপনার দ্বিজদা? বিশ্বাস হয় না।" সে কী কাণ্ড! কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আর না। আপনি হয়ত প্যুরিটানদের

স্নেহ করেন—যা রয় সয় তা ই ভালো। শুধু এইটুকু বলি এর পর থেকে কবি সাবধান হয়েছিলেন দেখে যে বাঙালিরা সুরাপানে প্রায়ই মাত্রা রাখতে পারে না। তাই অপরকে সুরাপানে লওয়াতেন না আর।

কিন্তু একথা তুলেছিলাম কেন ভুলবেন না :—শুধু এইটা দেখাতে যে সর্ববিষয়ে সংযম ছিল কবির কাছে সোজা—বরাবরই। স্বভাবে নয় কিন্তু–ইচ্ছার জোরে। সংযম যাদের স্বভাবসিদ্ধ - উচ্ছলতায় যাদের প্রকৃতিগত অরুচি তিনি তাদের খুব নেকনজরে দেখতেন না। হাসিতে গল্পে গানে আলোচনায় তাঁর প্রাণের ধারা বাঁধ দেখলেই যেন হ'য়ে উঠত বিদ্রোহী। "Thus far and no farther"—এ শাসন বাইরে থেকে আসবে? ঈশ্। ডিসিপ্লিন বলুন, সমালোচনা বলুন, সংযম বলুন সবেরই বিধান আসুক তাঁর অন্তরের নির্দেশ থেকে। তাঁর ভীষ্ম নাটকে মৎস্যরাজ দাসরাজের কাছে গিয়ে শান্তনুর বয়স্য মাধব বলছে যে দাশরাজের কন্যা মৎস্যগন্ধাকে শান্তনু দেখেছেন "এই অপরাধে মদন তাঁকে বাণ মেরেছেন।" তাতে দাশরাজ রেগে টং: "আমার মেয়েকে দেখেছেন তো আমি বাণ মারব, মদন মারবার কে?" সমাজের ভ্রূকুটি সইতে কবি এম্নিই নারাজ ছিলেন–ভ্রূকুটি করুক তার বিবেক বেশ কথা—কিন্তু সমাজ করবে? বিলক্ষণ!—কোনো কাজ ন্যায় কি অন্যায় তার দিশারি আমাদের বিবেক—সমাজের চলতি মত নয়–এই বিদ্রোহের সুরই বেজে উঠেছে তাঁর "মন্দ্র" বইটিতে বাইরণ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসে :

ইহাতেই মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব! নহিলে আপনারে কোনো মতে
বাঁচাইয়া, এই ষষ্টি বর্ষ মাত্র, পিনাল কোডের ধারা হ'তে
জীবন ধারণ করা ধর্ম নহে। পরকালভয়ে, নিন্দাভয়ে
ব্যয়ভয়ে, সসঙ্কোচে, নিশ্চল নির্জীব থাকা—তাহা ধর্ম নহে।
আপনায় প্রবেষ্টিত আপনি, নিরুদ্ধবৎ উদ্ভিদের ম'ত
জীবন ধারণ করা ধর্ম নহে! নাহি যার পরহিত ব্রত
হোক না সে নিষ্পাপ, সে জীবনের উদ্দেশ্য কী আছে?
সংসারের কিবা আসে যায় সে নিরীহ জীব মরে কিম্বা বাঁচে?

কবির কাছে অবজ্ঞেয় ছিল এই নৈতিক "নিরীহতা"—ঠাট বজায় রেখে চল কোনোমতে—নির্বিবাদে। সমাজের শিষ্ট শান্ত নাগরিকতার জীবন তাঁর কাছে কোনোদিনই কাম্য ছিল না। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের কথায় তিনি হাসতেন। এই নিয়ে বাধত তাঁর প্রায়ই আমার দাদামশায় ওরফে তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে। তাঁকে দেখেছিলাম বটে স্বভাবসংযমী। ভোরে উঠবেন পাঁচটায়। সাড়ে সাতটায় চা-পান

অত্যধিক দুধ দিয়ে (অর্থাৎ চায়ের অনিষ্টকারী শক্তি নষ্ট ক'রে)। তারপর বেরুবেন রুগি দেখতে। ঠিক দুপুরে একটায় ফিরবেন প্রচুর টাকা নিয়ে। তারপর বসবেন দাড়ি কামাতে। তারপর গরম জলে স্নান। আহার। আহারের পরে দশ থেকে পনের মিনিট গল্প। এক ঘণ্টা বিশ্রাম। উঠেই বাইরের ডিস্পেন্সারিতে যে সব রুগি অপেক্ষায় আছে তাদের ওষুধ দেওয়া। তারপর ফের মোটরে টহল দিয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কলকাতায় রুগি দেখে সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গির ডিস্পেন্সারি থেকে প্রচুর অর্থ আহরণ ক'রে দিদিমার হাতে সমস্ত টাকা তুলে অতি অল্প আহার। তারপরে আধ ঘণ্টা গল্প—তার বেশি নয়—হঠাৎ হয়ত এক আধদিন চল্লিশ মিনিট গল্প বড় জোর—ব্যস্। তারপরেই শয়নে পদ্মনাভ। কবির মৃত্যুর পরে দাদামহাশয়ের প্রাসাদেই আমি ছিলাম ছয় বৎসর—কলেজ জীবনে। তাই দেখেছি ছবৎসরের মধ্যে ক্বচিৎ একটু এদিক ওদিক হ'ত তাঁর দৈনন্দিন রুটীনের। কবি তাঁকে' ঠাট্টা করে বলতেন : "পূর্বজন্মে শ্বশুর মহাশয় ছিলেন ঘড়ি, এজন্মে পথ ভুলে মানুষদের কোঠায় এসে প ড়েছেন - কিন্তু সংস্কার যায় নি।" শ্বশুরের সঙ্গেও ঠাট্টা করতেন তিনি সমানে। কাউকেই বাদ দিতেন না। বলতেন : "ঠাট্টা যদি গুরুজনের সঙ্গে না করব তবে তো মেনেই নেওয়া হ'ল যে ওটা খারাপ জিনিস।

দাদামহাশয় ঘড়ি হোন বা না হোন রসিক পুরুষ ছিলেন। তাই শ্বশুর জামাইয়ে বেবনতি হয় নি। কিন্তু তবু তিনি "ঘড়ি" পদবীতে আপত্তি করতেন। সকালবেলা যখন রাউণ্ডে বেরুতেন প্রায়ই আমাদের ওখানে ঢুঁ মেরে বিশ পঁচিশ মিনিট ব'সে যেতেন। "আমি পূর্বজন্মে ঘড়ি ছিলাম এমন চার্জ আমার নামে আনলে কোন্ অপরাধে দ্বিজু ? এ-ই তো তোমাদের সঙ্গে কত গল্প করছি, রুগি না দেখে।"

কবি বলতেন হেসে : "এর নাম কি গল্প শ্বশুর মহাশয় ? গল্প করতে করতে দিন রাত মাথার উপর দিয়ে কেটে না গেলে কি আর তাকে গল্প বলে ?"

দাদামহাশয় প্রায়ই হেসে কবির এ-কথাটার উল্লেখ করতেন—যখন থিয়েটার রোডে আমি তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতাম।

* * * *

এই যে গল্প করছি তো গল্পই করছি—যার নাম দেওয়া হয়েছিল দিলদরিয়া আড্ডা—এর অনেক দৃষ্টান্ত শুনতাম অতুলদার (৺অতুলপ্রসাদ সেন) কাছে—অনেক পরে ১৯২৩শে বিলেত থেকে ফিরে, লক্ষ্ণৌয়ে। অতুলদা ছিলেন কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র, তাঁর হাসির গানের দোয়ার। অতুলদা বলতেন : "সে কী কাণ্ড দিলীপ—জানো না তো ! 'ডাকাতে ক্লাবে' তোমার বাবা, আমি, জগদিন্দ্রনাথ, রবিবাবু সবাই মিলে গান

গল্প করতে করতে রাতকে রাত দিয়েছি কাবার ক'রে। রবিবাবু পারতেন না রাত একটা দুটোর পর জাগতে। কিন্তু আমরা তোমার বাবাকে দলপতি ক'রে রাত ভোর করে সকালে গিয়ে উঠেছি তোমাদের ওখানে। তোমার বাবা ধ'রে নিয়ে যেতেন সাক্ষী দিতে যে রাত্রিবাসটা ক্লাবেই হয়েছে বটে। বিয়ে তো করলে না দিলীপ, একথার মানে কী জানবে কেমন করে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" বলে সেই দ্বিজেন্দ্রলালী অট্টহাস।

সে হাসি কি ভুলবার? সে তো হাসি নয় যেন প্রাণের আনন্দের দম্‌কা হাওয়া—সয় না বিষাদের কুয়াশার লেশও। কবির দেহান্তের পর সে জাতের হাসি যদি কারুর কাছে শুনে থাকি তবে সে অতুলদা আর গিরিশ মেশো। যখন এই তিন বন্ধু একসঙ্গে হাসতেন তখন কী কাণ্ড হ'ত ভাবুন একবার!

এইজন্যই বলছিলাম সংযম তাঁর আয়ত্তে হ'লেও স্বভাবে তিনি সংযমী মানুষ বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। এমানুষ যাকে বলে burn their candles at both ends এ ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন তুলছি না। আমি আঁকতে চাইছি তাঁর চরিত্রের ঠিক ছবিটি।

তখন কিন্তু বুঝতে পারি নি তেমন ক'রে—কতখানি ইচ্ছার জোর থাকলে মানুষ স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে। তিনি তিন পেগ এর বেশি খেতেন না কারণ এ-ই ছিল প্রতিজ্ঞা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা এক, তাকে রাখা আর। এ পারে কেবল সে-ই যে স্বভাবে খানিকটা শাক্ত। অথচ কবি ছিলেন বৈষ্ণবও বটে। মানুষের চরিত্রকে যারা বেশ কেটে ছেঁটে লেবেল দিয়ে বলে এ মানুষ এই এই—তখন প্রায়ই ভুল হয় এ আমি লক্ষ্য করেছিলাম বাল্যকালেই। এর কারণ কি তা বুঝতে আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের চরণে। কিন্তু যেতে দিন সে যোগের কথা।

বলছিলাম কি, তিনি ছিলেন স্বভাবে বিলাসী অথচ উদাসী। শেষ বয়সে তাঁকে খালি গায়ে চলাফেরা করতেই দেখেছি। অথচ প্রথম দিকে ছিলেন কী সাহেব। আমার বড়মামার কাছে এ সাহেবিয়ানার একটা দৃষ্টান্ত প্রায়ই শুনতাম। বড়মামা বলতেন কবি বিলেত থেকে ফিরে খুব সাহেবি ষ্টাইলেই থাকতেন (যার জন্যে উনি তার পরেই লিখেছিলেন "আমরা সাহেবি ধরণে হাসি আর ফরাসি ধরণে কাশি") একদিন হিন্দুস্থানি সইসকে বলছেন, ঘোড়ার ঘরে খড় বিছাতে। বিচালি শব্দটা জানতেন না—তাই খড় বিছাও, খড় বিছাও করছেন আর সইস এটা ওটা সেটা এনে ধরছে, তিনি আরো রেগে বলছেন: "How idiotic! আরে খড়!" বলতে বলতে বড়মামা যা হাসতেন।

অথচ এহেন সাহেব পরে পারৎপক্ষে পিরাণ পর্যন্ত পরতেন না। প্রসাধন ছেড়েই দিয়েছিলেন—সাবান মাসান্তে একবারও গায়ে উঠত কি না সন্দেহ। তাঁর শেষ দিকে যে ছবি আমার মনের পটে সব চেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে সে তাঁর মেঝে ব'সে নাটক লেখা ও গুণ্ গুণ্ ক'রে খালি পায়ে খালি গায়ে বেড়াতে বেড়াতে গান বাঁধা। এক কথায় ছেড়ে দিলেন সুরাপান—মাছমাংসও। অথচ কী ভালোই তিনি বাসতেন মাছ মাংস, বিশেষ মাংস! আমাকে প্রায়ই বলতেন: "স্বর্গে দেবরাজ কী খেয়ে উপোষভঙ্গ (breakfast) করেন জানিস? বেকন্ অ্যাণ্ড এগস্।"

এই মানুষকে শেষজীবনে যাপন করতে দেখেছি—(তাঁর ভাষায়)—বিধবাদের জীবন। তখন বুঝতে পারি নি কিন্তু এখন বুঝতে পারি—জীবনে আসক্তি বলতে যা বোঝায় সেটা তাঁর ছিলনা কোনোদিনই। তাই যা-ই ধরতেন আঁকড়ে ধরলেও—ধর্তেন শিথিলমুষ্টিতে। ধরাটা (grip) তাঁর "প্রবল" ছিল কারণ তিনি স্বভাবে ছিলেন বলিষ্ঠ কিন্তু "ব্যাকুল" ছিল না কারণ অন্তরে তিনি ছিলেন অনাসক্ত। তাই মরণে তাঁর ভয় ছিল না কোনোদিনই। কথাটা কত বড় কথা তা আমার খেয়াল আছে বিশ্বাস করবেন, তবু আমি একথা সত্য ব'লে জেনেছি ব'লেই এত জোর ক'রে বলতে পারছি। মৃত্যুভয় সম্বন্ধে কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন তিনি যে বাল্যকাল থেকে তাঁর শান্ত নির্ভীক পিতৃদেবকে দেখেই মানুষ। প্রায়ই বলতেন: "ওরে, জানিস আমি কার ছেলে? কার্তিক দাওয়ানের।" ব'লে বলতেন প্রায়ই: "বাবা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন এক বন্ধু এসে তাঁকে বলেন: 'দেওয়ানজি, ভয় কি?' তাতে তিনি বলেছিলেন হেসে: 'আমার ভয়?' তাঁর ভয় ছিল না কেননা জীবনে তিনি সত্যনিষ্ঠ ব'লে নিজেকে জানতেন। "Do well and right and let the world sink" (চরণটি বিখ্যাত কবি জর্জ হার্বার্টের)।

তাই ব'লে কবির কাছে জীবন বিস্বাদ ছিল না কোনোদিনই। অনাসক্ত মানে বিরক্ত নয়। তিনি স্বভাবে বৈরাগী ছিলেন একথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, পাছে কেউ ভেবে বসেন আমি আমার নিজের কোন প্রবণতা তাঁর উপরে চাপাচ্ছি তাই একথা বলছি। আমার ভালো লাগে বৈরাগীকে—গৈরিক বসন দেখলে আমি মুগ্ধ হই—আকৈশোর। কিন্তু তাঁর একটুও ভালো লাগত না বৈরাগীদেরকে। মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের একটি কথা: "মণ্টু এই বৈরিগিদের একটা জিনিস আমার বড় খারাপ লাগে তারা এসে কেবলই অন্ধা পাবার কথা ব'লে ভয় দেখায়। ভিক্ষে চাইতে এসেছ ভিক্ষে নাও—ভয় দেখাবে কেন?" কবি ছিলেন ভয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ। ভীরু—এর চেয়ে কঠিন কটূক্তি তাঁর কাছে ছিল না। মৃত্যু? তাতে ভয়টা কিসের?

এ অভয় তিনি পেয়েছিলেন ভিতরের অনাসক্তি থেকে। বীরত্ব ক'রে মস্ত কিছু একটা করবার তাগিদ থেকে যে দুঃসাহস আছে তাঁর প্রকৃতি তাঁকে বরণ করে নি—করেছিল সেই সহজ সাহসকে যে বলতে পারে বাউল গেয়েঃ

"জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল্।
সিন্ধু পরে গর্জে ঢেউ সে দণ্ডমাত্র নযক স্থিব
নিচে প'ড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধু নীর
এতদিন তো ঢেউযে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে
ডুব দিযে আজ দেখবি নিচে কতখানি গভীব জল।"

মনে হ'তে পারে, এ যেন মরণকে নিযে পরখ করাব মনোভাব—তাই এর মধ্যে নিছক অনাসক্তিই নেই -আছে—কী বলব? একটা শান্ত কৌতূহল—scientific curiosity. কথাটা হযত মিথ্যা নয, তবু একটা "কিন্তু" থাকে। কিন্তুটাব কারণ, মানুষ বিচিত্র জীব, তাই মরণ সম্বন্ধে সে নানা কথাই ভাবে। দ্বিজেন্দ্রলালও ভাবতেন। না-ডরানো এসবের মাত্র একটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মরণকে নিযে তাঁর অনেক জল্পনা কল্পনা ছিল। সেসব তিনি লিখে গেছেন তাঁর অপরূপ সুখমৃত্যু কবিতাটিতে। সমস্তটা উদ্ধৃত করা এখানে সম্ভব নয। তবু দু চার ছত্র উদ্ধৃতি না দিলেই নয কেন না তাঁব মধ্যে সত্যিই দেখতাম মরণকে নিযে এই পরিহাসের ভাব—প্রায় স্নেহের খেলার কাছাকাছি বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না। যথা:

আমি যবে মরিব আমার নিজ খাটে গো
আযেসে মরিতে যেন পারি।
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো
কেহ নাহি কবে উমেদারি।...
রূপসী শালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয বোধ।
গাহিতে হাসির গান যেন সে-সমযে গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।

হাসির পালা সাঙ্গ হ'লে এলো সাধের পালা:

তবে এক সাধ আছে: মরিব যখন—কাছে
রহে যেন ঘেরি' প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ,

আর বন্ধু যদি কেহ করে ভক্তি করে স্নেহ
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন।
খুলে দিও দ্বার, ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
উন্মুক্ত বাতাস আর আকাশের আলো,
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা পুষ্পভরা
এতদিন যাহাদের বাসিয়াছি ভালো।
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে চামেলি গন্ধ—
একবার বসন্তের পিকবর গাহে,
হয় যদি জ্যোৎস্নারাত্রি—আমি ওপারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।

এই উদাসীভাবের সঙ্গে পরে এসে যোগ দিয়েছিল ভক্তিভাবের গাঢ়তা। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

দ্বিতীয় উল্লাস

উদাসী বলতে আমরা সচরাচর বুঝি বাউল জাতীয় যাযাবর সম্প্রদায়ের কেউ। আমি সে-ভাবে শব্দটাকে ব্যবহার করি নি। মাটিছাড়া অনাসক্ত ও নভচারী স্বপ্নদর্শী এই দুই জাতীয় মানুষের সমাবেশে যে আশ্চর্য অনামা মানুষটি গ'ড়ে ওঠে তাকেই আমি বলতে চাই উদাসী। কবির একটি গান আছে আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগত—এত সুন্দর সুরটিও যে কী বলব! ভৈরবী অথচ এত নতুন ঢঙের! গানটির প্রথম চারটি চরণ যথা:

আমার আমার ব'লে ভাবি আমার এ ও আমার তা
তোমার নিয়ে তুমি থাকো—নিও না কো আমার যা।
আমার বাড়ি আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি আমার নিয়ে ভাবনা।

এই ভাবটি তাঁর মধ্যে আমি তাঁর শেষ বয়সে ক্রমশই ফুটে উঠতে দেখেছি চোখের সামনে। অথচ উদাসী বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সে-পরিণতি তাঁর জীবনে ঘটে নি। জীবনে তাঁর বিরাগ বা বিতৃষ্ণা আসে নি—সব তাতেই তিনি ছিলেন অথচ কিছুতেই নেই—উদাসী বলতে আমি অন্তত এই-ই বুঝি।

তাঁকে চোখের উপর দেখে মনে হয়েছে আরো দুটো কথা: তিনি যে ধরণের উদাসী ছিলেন সে-ধরণের উদাসী হ'তে পারে কেবল সেই মানুষ যে শুধু দেহে বলিষ্ঠ নয়—মনে নির্ভীক—তার উপরে প্রাণে খোলা, সরল। কবির উদাসী ভাবের মধ্যে এই তিনটি ভাব দেখে (বলিষ্ঠতা, নির্ভীকতা ও সরলতা) আমি সত্যই অত্যন্ত মুগ্ধ হ'তাম বাল্যকালেই। কারণ তাঁর আশেপাশে যাদের দেখতাম তারা যে কেউ তাঁর মতন নয় এ চোখে পড়েছিল। তাঁর চেয়ে রূপবান, মনীষী, কর্মকুশল বা অনাসক্ত মানুষ একাধিক দেখেছি (যদিও তাঁর চেয়ে প্রতিভাবান এক আধটাই দেখেছি) কিন্তু এধরণের মধুর সরল নির্ভীক বলিষ্ঠতা কোনো মানুষের মধ্যে দেখেছি ব'লে মনে তো পড়ে না। এখানে আমাকে পক্ষপাতী ভাববেন না। আমি সত্যই তা নই। চোখ আমার খোলা থাকে যাকে ভালোবাসি তার সম্বন্ধেও তা। যদি না থাকত তবে আমার বিচারশক্তির এজেহারে-গ'ড়ে-ওঠা মতামত প্রকাশ করা ছেড়ে ওর চেয়ে শ্রদ্ধেয় কোনো কাজে হাত দিতাম। কবি আমার পিতা ছিলেন ব'লেই তাঁর সম্বন্ধে যা তা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করব এ আমার স্বভাব নয় আরো এই জন্যে যে তাঁর কাছেই এ শিক্ষা

পেয়েছি আশৈশব, যে ভক্তির অযোগ্য যে তাকে ভক্তি করা, শুধু অস্বাস্থ্যকর নয়—মহাপাপ। তাই আমি যখনই কবিকে দেখতাম তুলনা করতাম তাঁর সঙ্গে—যেজন্যে আমার গিরিশ মেসো আমার 'পরে রাগ করেন। কিন্তু এ-কথা একটু পরেই বলছি।

আমি কবির কাছে শুনেছিলাম ছেলেবেলা থেকেই যে তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের চরিত্র তাঁকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ ক'রে সত্যনিষ্ঠা, মনের জোর ও সরলতা এই তিনটি গুণ তিনি যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন মনে হয়। কী ভাবে একটু বলি। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মূল চরিত্রটি বুঝতে হ'লে তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্রের কথা একটু জানা ভালো। আমি তাঁকে ঠাকুর্দাই বলব।

হয়ত শুনে থাকবেন ঠাকুর্দা ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান। যখন নদীয়ার রাজ পরিবার দেনায় ডুবতে বসেছে তখন তিনি এসে রাজ-পরিবারকে উদ্ধার করেন তাঁর "অসামান্য সততা ও কর্মিষ্ঠতার" গুণে। এজন্যে রাজা তাঁকে পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুর্দা নেন নি, বলেছিলেন "কর্তব্য করেছি তার জন্যে আবার পুরস্কার নেব কি?"

তিনি তাঁর একটি সুন্দর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। বইটি পড়তে পড়তে মুগ্ধ না হ'য়ে পারা যায় না এ মানুষটির অসামান্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা দেখে। যে রাজা তাঁর অন্নদাতা তাঁকে দরকার হ'লেই যে তিনি স্পষ্ট কথা বলেছেন মুখের উপর। রাজা এতে খুবই বিরক্ত হ'তেন। তাঁকে ছাড়িয়ে দিলে তাঁর মুস্কিল হ'ত বৈ কি, কারণ চাকরিই ছিল তাঁর জীবিকা। রাজা তাঁর সঙ্গে বহু অসদ্ব্যবহারও করেছেন নানা মোসাহেবের কথায়। কিন্তু তাঁকে ভালোও বাসতেন এবং তাঁর দুর্লভ সততা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। শুধু রাজা নয়—রাণীও। এ বিষয়ে তিনি লিখছেন সরলভাবে "রাণী ঠিক আমার সমবয়স্কা ছিলেন। সুতরাং আমাকে এত ভালোবাসেন বলিয়া পাছে রাজার মনে কোনো ঈর্ষাভাব উপস্থিত হয়, এজন্য আমি অতি কুণ্ঠিত হইতাম। কিন্তু রাজার যেরূপ উন্নত চিত্ত ছিল, ও আমাকে তিনিও যে প্রকার ভালোবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন তাহাতে বোধহয় না যে কখনো তাঁহার মনে নীচভাবের উদয় হইত। বরং রাণী আমাকে ভালোবাসাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। যখন রাণীর ক্রোধ শান্তির কোনো উপায় না দেখিতেন তখন তাঁহাদের কলহে আমি রাজবাটি ত্যাগে উদ্যত হইয়াছি—এইরূপ ষড়যন্ত্র দ্বারা রাণীর ক্রোধের শান্তি করিতেন।"*

* আত্মজীবন—শ্রীকার্তিকেয় চন্দ্র রায়—১৭ পৃষ্ঠা।

এবইটি পড়তে ছেলেবেলায় যত ভালো লাগত এখন তার চেয়েও ভালো লাগে। কারণ এরকম সরলতা ও উদারতা আজকাল চোখে পড়ে না। আমরা ঢের বেশি Sophisticated হয়ে পড়েছি। তারপর শুনুন একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের কথা। তাঁর মনের সরল পবিত্রতার ছবি কি ভাবে ফুটেছে দেখুন। ঠাকুর্দা লিখছেন (৪২ পৃষ্ঠা)

"বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোনো দূষায় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইত না।.. যে কামিনীর মোহিনী মূর্তি দিনযামিনী হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল সে-মূর্তি দর্শন ব্যতীত স্পর্শন করিতে ইচ্ছা হইত না। দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোনো অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইত না। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনের বৎসর। এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধ্যবর্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। হাসিলে তাঁর মুখমণ্ডলের অপূর্ব সৌন্দয যেমন নয়নরঞ্জন করিত, হাসির মধুর ধ্বনিতে কর্ণকুহরে তেমনই সুধাবর্ষণ হইত। তিনি আমার সঙ্গীতে যেরূপ পুলকিত হইতেন, আমিও তেমনই তাঁহার মধুর মনোহর স্বরে মোহিত হইতাম। কিন্তু তিনি যেমন আমার গান ইচ্ছা করিলেই শুনিতে পাইতেন, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের প্রথাবশত আমি তাঁহার গীত সেরূপ শুনিতে পাইতাম না। তিনি যখন নিভৃতস্থানে সঙ্গিনীমণ্ডলে মধুকরের ন্যায় মৃদুমধুর স্বরে গান করিতেন, তখন আমি লুক্কায়িত থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে তাঁহার গীতশ্রবণ করিতাম। কখন কখন তিনি আমার সমাগম বুঝিতেও পারিতেন, তখন যেন জানিয়াও জানিতেন না! যদি কোনো সখী কহিত যে কেহ চুরি করিয়া তোমার গান শুনিয়াছে, তিনি যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেন, কী লজ্জা! আর তো আমি কখনো গাহিব না।··

"তিনি স্বামীকেও যথেষ্ট ভালোবাসিতেন সন্দেহ নাই। তবে বোধ হইত যেন আমাকে কিঞ্চিৎ অধিক ভালোবাসিতেন। তিনি যে আমাকে ভালোবাসিতেন তাহা তাঁহার স্বামীও জানিতেন। হোলির সময় তাঁহার পতি ও আমি একত্র তাঁহার গায়ে আবির দিতাম। আমার তের বৎসর বয়স হইতে পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত এইরূপ সুখের অবস্থা ছিল। তাহার পর সহসা এসুখের সাগর শুকাইয়া গেল। বোধ হয় তাঁহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায় তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল। একদিবস তাঁহার কিঙ্করী সহসা আমাকে কোনো কৌশলে তাঁহার মনের ভাব জানাইল, আমি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে তাহাকে কহিলাম যে তাঁহাকে আমি মায়ের মতন জ্ঞান করিয়া থাকি, তাঁহার এরূপ অভিলাষ কখনই হইতে পারে না।"

ঠাকুর্দাকে সবাই ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত তাঁর এই সরলতার জন্যে। তিনি আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন তাঁর "ভালোমানুষ" নাম রটেনি যদিও এটা আশপাশের লোকে সব সময়ে প্রশংসা হিসেবে নিত না।

রাজবাড়িতে এসে কর্মচারিরা তাঁকে ঘুষ নেওয়াবার চেষ্টা করে—তাহ'লে তাদের সুবিধা হয় ব'লে। সেসব বিস্তারিত কাহিনী বলবার স্থান এ নয়! কিন্তু যেটা বলতে একথার অবতারণা সেটা এই যে এই নিখুঁৎ নির্লোভ ও অটল সততায় কবি অত্যন্ত মুগ্ধ হ'তেন প্রায়ই বলতেন ঠাকুর্দা সম্বন্ধে যে তাঁর খ্যাতি ছিল নদীয়ার দেবতুল্য মানুষ ব'লে। শুধু মনেই "দেব" নন বাইরেও অতি রূপবান্ পুরুষ ছিলেন তিনি। কত মেয়ে যে তাঁর গান শুনে আকৃষ্ট হ'ত—(তিনি ছিলেন "কোকিল কণ্ঠ" কবির কাছে প্রায়ই শুনতাম)—তার কয়েকটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কাহিনী ঠাকুর্দা লিখে রেখে গেছেন। সব বিবৃতি এখানে করা চলে না, তবে একটি ঘটনা সংক্ষেপে বলি—আপনাদের সকলেরই ভালো লাগবে নিশ্চয়।

একটি সুন্দরী গায়িকা মেয়ে আসত গাইতে রাজবাড়িতে। তার গান সবাইকেই মুগ্ধ করত। কিন্তু সে মুগ্ধ হ'যে গেল রূপবান্ ঠাকুর্দাকে দেখে ও তাঁর অপরূপ কণ্ঠের গান শুনে। হ্যাঁ বলতে ভুলেছি তিনি শুধু সুকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন না হিন্দুস্থানি খেয়ালে সে সময়ে তাঁর জুড়ি সারা নদীয়ায় ছিল না। এহেন রূপবান ললিতকণ্ঠ যশস্বী প্রভাবশালী দেওয়ানজির মোহে গায়িকা প'ড়ে যাবে এতো খুবই স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের কাছে। কিন্তু ঠাকুর্দা ছিলেন সত্যবাদী চরিত্রবান্ কৃতদার। তাঁর মনে বাধত। এ দীর্ঘ কাহিনী। সে মেয়েটি ক্রমাগত তাঁর কাছে আসত। সে নাচতেও পারত। ক্রমশঃ এমন হ'ল যে (ঠাকুর্দা লিখেছেন) "আমার মনের দুর্বলতার জন্য অত্যন্ত অসুখ হইতে লাগিল।" কারণ রাজ-বাড়িতে অসাধারণ "চরিত্রবান সাধু" ব'লে তাঁর খ্যাতি সারা নদীয়ায় ছড়িয়ে পড়ার দরুণ কয়েকটি ঈর্ষান্বিত রাজকর্মচারী রাজাকে বলে যে ঠাকুর্দার "ইন্দ্রিয় সুখের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, শুধু লজ্জার ভয়ে চরিতার্থ করিতে পারেন না।" নানা লোকের নানা কথায় শেষে রাজার শ্রদ্ধালুচিত্তেও সংশয় দেখা দিল—কৌতূহল জাগল, ভাবলেন—দেখিই না। তাই সেই সুন্দরী গায়িকা মেয়েটিকে একদিন গভীর রাত্রে তাঁর কাছে একলা অন্ধকারে দিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। সে একটা দস্তুরমত ষড়যন্ত্র যাকে বলে।

তখন (ঠাকুর্দা লিখছেন): "আমার আশা ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাকে বুঝাইলাম, কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয় হইল না। শেষে সে আমার হস্ত ধরায় তাহার হাত ছাড়াইয়া পূর্বোক্ত শয়নকক্ষে গমন করিলাম। সেখানে পূর্ণবাবু থাকাতে সে আমার নিকট যাইতে পারিল না।"

কিন্তু সরল সত্যনিষ্ঠ মানুষটি লিখে গেছেন অকপটেই যে চরিত্রে স্খলন না হ'লেও দুর্বলতা আসতে লাগল চিন্তায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে দারুণ অশান্তি এল। তিনি দৃঢ় চরিত্র মানুষ হ'লেও দেবতা তো আর নন কাজেই সংসারকে তাঁর মনে হল "কী ভয়ানক স্থান! উৎকোচগ্রাহীরা আমাকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, আবার ইন্দ্রিয়াসক্তগণ আমাকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিবার যত্ন করিতেছেন।.... শেষে আমি নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া রাজাকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলাম যে 'আমি আপনাদের কোনো দোষ দেখিলে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কাহারও প্রতি ঘৃণা করি না, বরং স্নেহই করিয়া থাকি। আমাকে দুশ্চরিত্রান্বিত করিলে আপনাদের কি লাভ হইবে?' তখন রাজা একথার উত্তর দিলেন না পরে একদিন কথায় কথায় ঠাকুর্দাকে বললেন যে সে মেয়েটি আত্মহত্যা করবে ভয় দেখিয়েছিল ও "তোমাকে কোনো কোনো কথা বলিবে বলিয়া আমাকে নিতান্ত ধরাতে আমি কৌশলে তোমাকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম।" তবে একথাও রাজা স্বীকার করেছিলেন যে ঠাট্টা ক'রে উনি মেয়েটিকে বলেন যে 'যদি তুই তাঁহার প্রণয়িনী হইতে পারিস তবে তোকে পুরস্কার দিব।' রাজারাজড়ার কাণ্ড তো বটে। কিন্তু দেখুন মজা তারপরই "রাজা পরিহাস স্থলে আমাকে বলিলেন যে ইহার উহার দোষ দেওয়া মিথ্যা, তোমার রূপ আর স্বর সকল দোষের মূল। নতুবা রাজবাটিতে এত লোক আছে, সকল স্ত্রীলোকের তোমার দিকেই ঝোঁক হয় কেন?" (ঐ --১২১ পৃষ্ঠা)

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। ঠাকুর্দা লিখছেন প্রথম জীবনে তাঁর পূজার্চনা ভালো লাগত। তারপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে প'ড়ে সাকার পূজায় এমন বিরাগ হ'ল যে রাজাদেশেও তাতে যোগ দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল বেদ অপৌরুষেয় - কেন না ব্রাহ্ম প্রচারকরা তাই বলতেন! তারপরে "যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, যতই নানা মতের বিভিন্নতা জ্ঞান-গোচর হইতে লাগিল, ততই মনোমধ্যে নানাবিধ তর্কবিতর্ক ও সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে সকল বিশ্বাসের মূল ছিন্ন হইয়া যেন অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িলাম ও অজ্ঞান-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম।"

কী অকপট আত্মউন্মোচন বলুন দেখি। মনে রাখবেন এখন তিনি কৃষ্ণনগরের একজন উচ্চবংশীয় মানী যশস্বী ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রী। অথচ এমনভাবে স্বীকার করতে পারা যে "অজ্ঞান সাগরে ভাসিতে লাগিলাম!"

রাজবাড়িতে নানা চক্রান্ত। ঠাকুর্দাকে তাঁদের বন্ধুরা বললেন ওকালতি পরীক্ষা দাও। তাতে ঠাকুর্দা বললেন যে ওকালতিতে অসৎ উপায়ে অর্থার্জন করতে নারাজ হ'লে পসার হয় না। কাজেই রাজবাড়িতে অর্থের অনটন সত্ত্বেও উকিল হ'লেন না।

প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখুন তিনি ভয় করতেন শুধু ধর্মকে আর কাউকে নয়। সত্যি, ধর্মভীরু বলতে আমার মনে আজও বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তাঁরই কথা ভেবে।

আত্মজীবনীতে ঠাকুর্দার মনের জোরের বহু পরিচয় পাই। আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে তাঁর প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব। তিনি লিখছেন যে নব্য ধর্মের প্রভাবে: "এক্ষণে য়ুরোপ দেশীয়েরা সভ্যচূড়ামণি হইয়াছেন এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।... যখন এমন বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা (মদ্য) আদরপূর্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? আমরা কেহই প্রত্যহ বা অধিক পরিমাণে পান করিতাম না। যখন দুই চারি বন্ধু একত্র হইতাম তখন কখনো কখনো মৃদু মদিরা পান করিয়া সুখসাধন করিতাম।"

কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁদের দেখাদেখি রাজা শ্রীশচন্দ্রও সুরু করলেন এবং "মদিরা তাঁহার সর্বনাশের মূল হইল। তিনি প্রথমে অতি সঙ্গোপনে কখনো কখনো আত্মীয় দিগের সহিত পান করিতেন।" কিন্তু তারপরেই যা হবার। তখন (ঠাকুর্দা লিখছেন) 'আমাদের দৃষ্টান্তের বিষময় ফলোৎপত্তি দেখিয়া আমি এককালে মদিরা পানে বিরত হইলাম, এবং তাঁহাদিগকেও ইহাতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাদের প্রবল প্রবাহ ফিরাইতে পারিলাম না।"

সাধে কি ভাগবতে শুকদেব পই পই ক'রে মানা করেছিলেন যে শক্তিশালীরা যে সব পথে কীর্তি অর্জন করেন সে-পথ শক্তিহীনদের পরিত্যাজ্য--মহাদেব না হ'য়ে বিষপান করেছ কি মরেছ:

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ঠাকুর্দার এই এক কথায় পান ত্যাগ করার কথা কবি খুবই বড় গলা ক'রে বলতেন এবং বলতেন যে মদ ছাড়া আবার শক্ত কথা কী—পুরুষ মানুষ হ'য়ে একটা নেশার দাস হব?—ধেৎ। তাঁর এ তাচ্ছিল্যের সুরটি তাঁর আলেখ্যে পাবেন যেখানে কবি বলছেন যে সুরার তাঁবেদার হ'লে

"তখন সে নয় ব্র্যাণ্ডির নেশা, ব্র্যাণ্ডির নেশার নেশা সেটা
যখন সেজন এমন অধম তখন মরুক গে বেটা।"

ঠাকুর্দার আত্মজীবনী পড়তে পড়তে যে প্রশ্নটি ক্রমাগত মনকে আন্দোলিত ক'রে তোলে সেটা এই যে এ-সরলতা কেন ক্রমশ ক'মে আসছে? কবির চরিত্র অসামান্য সরল ছিল কিন্তু শেষ জীবনে তিনি যে অনেকখানি 'সিনিক' হ'য়ে পড়েছিলেন (ঠ'কে

ঠ'কে) সেটা তাঁর শেষের দিকের লেখার অনেক বেদনায় বোঝা যায়। "মন্দ্রে" তাঁর আগন্তুক কবিতায় প্রথমেই দেখি নবজাতককে কবি শুধালেন :

কি গো? তুমি কে আবার? বলি কোথা হ'তে?
কী চাও? কী মনে ক'রে এ-বিশ্বজগতে?
এই দ্বন্দ্ব এই মন্দ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ, এই নাট্য, এই মিথ্যা কথা
এই ঈর্ষা দ্বেষ ভরা নাচ মর্ত্যভূমি
মাঝখানে বলি : "ওগো কে আবার তুমি?"

মানি, পরে তিনি গাইছেন শিশুপুত্রকে অভিনন্দন ক'রে :

এস দিব্য এস কান্ত এস মিষ্টহাসি
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী!
এস ধরাধামে বৎস! হেথা বিশ্বময়
সবৈব কদর্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্তগর্জী বজ্র অন্ধকার
কণ্টক, অরণ্য শুষ্ক মরুভূমি সার।

কিন্তু এধরনের চিন্তাও ঠাকুর্দার মনে উদয় হ'ত না। কারণ জগৎটা যে মূলত খারাপ হ'তে পারে এটা ঠাকুর্দা কল্পনাই করতে পারতেন না তাঁর পুত্রের মত।

কারণ অবশ্য জানি। জীবন তখন জটিল ছিল না এত। কিন্তু জীবনের জটিলতা বাড়া ভালো বলে যদি মেনেও নিই তা হ'লেও সরলতা পবিত্রতার মতন গুণের দুর্ভিক্ষকে তো কাম্য বলা যায় না।

একথা কবিও প্রায় বলতেন। শুধু আমার কাছে নয় – বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকের কাছেই তাঁকে বলতে শুনেছি যে তাঁর পিতৃদেবের মতন লোক এজগতে খুব কমই দেখা যায়। মনে পড়ে লোকেন্দ্রনাথ পালিত তাঁকে বলতেন গয়াতে যে তোমার "দুর্গাদাস" মানুষ নয় ও অমানুষ – কারণ মানুষ দেবতা হ'তে পারে কেবল কল্পনার অত্যুক্তিলোকে —বাস্তবে নয়।

তখন কবি বলতেন যে যিনি কার্তিক দেওয়ানকে স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর কাছে দুর্গাদাস চরিত্র বাস্তবই—কাল্পনিক একটুও নয়।

কবির নাটকে প্রায়ই দৃঢ়চরিত্র মানুষের আবির্ভাব হ'ত ব'লে বিজ্ঞ বাস্তবীদের অনেকে হাসেন শুনতে পাই। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে আসলে

এঁদের এ লঘু হাস্যটাই হসনীয়। কারণ ভালো চরিত্র বিরল ব'লেই অবাস্তব একথা সত্য নয় এই জন্যে যে বিরল মানে নাস্তি নয়। কবি নিজেই গেয়েছেন

আলোর চাইতে আঁধার বেশি স্থূলের চাইতে শূন্য
(আর) বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য ?

কিন্তু তাই বলে আঁধারের চিত্রই বেশি বাস্তব এ একটা বুদ্ধির ভ্রান্তিবিলাস, **fallacy.** শ্রীঅরবিন্দও আমাকে লিখেছেন একটি পত্রে হেসে যে, বাস্তবাদের কথা বেদবাক্য ব'লে মেনে নিতে হ'লে বলতে হয় নভোচারী ঈগল হ'ল স্রেফ নাস্তি—অস্তি শুধু পঙ্কচারী কীট। কিন্তু এ-তর্ক থাক। আমি স্মৃতিকথা লিখতেই বসেছি—কবির চরিত্রকে ফোটানোই আমার উদ্দেশ্য তাঁর মতামতে বিচার খানিকটা অবান্তর। তবু কথাটা তুললাম শুধু বোঝাতে যে কবি স্বভাবে একজন তেজস্বী আদর্শপন্থী মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। কবির চরিত্র ও কাব্যকে সত্যি বুঝতে যাঁরা চান তাঁদের লাভ বই লোকসান হবে না যদি তাঁরা একটু খবর রাখেন কবির পিতৃদেবের যুগের হালচাল চলন-বলন, ধরন-ধারণ যার আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন।

*   *   *   *

এবার হারানো খেই ধরি।

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতার মধ্যেও ছিল যে একটি গভীর নির্লিপ্তি এটা যে রসিকদের চোখে প'ড়ে থাকবে যদিও ক্রমাগত তাঁর হাসির সামাজিক ও স্বাদেশিক পরিবেশের কথা শুনে শুনে একটু আশ্চর্য লাগে। তাঁর হাসির মধ্যে ছিল একটা বে-পরোয়া ভাব নলিনীদলগত শিশিরের মতন—নির্মল, সুগন্ধী অথচ অনাসক্ত অনাশ্রিত। তাই তিনি পারতেন ওভাবে ঠাট্টা তামাসা করতে গুরুজনের সঙ্গেও। সহজিয়া হওয়া সহজ হয় তখনই যখন মানুষ হয় স্বভাবে খানিকটা উদাসী। তাঁর দু' একটা ঠাট্টা তামাশার উল্লেখ করি এ কথাটা বোঝাতে।

*   *   *   *

বলেছি একটু আগেই আমার ডাক্তার দাদামহাশয়ের কথা। তিনি হোমিওপ্যাথ ছিলেন আর কঠোর সংশয়ী ধারালো মন সত্যি বিশ্বাস করতে পারত না হোমিওপ্যাথির রূপকথা। তাই তিনি শ্বশুরকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করতেন। যেমন ধরুন তাঁর ত্র্যহস্পর্শ প্রহসনে যেখানে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ভূদেব গেছেন রাজা বিজয়গোপালের বাড়ি, বলছেন : "মহারাজ ইচ্ছে করলে বড়লোক হ'তে পারতেন, আর আমি বড়লোক হ'তে

হ'তে হ'লাম না। তা কোনো ভাবনা নেই ওষুধ দিয়ে মহারাজকে বড়লোক ক'রে দিচ্ছি।"

মথুর (মহারাজের পারিষদ): ওষুধ দিয়ে বড়লোক করা যায় নাকি ?

ভূদেব: আপনি হোমিওপ্যাথি পড়েন নি দেখছি। Symptomatic treatment—আশ্চর্য, আশ্চর্য !

কুঞ্জ (আর একটি পারিষদ): এতে তাহ লে গরু হারালে পাওয়া যায় ?

ভূদেব: ও! তবে শুনুন। একবার একজনের ঠানদি মারা গিয়েছিল। সে গোঁফদাড়ি কামিয়ে, শ্রাদ্ধ টাদ্ধ ক রে আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি, তার ঠান্‌দি কবে মারা গিয়েছেন, কি রকম করে তাঁকে পোড়াতে নিয়ে গেল, পোড়াতে ক মণ কাঠ লাগল, শ্রাদ্ধেতে কত টাকা খরচ হ ল, ক'জন ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হ ল, দক্ষিণা কি রকম দেওয়া হ ল—ইত্যাদি symptom ঠিক করে মিলিয়ে লোকটাকে এক doze ওষুধ দিলাম। যেই দেওয়া, অমনি লোকটা বাড়ি গিয়ে দেখে—তার ঠানদিদি বেঁচে উঠেছে আর তার নিজের গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে।

* * * *

দাদামহাশয় খুব হাসতেন, তবু একদিন রুখে উঠে বলেছিলেন, "দ্বিজু, হোমিওপ্যাথিতে যদি কোনো অসুখ না ই সারে, তবে আমি নিরন্ন থেকে লক্ষপতি হ'লাম কী ক'রে শুনি ?"

কবি (অম্লানবদনে): খুব সোজা। ধরুন কলকাতায় বিশ লক্ষ মানুষ। তাদের মধ্যে পাঁচ পার্সেণ্ট—এক লাখ—কি আর বোকা নেই ? আচ্ছা। এদের মধ্যে পাঁচ পার্সেণ্ট কিনা বিশ হাজার লোকের অসুখে প্রত্যেকে যদি মাত্র একটিবারও আপনাকে তলব করে—পরে অবশ্য আর করবে না তবু বেঘোরে পড়ে দেখতে চেয়ে একটিবারও যদি ডাকে তাহ লে আপনাকে ষোলো টাকা ভিজিট দিলে ১৬ × ২০০০০—লক্ষপতি কি বলছেন শ্বশুর মশায়, আপনার তো অন্তত ত্রিলক্ষপতি হবার কথা আজ—হাঃ হাঃ হাঃ।

আর একদিনের রসিকতা আরো অভ্রভেদী। তখন মা বেঁচে। কবি তখন মুঙ্গেরে আবগারি ইনস্পেক্টর। দাদামহাশয় জামাইয়ের অতিথি। সামনের আমগাছে একটা বীর হনুমান। দাদামহাশয় মাকে বললেন: "সুরো ! (সুরবালা) গাছে কে বল্‌ তো ?" মা তখন ছেলেমানুষ মাত্র সতের আঠারো বছরের মেয়ে, বুঝতে না পেরে বললেন, "কে বাবা ?" দাদামহাশয় হেসে বললেন: "তোর শ্বশুর।" (অর্থাৎ নিজের বেহাই)। রসিক জামাতা তখন অদূরে কাঁটাচামচ নিয়ে এগস্‌ এণ্ড বেকনস্‌-

এর চর্চায় নিরত, মুখ তুলে নিরীহস্বরে বললেন: "শ্বশুর মশায়, মেয়েটি ছেলেমানুষ—বললেন একটা কথা জবাব দিতে পারল না থতমত খেয়ে। বলুন দেখি ঐ কথাটা একবার আমাকে—দেখুন জবাব জোগায় কিনা আমার মুখে, হাঃ হাঃ হাঃ।"

* * * *

ফিরে আসি বাল্যস্মৃতিতে—গানের কোঠায়। কি বলছিলাম যেন? হ্যাঁ লালচাঁদি গান করতে করতে বিরক্ত হ'য়ে গান ছেড়ে ঢুকলাম পুরাণ মহাভারতের অথই জলে।

কিন্তু ছাড়া এক, ছাড়ান পাওয়া আর। গান ছাড়তে আমাকে নিয়তি দেবেন কেন বলুন? ঢেঁকিকে তিনি স্বর্গে বড় জোর স্বর্গীয় তণ্ডুল দিতে পারেন ভানতে, এর বেশি কি ঢেকি নিজেই আশা করে?

একথা তো আপ্তবাক্য। তাই তো এলেন ঠিক এই সময়েই আমার রাঙা জেঠামহাশয় ৺হরেন্দ্রলাল রায় ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ওকালতী করতে। জেঠাইমা ছিলেন বিখ্যাত গায়ক প্রতিভার-অবতার ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বোন। চমৎকার কণ্ঠ ছিল তাঁর। তাঁর বড় ছেলে মেঘেন্দ্রলাল রায়ও গাইতে বাজাতে পারতেন একটু আধটু। কিন্তু সবচেয়ে ভালো গাইত মেঘেনদার পরের বোন নীলিমা ও তার পরের ভাই হেমেন। কী অপরূপ কণ্ঠ ছিল যে এ দুটি ভাই বোনের। নীলিমাদির বয়স তখন হবে ষোলো, সতের, হেমেনের—বার তের। নীলিমাদি গাইত সুরেনমামার খেয়ালি ঢঙে "যেন করুণস্বরে বীণা বাজিল" বা "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না"। হেমেন গাইত সুরেন মামার টপখেয়াল "আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে"—বা গ্রামোফোন থেকে তোলা ৺অঘোর চক্রবর্তীর খাঁটি টপ্পা "বিফলজনম" বা বিনোদিনীর অতি মিষ্ট খাম্বাজ "ও ধীরে তীরে করো পার।" এছাড়া ওরা কোরাসে গাইত বন্দেমাতরম্—ভাগলপুরের বিখ্যাত ধ্রুপদী উপেন্দ্র বাকচির সুরে। ও সুরে গানটি আমি কয়েকবছর আগে দিয়েছি গ্রামোফোনে হয়ত শুনে থাকবেন। কিন্তু পরে এ গানটি যতদিন না কোরাসে দেওয়াতে পারছি ততদিন আমার মনের একটি বড় সাধ থেকে যাবে অপূর্ণ। কারণ এ সুরটি যে কী চমৎকার - তা যাঁরা সে-কোরাস না শুনেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না। রাঙা জ্যেঠামহাশয়ও দুজনেই যোগ দিতেন আমাদের ঐক্যতানে। তখন ঘর যেন গম গম করত। কোরাস গানে তাঁর তুল্য শক্তিমত্তা অদ্যাবধি কেউ প্রকাশ করতে পারেনি—কারণ তাঁর সুর রচনার ভঙ্গি, প্রাণের উৎসাহ, আনন্দের পৌরুষ ছিল আশ্চর্য অদ্বিতীয়! যাঁরা সে সময়ে তাঁর শেখানো দলের ব্যূহাগ্রে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গান তাঁর মুখে শুনেছেন (আমরাও প্রায়ই থাকতাম এ কোরাসে) তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করতেন যে

তাঁর গানের কথা ও সুরের সংমিশ্রণে যে আগুন জ্ব'লে উঠত সে আগুন আর কোনো বাংলা গানেই জ্বলে ওঠে নি তখন পর্যন্ত। যাক—রাঙা জ্যেঠামহাশয়দের কথা আর একটু বলি।

নীলিমাদির পরেই প্রতিমা। সে ছিল কবির বড় আদরের। মায়ার চেয়ে কবি তাকে একটুও কম ভালবাসতেন না একথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। দেখতে সে সুন্দর ছিল না মায়ার ম'ত কিন্তু ঐ কালো মেয়েটির মনটি ছিল এমন স্নেহে ভরা যে সে দুদিনেই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় কন্যা। কোনো কাজই সে ভালো পারত না—গান গাইতে পারত বটে; কিন্তু যেমন গড়পড়তা মেয়ে গায় সাদামাটা। আমাদের কোরাসের দল সে পুরু করত কিন্তু সে শুধু তার গলার ভার দিয়ে, ধার দিয়ে নয়। কোরাসের গানগুলি উজ্জ্বলতা পেত প্রধানত কবির ওজস্বী কণ্ঠের উচ্ছ্বাসে আর নীলিমাদির ও হেমেনের গলার জোরে। তারা সপ্তকের গান্ধার মধ্যমেও ওদের গলা দাঁড়াত ঠিক যেন বাঁশির সুরে—আমার গলা নিভে যেত ওদের পাশে। ঐ বয়সেই কী যে দরদভরা গলা ছিল ওদের! শুনলেন না তো সে-গান তাই জানলেন না কবির কোরাস গান কী রকম ঝলমলিয়ে উঠল ভালো গলার দীপ্তিতে।

নীলিমাদি আরো ভালো গাইত একলা—solo গান। কত গান যে সে শিখেছিল অল্পদিনেই কবির কাছে! "নিখিল জগত সুন্দর তব" "আজি তোমারি কাছে ভাসিয়া যায়" "শুধু দুদিনেরি খেলা" ইত্যাদি। তার চেয়ে ভালো কণ্ঠ মাত্র একটি মেয়ের শুনেছি, সে ৺উমা (বসু)। তবে উমা ছিল সবদিক দিয়েই prodigy—একমেবাদ্বিতীয়ম্ - তাই তার সঙ্গে কোনো মেয়েরই গানের তুলনা সম্ভব নয়।

হেমেনও সুরু করল গান শেখা কবির কাছে। ঐ বয়সেই তার গলার কী যে মিষ্টি তানের বাহার ছিল! সে যখন গাইত "এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি" বা "সারা সকালটি ব'সে ব'সে"—তখন ঘরে সুরের অশরীরী মিষ্টতা যেন শরীরী হ'য়ে উঠত, সত্যি বলছি।

এদের মুখে কবির গান শুনতে শুনতে আমার প্রথম চেতনা জেগে উঠেছিল বাংলা গানের নিজস্ব মহিমা সম্বন্ধে—তাইতো এদের কথা এত ক'রে বলছি। বেশ মনে আছে, যখন হিন্দুস্থানি গানের অল্পবিত্তারূপিণী ভয়ংকরিণীর কণ্ঠে মালা দিয়েছিলাম তখন সে রূপমোহে ঠিকে ভুল হ'ত অনেক সময়েই। কিন্তু যখন এদের গলায় শুনতাম কবির এই সব গান—মত্ত মতির স্বাস্থ্য ফিরে আসত মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সহজ সৌন্দর্যবোধের অরুণোদয় হ'ত যার ফলে দেখতে পেতাম বাংলা গানের কাব্যাকাশে কত মেঘ কত রঙে রেখায় গতিতে চলেছে সুরের হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে আবেগের

নৃত্যলীলায়—যার ছন্দ ক্রম ভঙ্গি এক অদ্বিতীয় সুষমায় অপরূপ হ'য়ে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। বাংলা গানের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে নয় এ প্রতীতি আমার শৈশব মনেই বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল কবির আশ্চর্য প্রতিভার এজেহারে।

আজকের দিনে আপনাদের কাছে মনে হ'তে পারে—"এ আর কী এমন একটা নব জাগরণের কথা হ'ল!" কিন্তু যদি মনে হয় তাহ'লে জানবেন আপনারা ঠিক ধরতে পারছেন না সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে বাংলা গানে আস্থা আসাটা কতখানি আশ্চর্য ছিল। হিন্দুস্থানি সুরে তখন বাঙালি সবে রস পেতে আরম্ভ করেছে: অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকা গোস্বামী, অন্ধ শরৎ, নিকুঞ্জ দত্ত, বিশ্বনাথ রাও, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ ওস্তাদি গীতি প্রতিভার চুম্বকে। আমরা এ-রসিকদের অগ্রণী ছিলাম কেন না আমাদের বাড়ি ছিল হিন্দুস্থানি গানের একটি প্রধান মজলিশ—আমদরবার। আশৈশব বড় বড় ওস্তাদ কবিকে গান শোনাতে আসত—গান শোনাতে পেলে ধন্য হ'য়ে যেত—তাঁর মুখের একটা বাহবা পেলে সেলাম ঠুকে ঠুকে তারা অস্থির। এত বড় কদর দান তার উপর "মশ্‌হুর" জনাব! স্থির থাকা কি সহজ কথা?

কিন্তু এইসব ওস্তাদ "গাওয়াইয়া-র" চেয়ে আমাদের কাছে ঢের বেশি আদরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর খেয়াল (বা টপখেয়াল) ছিল এমন অদ্বিতীয় সৃষ্টি যে শুনলে চম্‌কে যেতে হ'ত। কবি হিন্দুস্থানি গানের মর্মে প্রবেশ করেন কৈশোরেই তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে। কিন্তু তারপর তিনি খুব বেশি ভক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরের ছেলে ক'রে ঘরে ফিরিয়ে আনেন--অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব ক্ষেত্রে। এ যুগে একটা কথা প্রায়ই শুনি যে আমাদের গানে হার্মনি আমদানি না করলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নৈব নৈব চ। একথা এক সময়ে আমারো মনে হ'ত। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোধ হয় সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই মনে হবে (শুধু এদেশে নয়—ওদেশেও) যে আমাদের গানে হার্মনি আমদানি করলে ভারতীয় সঙ্গীত হবে ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট।* ও হবার নয়। বাংলা ভাষায় ইংরাজি ইডিয়ম দিলে যে রকম অশ্রাব্য শোনায় কানাড়া বাগেশ্রী মালকোষে হার্মনি আনলে তার চেয়েও বেখাপ্পা শোনাবে। একথা কবি বুঝেছিলেন সুরেন্দ্রনাথের গান শুনে। তাই তিনি কোরাস গানই নেন কিন্তু হার্মানির পথে নয়—মেলডির পথে। যেখানকার যা। প্রতি দেশের আর্ট তার স্বভাবকেই অনুকরণ করবে। এই স্বভাব বদলায়

* একথা রোলাঁও আমাকে বলেছিলেন "তীর্থংকর" দ্রষ্টব্য। য়ুরোপেয় সঙ্গীতজ্ঞরা এখন মেলডির দিকে ফিরেছেন এ-ও একটা জানা কথা। রোলাঁরও হার্মনির প্রগতি শেষ হ'য়ে এসেছে এ উক্তিও তীর্থংকর দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ভুঁইফোঁড় ভঙ্গিতে নয় উদ্ভট চালে নয়। কী ভাবে বদ্‌লাবে তা-ও ধরতে পারেন এক প্রতিভারা। এখানে কমনসেন্স বা মনগড়া থিওরি অচল—শিল্পীর প্রাতিভ বোধই এখানে চরম বিধানদাতা। য়ুরোপীয় সঙ্গীত ভালোবেসেও রবীন্দ্রনাথ তথা অতুলপ্রসাদ হার্মনিকে নিতে পারেন নি—দ্বিজেন্দ্রলাল নিতে চেয়েও দেখেন সম্ভব নয়। এমন কি তাঁর বিলাত জীবনের প্রথম দিকে ওদের অনেক সুর অবিকল নিয়েও উনি দেখেন যে আমাদের গানে ওদের ভঙ্গির খানিকটা মাত্র নেওয়া চলে- নৈলে ভারতীয় সঙ্গীতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য থাকে না—থাকতে পারে না। সব শিল্প সম্বন্ধেই একথা খাটে—গানে আরো বেশি করে খাটে। কেননা উচ্চবিকশিত সঙ্গীতে তার স্বাভাবিক ধারার প্রভাব অন্য অন্য আর্টের চেয়ে শুধু যে বেশি জটিল তাই নয় বেশি ব্যাপক কেননা গান বিস্তার করে তার সুরের জাদুতে - যে-সুরের কোনো মানস ব্যাখ্যাই নেই। তাই গানের দিশা যে দেয় সে বাইরের শ্রুতি নয়—অন্তরশ্রুতি। সে-শ্রুতি যাঁদের বিধাতা দেন শুধু তাঁরাই গানের রাজ্যে নব নব পথের ডাক শুনতে পান এখানে গণমনের মত অগ্রাহ্য -উচ্চবিকশিত সায়েন্সের সঙ্গে এখানে গানের মিল আছে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য অন্তঃশ্রুতির আকাশ থেকেই পেয়েছিলেন এ দৈববাণী। তাই বাংলাগানকে তিনি সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন লীলায়িত ক'রে। কবি তাঁর কাছে এই নূতন পথের দিশা পেয়েছিলেন ব'লেই সুরেন্দ্রনাথের কথা এত ক'রে ব'লতে হ'ল। কবির শ্রেষ্ঠ বাংলা গানে সুর ও কাব্যের যে পরিণয় হয় তার সমৃদ্ধির জন্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন বিশেষ ভাবেই ঋণী। একথা তিনি শতমুখে স্বীকার করতেন। ঋণ স্বীকার করতে তাঁর এতটুকু কুণ্ঠা কোনোদিন দেখি নি। কঠোর সত্যবাদেও তিনি ছিলেন যেমন নিঃসঙ্কোচ, কৃতজ্ঞ প্রণামেও তেম্‌নি।

কিন্তু মনে রাখবেন আমরা তখন ছেলেমানুষ। তাই বলাবলি করতাম প্রায়ই যে হিন্দুস্থানি গানের কাছে বাংলা গান খতিয়ে এখনো নাবালক। হনুমান সিংএর খেয়াল, বিশ্বনাথের ধ্রুপদ, সুরেন্দ্রনাথের টপখেয়াল, মৈজুদ্দিনের ঠুংরি, মিসিরদের টপ্পা এসবের পাশে কি আর বাংলা গান দাঁড়াতে পারে কখনো? তাই আমি বলতাম কবিকে প্রায়ই "যাই বলুন আপনি—আপনার বাংলা গান ভালো হ'লেও হিন্দুস্থানি গানের কাছে কিছুই নয়।" আমার সে-সময়কার সবজান্তা মেজাজের একটিমাত্র নাম দেওয়া চলে—ফাজিল। এ-ফাজলামিতে বোধ হয় সদাশিবেরও তৃতীয় নেত্রে আগুন জ্ব'লে উঠত কিন্তু কবির জীবননীতি ছিল—ছোটদেরও স্বাধীনচিন্তাকে দাবিয়ে রাখা চলবে না—উস্কেই দিতে হবে। তাই আমাদের অবাধ অধিকার ছিল অনধিকার চর্চা করার—মানে অবশ্য তাঁর কাছে। "গুরুজন" কথাটায় তাঁর গা উঠত

রি রি ক'রে। ঐ নিয়ে তাঁর মনে একটা চাপা দুঃখ ছিল, মাঝে মাঝে বলতেন আমাদের।

বলতেন "জানিস তোদের ঠাকুর্দা আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিখিয়েছিলেন তাঁকে সমীহ ক'রে চলতে। ফল হ'ল তাঁর ছায়াও আমরা মাড়াতাম না কোনোদিন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি চাইতেন আমাদের সঙ্গ। আমাকে প্রায়ই বলতেন—দ্বিজু, আয় না বাবা, একটু বোস না কাছে;' কিন্তু আমি চেষ্টা করলেও বেশিক্ষণ তাঁর কাছে বসতে পারতাম না। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন শেষ বয়সে 'এখন দুঃখ করলে হবে কি, চিরকালটা ছেলেমেয়ের কাছে বাবা-রাগিণীই শুনিয়েছি, এখন বন্ধু-রাগিণী গাইলে তারা ভড়কাবে না তো কী?"

কবি দেখেই শিখেছিলেন, তাই আশৈশব কোনোদিনই তাঁকে আমাদের কাছে বাবা-রাগিণী গাইতে শুনিনি, প্রথম থেকেই ছিলেন তিনি আমাদের গুরু, বন্ধু, সচিব, সখা, সতীর্থ! শুধু মায়া বা আমার কাছেই নয়—মেঘেনদা, নীলিমাদি, প্রতিমা ও হেমেনের কাছেও তিনি আলাপ শোনাতেন বয়স্য-রাগিণীরই—পিতৃব্য-রাগিণীর নয়। তাই অত বড় বলিষ্ঠ যশস্বী প্রতাপী মানুষটির সঙ্গেও ওরা সবাই সমানে সমানে কথা বলতে পারত এত সহজে। তাঁর কাছে এলে ভয়ের মাধ্যাকর্ষণ লুপ্ত হ'য়ে যেত ব'লে মনের যেন পাখা উঠত। আমি তো তাঁর সঙ্গে যাকে বলে "আড্ডা" দিতাম দশ বার বছর বয়স থেকেই। কোনো পিতৃবন্ধু যদি বলতেন—(এমন প্রায়ই ঘটত)—"বাবা, যাও তো ও ঘরে—খেলা করো গে—" কবি বলতেন: "না থাকুক ও।"

বন্ধু: কী বুঝবে ও বুড়োদের তর্কাতর্কি?

কবি: বুঝতে শিখুক।

বন্ধু: এ আপনার অন্যায় দ্বিজু বাবু! ছেলেমানুষ বুড়োদের সঙ্গে থাকলে হ'য়ে ওঠে এঁচড়েপাকা;

কবি: উঠুক—কাটিয়ে উঠবে পরে কাঁঠাল পাকার সময়। তাছাড়া ছেলেমানুষদের আমরা যত ছেলেমানুষ ভাবি তত ছেলেমানুষ তো তারা নয়।

অনেকদিন বাদে যখন বিলেতে মিসেস ধর্মবীরের আট বছরের মেয়ে লীলাকে বলি: **"Lila! I am glad I won't be here when you grow up, for you would break my heart."** তখন আট বছরের সুন্দরী মেয়ে কটাক্ষ ক'রে বলেছিল হেসে: **"But you would be two old then."** মিসেস ধর্মবীর মেমসাহেব হ'য়েও এ-ঠাট্টায় আপত্তি করেছিলেন, বলেছিলেন—লীলা বেশ জানে ও সুন্দরী, শেক্সপিয়র বলেন নি—**'If ladies were but young and fair they**

have 'the gift to know it.' এসব ফের ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কেন আর? এম্‌নিই মেয়েদের সাম্‌লানো শক্ত।" আমি বলেছিলাম: "সে কি দিদি! লীলা তো কচি মেয়ে—"আট বছরের!" তাতে দিদি ব'লে উঠেছিলেন: "আমি যখন আট বছরের ছিলাম তখন কতটা যে বুঝতাম আমার বাপ মা একটুও টের পান নি দিলীপ।"

তৃতীয় উল্লাস

চম্‌কে উঠেছিলাম শুনে—তাই আজো ভুলতে পারিনি কথাটা। বিলেতে বুঝি নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম কবির ঔদার্য, সাহস ও সরলতা। তিনি জানতেন ছেলে-মানুষ দেহের বহরে ছোট হ'লেই সব সময়ে মনের বহরে ছোট হয় না। শুধু তাই নয়, সে না-বোঝার মধ্যে দিয়েও অনেক কিছু বোঝে: গাছ যখন রস টানে তখন সব সময়ে জানে কি—এ-রসে শুধু যে পাতারা সজীব থাকে তাই নয় ফুল ও ফল ফলবে? মানুষ যে অনেক সময়েই জ্ঞান আত্মসাৎ করে না-জেনে, এ-গভীর উপলব্ধি যোগার্থীদের এত প্রত্যক্ষভাবে হয় যে—কিন্তু সে অন্য কথা।

কবি কিন্তু তাই ব'লে রুসোর নীতিতে বিশ্বাস করেন নি, কোনোদিনই যে মানুষকে সবদিকে ছাড়া দিলেই সে দেখতে দেখতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হ'যে উঠবে। না। কুসঙ্গের বিষময় ফল তিনি জানতেন। তাই খুব কড়া নজব রাখতেন পাছে কুসঙ্গীর দলে পড়ি। রাসেলের "এডুকেশন" বইটিতে আছে—সবদিকে শিশুদের স্বাধীনতা দিতে হবে এ একটা কথাই নয়, ধরো, সে যদি চায় আলপিন গেলার স্বাধীনতা?—অসম্ভব। যতদিন না তাদের কার্যকারণজ্ঞান খানিকটা গ ড়ে উঠেছে ততদিন যে সে রক্ষাকবচের অপেক্ষা রাখে, একথা কবি খুব ভালো ক রেই জানতেন। আমার বলার উদ্দেশ্য—কবি নজর রাখতেন, কিন্তু নজরবন্দী ক রে না। আশ্রয় দিতেন কিন্তু স্নেহের পাখার নিচে সুপ্ত রেখেও না, স্নেহেব খাঁচার মধ্যে রুদ্ধ ক রেও না। মনে আছে পরে যখন ইস্কুলে ভর্তি হই একটি লম্বামতন ছেলে আমার পিছু নিয়েছিল। তখন হঠাৎ তিনি হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন—হেডমাস্টার মহাশয়কে ব'লে পাঠালেন আমাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবেন। ডি, এল, রায়ের ছেলে ব লে আমার তখন ইস্কুলে খুব প্রতিপত্তি —আরো আমি "সেকেণ্ড বয়" ছিলাম ব'লেও বটে। সে-ছেলেটিকে ওঁরা শাসিয়ে দিলেন। আমি সত্যিই তখন কিছুই জানতাম না স্কুলে কি ধরণের নোংরামি ঘ'টে থাকে! তের বছর বয়স পর্যন্ত বই প'ড়েই যা জানার জানা হয়েছিল হাতে-কলমে কেউ কিছু ক'রে দেখায় নি—যে কারণেই হোক। যাক এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ। এর উল্লেখ করতাম না—তবে পাছে আপনারা ভেবে বসেন কবি অসমসাহসী ব'লে কল্পনাবিলাসী ছিলেন তাই লিখলাম। না। কবি জানতেন পিতার দায়িত্ব কাকে বলে। তবে এ-ও জানতেন যে নিষিদ্ধ ফলের 'পরেই শিশুদের লোভ বেশি। তাই ক্রমাগত নিষেধের ঘেরাটোপে আগলে রাখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তা ছাড়া—অবশ্য এখানে অনুমানের কোঠায়ই আসতে হচ্ছে—হয়ত তিনি জানতেন যে রকমারি

পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে কোনো সুস্থমন রাতারাতি অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারে না। অন্তত মনোলোকে নানা বিষয়ে আমাকে যে তিনি "চ'রে খেতেই" বলতেন—দূর থেকে দৃষ্টি রেখে—এ আজ খুবই মনে হয়।

যাক যা বলছিলাম : তিনি চাইতেন ছেলে তাঁর সব কিছু জানুক বুঝুক চিনুক—ভাবুক—যতটা পারে বেছে নিক কী ধরণের খোরাকে তার মনের প্রাণের পুষ্টি সহজে হবে! বোধ হয় পড়াশুনোর দিকে আমার ঝোঁক দেখে কতকটা আশ্বস্তও হ'য়ে থাকবেন। আর দেখে, যে আমি মিথ্যাকথা খুবই কম বলতাম। কারণ এই দিকে তাঁর (ও আমার দ্বিতীয় গুরু গিরিশ মেশোর) খরদৃষ্টি ছিল। লোকে তাঁর শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিকে আজব মনে করছে, ছেলে গান শিখছে. থিয়েটার দেখছে, বুড়োদের দলে মিশছে এঁচড়ে পেকে উঠে সাংঘাতিক তর্ক করছে এসব কীর্তিকলাপে তার অনেক শুচিব্রত বন্ধুই রীতিমত ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতেন—তাঁকে এ নিয়ে বকতেন ঝকতেনও তাঁরা যথেষ্ট। কিন্তু কবি যখন ভেবেচিন্তে কোনো একটা পথ নিতেন, সে পথ সহজে ছাড়তেন না। তাছাড়া, বলেছি, লোকমতের সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর উদাসীন্য। তাই আমি তাঁর গ্রন্থাগারের অথই জলে হাবুডুবু খেতে চাইতেই তিনি সব আলমারির চাবি আমার হাতে অকুণ্ঠে তুলে দিলেন।

সত্যিই সে-গ্রন্থাগার ছিল সমুদ্র বিশেষ। কত রকমের উদ্ভট বইই যে তাঁর ছিল! বই কেনা ছিল তাঁর একটা "নেশা"। কত টাকা যে তিনি অপব্যয় করতেন বাজে বই কিনে! ভালো বইও ঢের ছিল—কিন্তু বাজে বইও ছিল বিস্তর তাঁর গ্রন্থাগারে। খুলে খুলে দেখতাম। ওমা! এ কী কাণ্ড। কত বইই যে তিনি দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে পড়েছিলেন! অনেক বইয়ের মাঝে আবার ফালতো পাতা গাঁথা – মন্তব্য সমেত!

কত বইই যে তাঁর লোকে নিয়ে যেত—ফেরৎ দেবার আর নাম নেই। যাক। আবার কিনতেন। বলতেন বই কেনার মতন সদভ্যাস খুব কমই আছে। তাঁর প্রভাবে প ড়ে এ-সদ্বিদ্যায় পাকা হ'য়ে উঠলাম আমি দেখতে দেখতে। এক কাশীদাসী মহাভারতই যে কত সংস্করণ কিনেছি। অমিতব্যয়ের বিপক্ষে তিনি পাঠ দিতেন না ভুলেও (যেটা পরে দিতেন আমার নিযুতপতি দাদামশায়):

"যেজন দিবসে মনের হরিষে জ্বালায় মোমের বাতি—"ইত্যাদি।"

কিন্তু মজার কথাটা বলি। তাঁর গ্রন্থাগারে মহাভারত রামায়ণ পুরাণ দর্শন কালিদাস ভবভূতি ইত্যাদি পেয়ে হাতে খড়ি সুরু হ'ল এই সব নিয়েই। প্রথম কাঁশীদাস কৃত্তিবাস তারপর গদ্য মহাভারত ব্যাস বাল্মীকির অনুবাদ। প'ড়ে ফেললাম এসবের অনেক কিছু—অবশ্য গল্পাংশগুলোই। তারপরে ধরলাম পুরাণ। বিষ্ণু শিব

অগ্নি বরাহ এসবই পুরাণের অথই জলেও নাস্তানাবুদ হ'লাম—পড়লাম প্রতি একশোর মধ্যে অন্তত ত্রিশ পাতা। দেবী ভাগবত, হরিবংশ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, এমন কি যোগবাশিষ্ঠেরও নানান্ গল্পাংশ। অনেক বইয়ের স্তব টবও পড়তাম—কী বুঝতাম মনে নেই এখন, তবে পড়তাম মনে আছে। এই রকম অত্যধিক প'ড়ে (কেরোসিনের আলোয়) চোখ খারাপ হ যে গেল আট ন বছর বয়সেই। ডাক্তার মাতামহ কবিকে শাসালেন। অগত্যা কবি আমাব বাত্রে পড়া বন্ধ ক'রে দিলেন। কিন্তু হবি তো হ এই সময়েই, বছর দশেক বয়সে, নেশা চাপল বাংলা সাহিত্য পড়ার। এক এক ক'রে বছব তিনেকের মধ্যেই প'ড়ে ফেললাম ঃ—

বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, দামোদর, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতিব গ্রন্থাবলী। না মিথ্যা বলা হ'যে যাচ্ছে: বিদ্যাসাগরের দু একটা বই বাদ গিয়েছিল, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহাব, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য, আবও কি দু তিনটে বই। তবে মনে আগুন জ্বালিযে দিল "পলাশীর যুদ্ধ"। এখনো আবৃত্তিতে পরীক্ষা দিতে পাবি "কোথা যাও ফিবে চাও সহস্র কিরণ বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি" দুচারটে স্তবক "নাচিল সৈনিক বক্ত ধমনী ভিতবে" ইত্যাদি। আরো কত কী মুখস্থ বলতে পাবতাম—দুচারবাব কোনো কবিতা পড়লে, এমন কি শুনলেও আমার মুখস্থ হ যে যেত। ভাবছেন বাড়িযে বলছি? নিশ্চয় ভাবছেন। আচ্ছা প্রমাণ দিচ্ছি। (মিথ্যা কথা আমি বলি, কিন্তু খুব কম।)

বসময লাহাব নাম হযত শুনে থাকবেন। কবির তিনি এক প্রিযবন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। তিনি কবির অনুকবণে কযেকটি হাসির কবিতা লিখেছিলেন "আরাম" নাম হ'ল বইটির। তাতে একটি কবিতা তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। একদিন দাঁড়িয়ে আবৃত্তির সময়ে একটি চরণে ঠেকে যান মাঝ বরাবর। আমি টুপ ক'রে prompt ক'রে ব'লে দিলাম। রসমযবাবু যা আদর করলেন! মনে রাখবেন তখন আমার বযস আট কি নয় বৎসর। কবিতাটি এই (মুখস্থ থেকেই লিখছি, প্রমাণ: "আরাম" এক কপিও নেই এখানে আশ্রমে।)

বড় গুরুতর বেজেছে হৃদয়ে! হায়, কী করিনু পাপ!
প্রভু, সান্ত্বনা কিছুতে পাই না যত করি অনুতাপ!
কেবলি হে প্রভু, যাতনার ভরে বহিছে দীর্ঘশ্বাস।
সারারাত ধ'রে ঘুম নাহি চোখে, করিয়াছি হা হুতাশ।
অভাবের তরে নহে প্রভু নহে, সচ্ছল জমিদারী।
সখারাও মোরে বড় স্নেহ করে—হয়েছে উপাধিধারী।

পরিজন যত সদা অনুগত, সুখী অতি মোর সুখে।
কিন্তু আজি হায়, প্রভু জ্ব'লে যায়, উঃ, কী যন্ত্রণা বুকে!
প্রেমিকার তরে নহে এ বিরহ, নহে তার অভিমান:
শত উপাসক ছেড়ে সে আমারে করেছে হৃদযদান।
শত্রু আমার কেহ নাই প্রভু, তোমারি করুণাবলে।
অপরের সুখে করি না ঈর্ষা—তথাপি বুক যে জ্বলে!
কেন পাইতেছি আজি এ-যাতনা প্রভু, কী বলিব আহা!—
খেয়েছিনু কাল আস্ত কাঁঠাল, হজম হয় নি তাহা।

রসময় বাবুর রসিকতা আজো মনে পড়ে। তিনি কবিকে একটি উপহার দিযা-ছিলেন তার নাম এতখানি:

(আমি) সারাদিন রাত তোমাবে দেখিতে বহিব হেলিযা দেয়ালে।
(তুমি) ঘুমভাঙা চোখ মুছিতে মুছিতে মুখ দেখে যেও খেযালে।

উপহারটি কী বলুন তো? পারলেন না তো? একটি বড আযনা। মজাব নয?

*   *   *   *

এছাড়া পদাবলীব অনেক পদ মুখস্থ ছিল। গানেব তো কথাই নেই। কবির কাছে আমাকে বসতে হ'ত: তিনি গানেব পদ প্রাযই ভুলে যেতেন ব'লে আমি থিযেটারি জনান্তিকে উস্কে দিতাম এমন চোস্ত্ ক'বে—সত্যি। এ নিযেও বাহাদুবি করব না? অনেকদিনের সংস্কাব! কী বাহাদুব নাম কিনেছিলাম জানেন না তো। "শ্রুতিধর" উপাধি পেতে পেতে পেলাম না।

কিন্তু এই সব করতে করতে ইংরাজি ভাষায বডই কাঁচা র'যে গেলাম। কবি প্রাইভেট টিউটর রাখতেন থেকে থেকে, কিন্তু তাঁদেব আমি প্রায়ই পটিয়ে নিতাম। বলতাম:—ইংরাজি পরে হবে, বাংলাই পডান না। এক মাষ্টাব মশায়কে গান শিখিয়ে আরো সুবিধে হ'যে গেল। তিনি আমাদের একটা কালোরঙেব টেবিল হার্মোনিযম এক আঙুলে বাজিযে তারস্বরে গাইতেন এই সার্গমটি:

রে গা সা বে সা মা গা রে গা মা মা ধা পা
ব'লেই— ক ত কা ০ ল প রে ব ল ভা র ত রে।

তাঁকে বলতাম: "ও কী মাষ্টার মশায়! কা ও ভা-যে দুমাত্রা দীর্ঘস্বর! এ-তেও অমনি দুমাত্রা দাঁড়াতে হবে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা দেখ তো এবার হচ্ছে কিনা—কত কা আ ল প রে এ ব ল ভা আ র ত রে এ—হচ্ছে?"

ঘোর কলি তার আর সন্দেহ আছে—নৈলে ছাত্র হয় মাষ্টার ?

কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—দেবভাষায় দৈববাণী—উপায় কি ? তার পরেই এক মাষ্টার এলেন, পড়লাম ফ্যাশাদে। কারণ তিনি "কতকাল পরে" শিখলেন না। অগত্যা তাঁর কাছে মলিনমুখে ঢুলে ঢুলে পড়তাম ল্যাম্বের Tales from Shakespeare, আর মনে পড়ত কবির "আলেখ্যে"র হতভাগ্য কবিতা :

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে।
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে, পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।

মনে হ'ত—সত্যি বলছি—সে-হতভাগ্যের অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো—তাকে ল্যাম্বের গল্প পড়তে হয় নি।

তবে স্যামুয়েল বাটলারের The Way of All Flesh ব'লে একটি নভেলে তিনি লিখেছেন যে প্রায়ই দেখা যায়, ভাগ্যদেবী একবার যে পুত্রকে 'পোষ্য' নেন তাকে আর 'ত্যাজ্য' করেন না। এ-মাষ্টার মহাশয়—বোধহয় বিরক্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলেন—এ ছেলের কিছু হবে না ব'লে।

হবে কোত্থেকে ? তাঁর পড়া কি আমি কিছু করতাম ? তিনি যে-ই চ'লে যাওয়া—অমনি ইংরাজি বই, ভূগোল, পাটীগণিত প্রভৃতির খাতাপত্র, সব উঠত আলমারির চালে। আমি বস্‌তাম, হয় অমৃত বসু, গিরিশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি নাটক নিয়ে, নাহয় দীনেন রায়, পাঁচকড়ি দে, সুরেন ভট্চায, যতীন সিংহ প্রভৃতির উপন্যাস নিয়ে।

কবিতা এ সময়ে ভালো লাগত না তেমন—এক কবির মন্দ্র সীতা জাতীয় কবিতা ছাড়া। হ্যাঁ, ভাওয়াল কবি গোবিন্দদাস খুব ভালো লাগত। তাঁর ভক্ত ছিলেন আমার গিরিশ মেশো ব'লে আরো। গিরিশ মেশো প্রায়ই আবৃত্তি করতেন গোবিন্দ-দাসের একটি কবিতা বড় মজা লাগত শুনে : দুই সতীনের ঝগড়া। এটি তাঁর কোনো বইয়ে পাই নি—কোন্ এক মাসিকীতে বেরিয়েছিল বুঝি, মনে নেই। তবে মেশো বলতেন মনে আছে :

"শোনো মণ্টু, বড় সতীন মাটিতে শুয়ে আছেন দুয়োরাণী। ছোট কিনা সুয়ো, পাশ দিয়ে যেতে গায়ে পা লেগে গেছে। আর যাবে কোথায় দুয়ো ঝংকার দিয়ে উঠলেন :

'বলি রাজার মেয়ে গরব ভারি ঢলিয়ে চলো গা !
মনের অহঙ্কারে মাটির 'পরে পড়ে না বুঝি পা !

দিলি কতকগুলো পায়ের ধূলো আঁচল-পাতা পেয়ে!
চোখের মাথা খেয়ে দেখ না চেয়ে ভালোবাসা খেয়ে!'

এখন ছোট—মানে স্থয়ো—রসিকা তো, বললেন টুক্‌ ক'রে:

'বলি চাঁদবদনী আদরিণী সোহাগ যদি হেন
ক'রে অমন রঙ্গ সোনার অঙ্গ ধুলোয় লুটোয় কেন?'

তারপরে আর মনে নেই। সে আজ ত্রিশবছর হ'তে চলল। সে বয়স কি আর আছে বন্ধুবর? তখন এর সবটা আবৃত্তি করতে পারতাম।

* * * *

একটা কথা লুকোনো রাখছিলাম। কিন্তু ব'লেই ফেলি। যা ভাববার ভাবুন। বড়াই ক'রে পেছপাও হওয়া কি ভালো? লোকমত? আর কত বিরুদ্ধ হবে? হ'লেও লাগে তো খুব মন্দ না।

ভালো লাগত ভারতচন্দ্র। বিদ্যাসুন্দর কী চমৎকার যে লাগত! এখনো মনে হয়—এ বইটি না লিখে গেলে এ সেন্সরী যুগে আদিরসের অনেক স্থূল শিহরণ থেকেই আমরা বঞ্চিত হ'তাম। কালিদাসের ঋতুসংহারও ভালো লাগত ঐ এক কারণেই। ভারতচন্দ্রের ইঙ্গিতেই বলি: "বুঝ লোক যে জানো সন্ধান।"

* * * *

হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবেন রবীন্দ্রনাথের নাম এখন পর্যন্ত করি নি। কারণ করলে মিথ্যা বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ পড়তাম বৈকি, কিন্তু খুব রস পেতাম না সে সময়ে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়া তো এখনকার আবহাওয়া ছিল না। সে-সময়ে কবির মুখে যে-সব লেখকের নাম সবচেয়ে বেশি শুনতাম তাদের লেখাই পড়তাম বেশি। কবি ভালোবাসতেন মধুসূদনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের বাজরে শিঙা, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, ভবভূতি, কালিদাস, শেক্ষপীয়র, ব্রাউনিং, ওয়র্ডসওয়র্থ, ম্যাথিউ আর্লণ্ড—অর্থাৎ ওজস্বী কবিতাই বেশির ভাগ। বেশ মনে আছে শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিতই তাঁকে তর্ক ক'রে বোঝান যে রবীন্দ্রনাথ মস্ত কবি। কবি তর্কে হেরে স্বীকার করেছিলেন একথা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি কবিতার উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করতেন:—যেতে নাহি দিব, দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য। নিরুদ্দেশ যাত্রা নিয়ে লোকেন কাকার সঙ্গে কবির তর্ক মনে পড়ে। কবির বক্তব্য ছিল: "যা বোঝা যায় না তাতে আমি নেই।" এ মত তাঁর শেষ পর্যন্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেরও প্রশংসা করতেন, প্রবন্ধেরও কিন্তু তবু একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের প্রতিভার প্রশংসা করতেন যে-টোনে সে-টোনের উত্তাপ লাগত যখন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রশংসা করতেন। আমার মনে আছে তাঁকে একদিন এমন কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। "আচ্ছা বাবা, নবীনচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি নন?" তাতে তিনি বলেছিলেন: "না রবীন্দ্রনাথ বড়।" কিন্তু যেভাবে বলেছিলেন আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। যে বিষয়ের আলোচনা তিনি চাইতেন না সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠলে এমন একটি আকস্মিক চাপা গমক তাঁর কণ্ঠস্বরে বেজে উঠত যে দারুণ ভয় করত। সরল, স্নেহময় মানুষটি—শরতের মেঘের মতনই হাল্কা যখন প্রসন্ন। কিন্তু যখন রুষ্ট হ'তেন বুক উঠত কেঁপে—বাড়িশুদ্ধ লোক চোখে অন্ধকার দেখত—হালকা মেঘ যেন দমকা হাওয়ায় ঘন হ'যে উঠত—মুহূর্তে—বাজের ভয় নেই কার এ জগতে?

পরের জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের গোরার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন: তখন আমার বয়স পনের ষোলো। সে-উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের সায়ের অভাব ছিল না। সত্যিই গোরা প'ড়ে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কতবার আমাদের কাছে বলেছেন—অপূর্ব বই! কিন্তু এ উৎসাহের ছিটেফোঁটাও লাগে নি তাঁর কণ্ঠের মিড়ে যখন বলতেন "যেতে নাহি দিব কবিতাটি চমৎকার", বা "রবীন্দ্রনাথ বড কবি বৈকি।" তখন রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" প্রকাশিত হয নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বলাকা পড়লে কবি উচ্ছ্বসিত হ'তেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তখনকার কবিতার মধ্যে খুব বেশি কবিতা যে কবির চিত্তজয় করতে পারে নি একথা নিশ্চিত। আমার বেশ মনে আছে—রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্যগ্রন্থাবলী কবি খুব দাগ দিয়ে দাগ দিযে পড়েছিলেন—পাশে পাশে মন্তব্য লিখে। যতদূর মনে আছে এ দাগগুলি নিয়েই নানা সময়ে লোকেন কাকার সঙ্গে তর্ক হ'ত। তিনি বলতেন: "দ্বিজু, তুমি বুঝতে পারছ না।"

কিন্তু আর মনে পড়ছে না। তবে এটুকু বললে বোধহয় অসত্য বলা হবে না যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে তিনি স্বীকার করতেন - কিন্তু ইংলণ্ডের বড় কবিদের কারুরই সমকক্ষ মনে করতেন না।

রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে নিবেদন রইল তাঁরা যেন মনে রাখেন আমি এখন তাঁদেরই দলে। আমার 'পরে রাগ করেন করুন, কিন্তু আমাকে যেন ভুল না বোঝেন। আমি কবির চিত্র আঁকতেই কলম ধরেছি আমার স্মৃতি ও ধারণার উপর নির্ভর ক'রে। রবীন্দ্র কাব্যের সমালোচনা এ নয়—তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমার নিজের মতামতের কথাও উঠছে না। আমার বলবার কথা শুধু এই যে তিনি মতামতে বিপর্যয় জোরালো মানুষ ছিলেন - তাই বহুলোকে ভাঁলো বলছে ব'লেই কাউকে ভালো

ব'লে মানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের। রবীন্দ্রনাথের গানকে কোনোদিন এতটুকু ভালো বলেন নি বা তাঁর কণ্ঠস্বরকে। "পুরুষের গলা নয়—" বলতেন প্রায়ই। তবে তাঁর রূপের অজস্র সুখ্যাতি করতেন। বলতেন: "হ্যাঁ—একটা personality বটে।" যেখানে সাড়া দিতেন তিনি প্রবলভাবেই বলতেন "চমৎকার", কি "সাবাস"। কিন্তু যেখানে সাড়া দিতেন না—সেখানে কিছুতেই তাঁকে দিয়ে কিছু বলিয়ে নেওয়ার উপায় ছিল না। সত্যবাদী ছিলেন তিনি অস্থিমজ্জায়। ভুল করতেন না কখনো বলি না। ঠকতেনও প্রায়ই, কিন্তু ভুল বুঝলেই ক্ষমা চাইতেন—আর ঠকলেও ফের বিশ্বাস ক'রে ভুগতেন। কিন্তু ভুল না বুঝলে হাজার নিন্দা হোক না কেন গ্রাহ্যও করতেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" বইটিতে লিখেছেন মধুসূদন সম্পর্কে যে "গতানুগতিকের চিরপ্রাপ্ত বীথিকা তাঁহার কাছে অসহনীয়" ছিল। একথা দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বভাব সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

তাঁর চরিত্রের এই দার্ঢ্যের দিকটা তাঁর শত্রুমিত্র সবারই চোখে পড়ত—দার্ঢ্য আর স্বাধীন-চিন্তা। এ দুটি গুণই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর মনস্বী পিতৃ-দেবের কাছ থেকে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ঠাকুর্দা তাঁর আত্মজীবন চরিতে সেকাল ও একালের সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন, কিন্তু সর্বত্রই খোলা মনে বিচার করতে চেয়েছেন। কালিদাসের 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্' এও যেমন তিনি ভোলেন নি 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে' এ-প্রবচনের জ্ঞানগর্ভতাও তেমনি স্বীকার করতেন। কবি পিতার এই স্বাধীন চিন্তার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ব'লেই দেখাই কী ধরণের সত্যসন্ধানী দৃষ্টি তিনি ভালবাসতেন:

"আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সময়ে শিক্ষাপ্রণালী অতি জঘন্য ছিল", লিখছেন ঠাকুর্দা তাঁর আত্মজীবনীতে, "এবং জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কোনো শিক্ষাই হইত না তাহা পূর্বেই বলিযাছি। বিষয়কার্য পরিচালনের শিক্ষালাভ হইলেই তৎকালীন লোকেরা শিক্ষার ফল হইল মনে করিতেন। কিন্তু সে কারণে তাঁদের সুখের অভাব হইত না। একালে জ্ঞানলাভ করিয়া শিক্ষিত যুবকদের যেরূপ আচরণ হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা যে তাঁহাদের ব্যবহার বেশি দূষণীয় ছিল, এরূপ নহে। ইঁহারা যে সকল কর্মকে বিশেষ পাপজনক বলেন, তাঁহারা সে-সকল কর্মকে সেরূপ পাপজনক বলিতেন না। এ কারণ ইঁহাদের মধ্যে অনেকে লোকনিন্দা ভয়ে যে সকল কায অতি গোপনে করেন, তাঁহারা সে সকল কার্য প্রকাশ্যরূপে করিতেন। ইঁহাদের যেমন সত্যে অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়দোষে বিরাগ আছে, তাঁহাদেরও তেমনি মাতৃপিতৃভক্তিতে অনুরাগ ও সুরাপানে বিরাগ ছিল।

ইহাদের কতকগুলি মহৎ গুণ তাঁহাদের ছিল না, আবার তাঁহাদের কতকগুলি মহৎ গুণ ইহাদের নাই।"

একথা এত ক'রে বলছি তার আরো একটা কারণ আছে। আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে দুটো দল দেখা যায় অতি প্রবল। একদল বলেন সেকালের মানুষ, প্রতিভা, গদ্যভঙ্গি (যথা হইতেছি করিতেছি রূপ গালভরা ক্রিয়াপদ)—এই-ই তো ছিল আদর্শ। আর একদল বলেন ছন্দ তো গদ্য ছন্দ, প্রেম তো নির্লজ্জতা, কবি তো ইলিয়ট ইত্যাদি। কবি এ দুই মনোভাবকেই সমানে ব্যঙ্গ করেছেন। পুরাতন স্তাবকদের যখন ব্যঙ্গ ক'রে গাইতেন—কী মজা যে লাগত :

ঐ যায় যায় যায়
প'ড়ে এ-কলির ফেরে সবই যে রে ভেঙে চুরে ভেসে যায়
ঐ যায়—ব্রহ্মা যায় বিষ্ণু যায় ভোলানাথও চিৎ
ঐ যায়—দৈত্যরক্ষ দেব যক্ষ হ'য়ে যায় রে মিথ
ঐ যায়—রাম রাবণ পতিতপাবন কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে
আছেন এক—ঈশ্বর মাত্র, দিবারাত্র টানাটানি তাঁরেও শেষে। ইত্যাদি।

ঠিক তেম্‌নিই হেসে গড়িয়ে পড়ত সবাই যখন আমি ও মায়া তাঁর সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে অকুতোভয়ে গাইতাম (যাকে অলডাস ব'লেছেন অত্যাধুনিকতার ফ্যাশন ("To travel by the last bus") :

নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
ডাল ভাতের দফা করো সবাই রফা,
করো শীগ্‌গির ধুতিচাদর-নিবারিণী সভা।
প্যাণ্ট পরো কোট পরো নৈলে নিভে গেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে।
কাঁচকলা ছাড়ো এবং রোস্ট চপ ধরো,
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো। ইত্যাদি।

এই স্বাধীন চিন্তা—তাঁর সব কাজকেই নিয়ন্ত্রিত করত। কোনো মানুষ বা দল হাজার প্রতিষ্ঠা পেলেও তিনি তাঁর স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ছাড়তেন না। এ তো তবু সহজ ছিল—কারণ চিন্তায় খানিকটা মুক্ত হওয়া কঠিন হ'লেও এতে মনপ্রাণ বিদ্রোহ করে না যতদিন না কার্যক্ষেত্রে তার তর্জমা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর চিন্তা—নিরূপিত নীতিপথে চালাতেন তবু নিজেকে নয়—তাঁর প্রিয়তম সন্তানদুটিকেও। যা ঠিক ব'লে মনে করতেন সে পথে চলতেই হবে—এই ছিল তাঁর কাছে সত্যাচারের মূল মন্ত্র। এ মন্ত্র

তাঁর আশেপাশের বন্ধুবান্ধবকে "শক্" করলেও তিনি লক্ষ্যপথে চলতেন সমানই অবিচল ভাবে বলতেন হেসে প্রায়ই :

"Do well and right and let the world sink".

কখনো কখনো যদি কোনো শুভার্থী বন্ধু বা আত্মীয় বেশি আপত্তি ক'রে বলতেন যে এ চড়েই ছেলেকে পাকিয়ে তুললে সে সত্যি পাকতে পারবে না আর কোনদিনই, তাহ'লে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ভ্রূভঙ্গ ক'রে বলতেন : "কিন্তু তাহ লে তোমাদের চেয়ে আমারই শাস্তি বেশি হবে না কি ?"

এক জায়গায় তিনি খুব জোর পেয়েছিলেন ব'লেই এ ধরণের বেপরোয়া ভাব এসেছিল আমার শিক্ষার সম্বন্ধে। তিনি জানতেন আমি ইংরাজি পড়ায় ফাঁকি দিই—অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোলও পড়ি দায়-সারা ক'রে—কিন্তু আমি জানতে চাই, মিথ্যা বলি না, না পড়লে বলি না পড়ছি, লুকোই না, ঔদ্ধত্য করি প্রকাশ্যেই। এর কাছে এক কথা ওর কাছে আর এ-প্রবৃত্তির লেশও আমার ছিল না। এতেই তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। একদিন আমার রাঙা জ্যেঠামহাশয় এক বয়স্ক আত্মীয়ের কথা শুনে আমার নামে কবির কাছে অভিযোগ আনেন। তখন আমার বয়স বছর পনের। আমাকে কবি ডাকালেন। বললেন "অমুক যা যা বলেছে সেটা কি সত্যি ?"—"না"—বললাম আমি। ব্যস্—মুক্ত। রাঙা জ্যেঠামহাশয় বললেন : "কিন্তু অমুক বলল যে "

কবি বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইংরাজিতে বললেন (কথাগুলো আজও আমার কানে বাজে) : "I believe my son against the whole world".

এ-কথাগুলি উদ্ধৃত করলাম শুধু তাঁর পিতৃগর্বের ছবি ফোটাতে নয়, দেখাতে—তিনি কি রকম একরোখা মানুষ ছিলেন। আর একটা উদাহরণ দিলে হয়ত আমার বক্তব্যটা আরও ফুটবে। আমি বলতে চাইছি ইংরাজিতে যাকে বলে conventional সে-জাতের মানুষ তিনি ছিলেন না—obstinate ব'লে যাদের অপযশ তাদেরই দলে তাঁর স্বভাব তাঁকে ভরতি ক'রে দিয়েছিল। সব বিষয়েই তাঁর ছিল একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি চলনভঙ্গি। "মেজরিটিই অথরিটি"—ডিমক্রাসির এই বুলি তাঁর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য ছিল। তাই সে সময়ে তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনেরা তাঁর আমাকে বাড়িতে রেখে খালি বাংলা পড়ানো দেখে হাজার শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেও তিনি পরোয়া করতেন না। বলতেন : "মাতৃভাষাটা শিখছে এ কি কম কথা ? ইংরাজি পরে শিখবে 'খনি।" সত্যিই যে আমি ইংরাজিতে অত্যন্ত কাঁচা থেকে গিয়েছিলাম (যার জন্য স্কুলে আমাকে প্রথম দিকে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল) সে শুধু তাঁর প্রশ্রয়ে। আমি নিজের ইচ্ছামত পড়তাম, বই কিনতাম ও কুলপি খেতাম। অজস্র কুলপি। খুব বেশি

পুরাণ পড়েছি—কুল্‌পি বখ্‌শিশ। নতুন শক্ত গান শিখেছি—কুলপি। তর্কে কোনো দিন খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছি—কুলপি। এ কী রকম শিক্ষা রে বাবা!—ভাবতেন অনেক প্রবীণ গালে হাত দিয়ে। মনে আছে রজনী বলে এক কুলপিওয়ালা আসত। আমি ছিলাম দলপতি। ফুটবল ক্লাব হ'ল। খেলা হ'ত আমাদের সুরধামের সামনের ছোট মাঠে। সাঙ্গোপাঙ্গ সবাইকেই কুলপি খাওয়াব। মাসান্তে কবি অম্লান বদনে ত্রিশ চল্লিশ কখনো পঞ্চাশ টাকা কুলপির খরচ দিতেন। ভাবতে পারেন? তবে অর্থ সম্বন্ধে দিলদরিয়া ছিলেন তিনি বরাবর—আর সব বিষয়েই।

আরো শুনবেন? শুনুনই না। তাঁদের আসরে আমি ছিলাম প্রায় ছোটখাট সেক্রেটারি। কে কবে কী বলল তাঁকে মনে করিয়ে দিতাম। মনে রাখতামও এর ওর তার কথা। এতে বাহাদুরি ছিল--বাহবার নগদ বিদায়ও জুটত প্রচুর। কাজেই উৎসাহে আমার ভাঁটা পড়ে নি কক্ষনো। সধবাদের মজলিশে চুড়ির ঠুনঠুনির মতন প্রবীণদের তর্কসভায় আমার কলকণ্ঠ শোনা যেত যখন-তখন - আচম্‌কা: হাসিতে, গানে টিপ্পনিতে আর কবিকে এই·মনে-করিয়ে-দেওয়ায়।

সময়ে সময়ে এমন হ'ত যে রংদারি কথা উঠত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে। আমি প্রতি রোমকূপে দিয়ে গিলতাম সে-সব রোমহর্ষক কথা। কোনো প্রবীণ কথক আমাকে "একবার ওঘরে যাও তো বাবা"—বললেই কবি আমাকে পাশে টেনে আমার কটিবেষ্টন ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখতেন—আমিও পরমানন্দে শুনতাম নানা অভাব্য অধঃপতনের অশ্রাব্য কাহিনী।

এই সূত্রে আমার চোখে পড়ত তাঁর সঙ্গে শুচিব্রতীদের—কি না puritanদের—মিল ছিল না এতটুকু। যেমন কবিতার সব চেয়ে বড় কথা তার কবিত্ব, বলতেন তিনি, তেমনি রসিকতার সব চেয়ে বড় কথা তার রসালতা। এখানে শ্লীল অশ্লীল অবান্তর। এতেও শুচিব্রতীরা, অনেকে ঘা খেতেন। তাই তাঁর খুব নিন্দাও ছিল। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। অনেকদিন বাদে বিলেত থেকে ফিরে একদিন হঠাৎ অলডাস হাক্সলির "Vulgority in Literature" বইটি পড়তে পড়তে চম্‌কে উঠি অলডাসের স্বভাবতীক্ষ্ণ অনুপম ভাবাচিত্রে কবির মনের কথার ছবিটি আঁকা দেখে:

"The fact that many people should be shocked by what he writes practically imposes it as a duty upon the writer to go on shocking them. For those who are shocked by truth are not only stupid, but morally reprehensible as well: the stupid should

be educated, the wicked punished and reformed. All these praise worthy ends can be attained by a course of shocking."

আমি জানি সে সময়ে অনেক শুচিব্রতী দারুণ "শক্" পেতেন তাঁর "ভাঙ খেয়ে হ'য়ে আছি চুর"—শ্রেণীর গান তাঁকে গাইতে শুনে :

লিখে গেছেন পুরাণকর্তা স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাং
খেতেন তা হয় ভোলা কিম্বা পুরাণকর্তাই সুতরাং।
জানে শুধু সিদ্ধিখোর জেগে জেগে ঘুমের ঘোর
হোক না কেন ফকির—ভাবে আমি রাজা বাহাদুর।
ভাং খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।

কিম্বা আরো এক ডোজ 'শক্' - শুনে :

এ জীবনে ভাই এতটুকু যদি বিমল আমোদ চাও রে,
(তবে) মাঝে মাঝে মাঝে মনরে আমার ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে ॥
(এই) ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ি
(আর) "মজা"-রূপ বারাণসীতে যাইতে সুরাই রেলের গাড়ি রে ॥
(এই) শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
(তবে) মাঝে মাঝে মন কোরো রসনারে সুরা সুধারসে সিঞ্চিত—বাবা !

"বাবা" ব'লেই তাঁর সেই অট্টহাস্য আজো কানে বাজে।

এমন কি চুলোয় যাওয়া নিয়েও খোলা হাসি : মানে নেশা হ'লে

(তখন) থাকিবে না কোনো চক্ষুলজ্জা রবে না কারো ওয়াস্তা
(আর) হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত চুলোয় যাবার রাস্তা রে ॥

কোনো কোনো শুচিব্রতী তর্ক করতেন: "এসব গান গাওয়া কেন দ্বিজুবাবু—নন্দলাল, বিক্রমাদিত্য, চণ্ডীচরণ এসব থাকতে। ভালো example set করতে তো হবে ?

একথারও উত্তর দিতেন তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে :

যখন আমার দেখাদেখি দশজন ব্র্যাণ্ডি ধরতে পারে
তখন পরের জন্য আমায় বর্জন করতে হবে তারে ?
আমি বলি—আছে বিশ্বে সুদৃষ্টান্ত এত ভাবে
আমারি এ-কুদৃষ্টান্ত কেন বেছে নিতে যাবে ?

শুচিব্রতীদের অনেকে তাঁর বন্ধু ছিলেন একথা সত্য হ'লেও বলা যায় শুচিবাইয়ের ছায়াও তিনি মাড়াতে চাইতেন না। চলতেন যেন মহাভারতের এই শ্লোক মেনে :

"সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ।"

চতুর্থ উল্লাস

সে-সময়কার কথা আপনাদের মনে থাকবার কথা নয়– কারণ আপনারা তখন বড় জোর সবে জন্মেছেন। কিন্তু আমার তখন যত বয়স তার ডবল বুদ্ধি। তাই আশে-পাশে কি ব্যাপারটা ঘটছে বেশ বুঝতে পারতাম। আমার সহানুভূতি ছিল অবশ্যই কবির দিকে কিন্তু তবু কেমন যেন একদল লোককে মনে হ'ত মৎলবী। তাঁদের নাম নাই করলাম। আমার উদ্দেশ্য স্মৃতিকথা লেখা, কাউকে নিন্দা করা তো নয়।

তাঁর সে সময়ে খুব নামডাক। গ্রামে গ্রামে তাঁর গান গাইছে লোকে। সভায় সমিতিতে তাঁর কোরাস স্বদেশী সঙ্গীতে লোকের সে কী উদ্দীপনা! মহিলারা তখনও আধা-পর্দানসীন, তবু অনেক মহিলার প্রশংসমান কটাক্ষের খবর আমি রাখতাম, কারণ কটাক্ষ জিনিষটা কী সে বিষয়ে খানিকটা ভুক্তভোগী হ'য়ে উঠেছিলাম ঐ বয়সেই। আমি জানি এ-খবরেও আপনাদের মতন অনেক দরদী বন্ধুর ঔৎসুক্যের অভাব নেই, কিন্তু সে আমি বলব না। যেখানে সব বলতে বাধে সেখানে অর্ধেক বলা উচিত নয়। তাছাড়া, বলেছি তো গোড়াতেই, যে এর উদ্দেশ্য আত্মকথন নয় - আমার চোখের দৃষ্টি ও মনপ্রাণের অনুভবের আলোয় উদাসী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মহাপ্রাণতা যে-ভাবে ফুটে উঠেছিল তারই একটা যতদূর সম্ভব জীবন্ত ছবি আঁকা। তবু একথা উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে আমি খানিকটা অকালপক্ক হওয়ার দরুণ কাঁচা বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রবলের সত্যিই একজন সমজদার হ'যে উঠেছিলাম। কারণ নানাসূত্রে এ-ও আমি টের পেয়েছিলাম যে কয়েকটি পরমাসুন্দরী মেয়ের পিতারা তাঁকে চাইছেন জামাতা করতে। কিন্তু কবি নারীসমাজের দিকে ঘেঁষতেন না। দুই একজন তাঁকে আক্রমণ করেন গায়ে প'ড়ে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে পরে আমার আরো কিছু লেখার ইচ্ছা রইল। এখন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের কথা বলি।

আমার তখন বয়স হবে নয় কি দশ যখন রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" নামে বিখ্যাত কবিতাটিকে কবি আক্রমণ করেন। তখন থেকেই আমি বুঝতে পারার কিনারায় এসেছিলাম দলাদলি কাকে বলে। কয়েক বৎসর বাদে পিছনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই—কেন তাঁর মন রবীন্দ্রনাথের পরে একটু একটু ক'রে বিমুখ হয়ে উঠল। লোকেন কাকা কাছে থাকলে হয়ত এ-বিমুখতার কিছু প্রতিষেধক থাকত কারণ প্রতিভায় না হোক বুদ্ধি ও মননশীলতায় তিনি কবির সমকক্ষ ছিলেন। এটা আরো বুঝতে পারতাম তাঁদের দ্বৈরথ-সংগ্রামে অনেক সময়েই কবিকে হার স্বীকার

করতে দেখে। এ-হার স্বীকার বড় সুন্দর ছিল। তার্কিক আমরা দেখেছি, কিন্তু এত সরলভাবে যে মানুষ বলতে পারে "হেরে গেলাম" এ খুব কমই চোখে পড়েছে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আশে পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে কী যে খুসি হ'য়ে উঠলেন যেই কবি সোনার তরী-কে আক্রমণ করলেন! তাবপরে ধীরে ধীরে নানারকম আলোচনা হ'ত। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ভাবভঙ্গিব ক্যারিকেচার ক'রে খুব হাসাতেন। অনেকে এসে বলতেন ভুরু টেনে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে এ ও তা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই তাঁরা বলতেন—কিন্তু সেসবের পুনরুক্তি করাও অনুচিত মনে করি। কিন্তু শেষটায হঠাৎ যখন কবি "কাব্যে নীতি" নাম দিযে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে আক্রমণ করলেন তখন আমার ভালো লাগে নি। কারণ মনে রাখবেম তাঁর কাছে বরাবর যে-শিক্ষা পেযে এসেছি তার মধ্যে আর যা-ই থাকুক না কেন, নীতিপাঠেব হুহুঙ্কার ছিল না। সোনার তরী-কে কবি সুকাব্য বলেন নি এজন্যে আশ্চর্য হই নি, আজও জোব ক বেই বলব: প্রত্যেকেব অধিকার আছেই নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার। কবি স্বভাবে চিরদিনই ছিলেন স্পষ্টবাদী, একরোখা, কাব্যে স্বচ্ছতার পক্ষপাতী। ধোঁযাটে কিছুই পছন্দ করতেন না। এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে ফরাসীদের মিল বেশি—তারাও কাব্যে প্রাঞ্জলতার মূল্য দেয় অত্যধিক। কিন্তু তাব লে বেচারি চিত্রাঙ্গদা কী দোষ করল? কবির আপত্তি—চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের প্রথম দিকে বিয়ে হয় নি! এ কী কাণ্ড!! যে-বীজ তিনিই সযত্নে বুনেছিলেন সে বীজের ফল স্বাধীন চিন্তা। আমি বলতাম কবিকে চিত্রাঙ্গদা আমার ভালো লাগে। অবশ্য তখন—তের বৎসর বযসে—চিত্রাঙ্গদাব কাব্যসৌন্দর্য আমি ভালো বুঝতাম না, কিন্তু ধ্বনিলালিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি ছিল ওর সাহিত্য-মূল্য নিয়ে নয়—আমার বালকমনেও বিদ্রোহ জাগত, এই ভেবে যে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করুন বা না করুন চিত্রাঙ্গদার রসগ্রহণের সময়ে তো কই কারুর মনে ও-চিন্তার উদয়ই হয় না। তবে?

দুর্নীতি? এইতেই সবচেয়ে অবাক লাগল। কৃষ্ণচরিত্র তখন ক'বে পড়ছি। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি মনে লেগেছে: যে যদি ভীমকে কোথাও দেখি কাপুরুষ, ভীষ্মকে নীচ ইত্যাদি তাহ'লে বুঝতে হবে সে-অংশ "প্রক্ষিপ্ত"। কিন্তু চক্ষের সামনে কবিকে দেখলাম দুর্নীতিকে আক্রমণ করতে। পরে ইতিহাসে তাঁর এ-আন্দোলনের গুজব পড়লে হযত বলতাম এ প্রক্ষিপ্ত কিন্তু চাক্ষুষ ক'রেই নাজেহাল হ'য়ে পড়লাম। এ কি ভাবা যায়! কল্কি অবতার, ত্র্যহস্পর্শ, পাষাণী প্রভৃতির নানা ছবি যিনি অকুতোভয়েই

লিখে গেছেন, দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকের যিনি অকুতোভয়েই সুখ্যাতি করতেন (যার নায়ক মাতাল ও নায়িকা গণিকা) আলেখ্যে মদ্যপ কবিতার রসাল যুক্তি যিনি সাজিয়েছেন বেপরোয়া ভঙ্গিতেই—তিনি হঠাৎ কাব্যে সুনীতি দুর্নীতি জাতীয় ব্রাহ্ম তর্ক তুলতে পারলেন কেমন ক'রে ?

আপনারা হয়ত ভাবছেন আমি পরের জীবনের চিন্তা সেই সময়ের স্কন্ধে চাপাচ্ছি কারণ "কাব্যে নীতি" প্রবন্ধ যখন বেরোয় তখন আমি নিতান্ত বালক। কিন্তু এ-ভাবে যদি আমার সে-সময়কার মনকে বিচার করেন তাহ'লে ভুল হবে আপনাদেরই। কারণ নানা দৃষ্টান্ত দিয়েই দেখিয়েছি যে আমার মাতৃহারা শৈশব কেটেছে—পড়াশুনো তর্কাতর্কি ও স্বাধীন চিন্তার হাওয়ায়। শুচিব্রতীদের নিয়ে আমরা কী হাসাহাসিই যে করতাম জানেন না। পরীক্ষার আগে জানকী বাইয়ের গান শুনতে গিয়েছি কবির বহু প্রবীণ বন্ধুর ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য ক'রে। (পরীক্ষার সময়ে মনে আছে প্রশ্নপত্রে লিখতে লিখতে কেবলই কানে গুনগুনিয়ে উঠেছে তার অবিস্মরণীয় "পানি ভরে রি কৌন আলবেলি কি নার—ঝমাঝম"!) লোকমত সম্বন্ধে কবির গভীর উপেক্ষা আমাকে এমন পেয়ে ব'সেছিল যে বিলেত থেকে ফিরে এসে শুধু যে নানা প্রদেশের বাইয়ের বাড়ি গিয়ে গান শিখতাম তাই নয় একাধিক বাইকে গান শিখিয়েছি যে-মহাকীর্তি আজ পর্যন্ত কোনো ভদ্র বঙ্গকুলতিলক করেছেন ব'লে আমার জানা নেই। মনে আছে জয়পুরে যখন এক ধনী বাঙালির অতিথি হয়েছিলাম তখন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন সেখানকার এক বিখ্যাত সুন্দরী বাইয়ের বাড়িতে। পরদিন গৃহকর্তা আমাকে হেসে বললেন: "দিলীপবাবু, আপনার জন্যে শেষটায় কিনা ধনেপ্রাণে মারা গেলাম !"

"কী ব্যাপার ?"

"আর কী ব্যাপার ? স্ত্রী মশাই, স্ত্রী। কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র। দিলীপবাবুর তিন কুলে কেউ নেই, তিনি গানের নাম ক'রে ব'য়ে গেলেন ব'লে তুমিও যাবে ?"

আর একবার সে আরো মজার কাণ্ড। শুনুনই না। লক্ষ্ণৌয়ে তখন আমি দিনের পর দিন গান শিখছি বিখ্যাত আচ্ছন বাইয়ের কাছে—তা আবার ঠুংরি। সারা লক্ষ্ণৌ সহরের চক্ষু স্থির। দিনে দুপুরে !—আবার সবার সামনে দিয়ে অতুলদার মোটরে চেপে ! আমি হাসতাম। একটা গান মনে পড়ত—"কলঙ্কিনী নাম রটালো।" শরৎচন্দ্র লিখলেন: "তা মন্টু কলঙ্কে তুমি যেন thrive করো।" আমি মনে মনে বেশ পেখম মেলে গুনগুন করতাম ঠুংরি-কেই কেষ্টঠাকুরের পদবী দিয়ে: "তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।" মার্টার হ'তে কার না সাধ যায় বলুন ? যাক, যা বলছিলাম।

একদিন হঠাৎ এক প্রবীণ অধ্যাপক এসে হাজির বালাপোষ মুড়ি দিয়ে: "দিলীপ, আমাকে একটু চুপি চুপি অচ্ছন বাইয়ের গান শুনিয়ে আনতে পারো?—আহা কী গলা রে!"

তাঁকে এবং আরো কয়েক সমাজের-স্তম্ভকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম "চুপি চুপি" অবশ্য। এ যুগে হয়ত আপনারা এ-কাহিনীকে "রোমহর্ষক" নাম দিতে রাজি হবেন না—কিন্তু সে-যুগের কথাটা ভেবে দেখলে হয়ত বুঝবেন যে এর মধ্যে কী প্রকাণ্ড "দুর্নীতি" লুকিয়েছিল। নৈলে কি আর প্রবীণ বন্ধুকে নাক পর্যন্ত বালাপোষ মুড়ি দিতে হয়? অতুলদা কী যে হাসতেন যখন এই বালাপোষ-কাহিনী তাঁকে আমি বলতাম!—যদিও বোরখা পরলেই ছিল ভালো, যেহেতু "সাবধানের মার নেই।"

এই ঠাট বজায় রাখার ভাব কবির মধ্যে কখনো দেখি নি। তবে "কলঙ্কে thrive করার ক্ষমতা" বোধ হয় আমাদের বংশগত সম্পত্তি—যাকে ইংরাজিতে বলে heirloom কারণ কলঙ্ক রটনার ভয়ে রসাল জিনিসে সাড়া না-দেওয়ার পাত্র ছিলেন না ঠাকুর্দাও। রসবোধ তাঁর কী রকম সজাগ ছিল তার একটা উদাহরণ দেই। ঠাকুর্দাও তাঁর আত্মজীবন চরিতে লিখছেন (৭০।৮০ বৎসর আগে):

"এত রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠী তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই রমণী সুন্দর খেমটা নাচিতে পারে। তখন সুধাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্লিত ছিল, সুতরাং এ-প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এই সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন, এইরূপ দর্শকবৃন্দের ঢুলু-ঢুলু নয়নে দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দের মধ্যে কি প্রধান, বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা এই সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদও শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন। আমি নৃত্য করি নাই বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া সকলের আমোদ দেখিতেছিলাম ও উৎসাহ দিতেছিলাম।" (১১০—১১ পৃষ্ঠা)।

এই বর্ণনাটি শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী উদ্ধৃত করেছেন তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" পুস্তকে (৩৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু শেষ কথাগুলি ("আমি নৃত্য…দিতেছিলাম") বাদ দিয়ে। শাস্ত্রী মহাশয় বাকিটুকু উদ্ধৃত করেছেন: "রাজবাটীতে কিরূপ পাপ

প্রশ্রয় পাইত" দেখ্যাতে (, ৩৮ পৃষ্ঠা)। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়—দেওয়ান কার্তিকেয়-চন্দ্র রায় (যাঁর চরিত্রের প্রচুর সুখ্যাতি শাস্ত্রী মহাশয় প্রায়ই করতেন) নিজে উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটি দিয়েছেন এই ভূমিকা ক'রে : "একে যুবতীর মধুর স্বরেই মন মোহিত হয় ; আবার সুরা সহচরী হইলে কি না অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে পারে ? ইহার একটি চমৎকার ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।" (১১০ পৃষ্ঠা) যাকে শাস্ত্রী বলেছেন "কিরূপ পাপ" তাকেই দেওয়ানজি নাম দিলেন "চমৎকার ঘটনা !"

আমি বলতে চাইছি, একই ঘটনাকে রসবোধের ভঙ্গি ভেদে একেবারে উল্টো মনে হ'তে পারে। চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ না ক'রে তার সঙ্গে প্রেম করলেন এ কাব্যচিত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের মন নিশ্চয়ই আপত্তি করত—কিন্তু কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কখনই এতে দোষ দেখতেন না। তাঁর পুত্র এবিষয়ে যে আরো উদার ছিলেন তারও প্রমাণ দিচ্ছি। ইতিপূর্বে বলেছি কবির ডাক্তার বন্ধুর প্রণয়িনীর কথা—যাঁর কাছে মত্ত অবস্থায় তাঁর ব্রাহ্ম বন্ধু প্রণয় জ্ঞাপন করেছিলেন, মনে আছে ? তাঁর ওখানে কবির বন্ধুরা অনেকেই যেতেন না কারণ এ-দম্পতির বিবাহে কেউ সাক্ষী ছিল না—না পুরুত, না রেজিস্টার। কিন্তু তবু তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ হ'লে কবি তেম্‌নি সহজেই যেতেন যেমন সহজে যেতেন তিনি শ্রীহেরম্ব মৈত্রের বাড়ি। এই মানুষ কি না চিত্রাঙ্গদাকে আক্রমণ করলেন দুর্নীতির অবান্তর যুক্তি দিয়ে ? এত বড় অসম্ভব কী ক'রে সম্ভব হ'ল !

বলতে পারেন যে জীবন ও সাহিত্য এক নয়—কাজেই জীবনে যে-সব ঢিলেমি চলে সাহিত্যে তাদের প্রশ্রয় অবাঞ্ছনীয় এও তো তিনি মনে ক'রে থাকতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও দাঁড়ায় না। কেন না বলেছি তাঁর রক্তে ছিল শ্রেষ্ঠ হিন্দুমনের উদারতা—শুচিবাইয়ের অভাব। তাই শ্রীকৃষ্ণের ছিলেন তিনি গভীর ভক্ত--আরো বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প'ড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন একজন যুগপ্রবর্তক, ঋষি, কত কি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করতেন শুচিব্রতীদের এই ব'লে যে কৃষ্ণকে যারা বুঝল না তারা হিন্দুধর্মের বুঝল কী ? ব্রাহ্ম বন্ধু তাঁর বিস্তর ছিল। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের যে-ধরণের প্রেজুডিস ছিল সে-ধরণের প্রেজুডিস তাঁর ছিল না। তবু য়ুরোপে খুব উদার খৃষ্টানদের মধ্যেও ইহুদি বলতেই যে-ধরণের একটা সঙ্কোচন আসে সেই ধরণের একটা অনামা সঙ্কোচ তাঁর আসত ব্রাহ্মদের নামে। রাজা রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, রামধনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অনেক লোকোত্তর ব্রাহ্ম প্রচারককে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন, তবু আমাকে বারবারই বলতেন : "একা বঙ্কিম এঁদের দশটা বুঝলি ? ঐ একটা লোকই বুঝেছিল সত্যি

হিন্দুধর্ম কী বস্তু।" কৃষ্ণকে যে ব্রাহ্মরা অশ্লীল বলত এতে তাঁর অবজ্ঞার সীমা ছিল না। "কৃষ্ণের মহিমা কি ব্রাহ্ম মন দিয়ে বোঝা যায় রে—যত সব শুচিবেয়ের দল!"—এই ধরণের বক্রোক্তি প্রায়ই করতেন। বিশেষ ক'রেই গম্ভীরানন ব্রাহ্মদের অশ্লীল অশ্লীল বাতিক দেখে। মাঝে মাঝে গাইতেন একটি গান যেটির একটি কপি (তাঁহার স্বহস্তলিখিত খাতায়) আজো আমার কাছে আছে। সে গানটি হচ্ছে:

প্রাণ ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে ভেবে ভেবে 'অহো ধিক্!'
যে এই কুরুচিতে অশ্লীলেতে ভ'রে গেছে চারিদিক।
সব পিতামাতা পুত্রকন্যা—ভেবে দেখাল কী অশ্লীল!
তাই আমরা কেবল ভগ্নী ভ্রাতা, ভগ্নী ভায়ে ভারি মিল।
হ'লে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ করি ভগ্নী ল'য়ে অনুতাপ।
কারণ ক্রন্দনেতে মহাপুণ্য, হাস্য করা মহাপাপ।
দেখ দিয়েছেন এই দন্তকটা মনুষ্যের যে দযাময়
তাহা চর্বণ করবার জন্যেই শুধু, বাহির করবার জন্যে নয়।
হায় কী-ই বা জানত কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাভ্রান্ত চারি বেদ?
আমরা কেবল জানি, কেবল মানি অর্থভেদে জাতিভেদ।
এই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখে সবার লাগে তাক্
এই ভ্রাতাভগ্নী সম্প্রদায় সব বেঁচে থাক রে বেঁচে থাক।

কিন্তু হ'লে হবে কি, মানুষকে নানা অলক্ষ্য শক্তি করে তাদের হাতের খেলার পুতুল। তাই যতদিন না সে কামনা বাসনাকে জয় করে অচলপ্রতিষ্ঠ হয় তার স্বরূপে, ততদিন মানবিক স্বভাবের রকমারি প্রত্যাশা, প্রবৃত্তি, সূক্ষ্ম অভিমান, নিহিত ক্ষোভ, সংস্কারের প্রবর্তনা তাকে নানা স্বভাববিরুদ্ধ কর্মের পাকে ফেলবেই—বিশেষ ক'রে রুচি ও মেজাজের সংঘর্ষে। রুচি ও মেজাজ বলতে আমি বুঝছি temperament: যেখানে class of temperaments ঘটে সেখানে নির্বিরোধী থাকা বোধ হয় শক্তিমন্তদেরো একটি দুরূহতম কীর্তি। কেন যে যাকে সবাই ধন্য ধন্য করছে তাকেও অনেক সময়ে কিছুতে বরদাস্ত করতে পারি না—আবার যাকে সবাই বলছে অতি নগণ্য তাকেও বর্জন করতে দুঃখ পাই আমরা কেউ কি জানি পূরোপুরি? জানলে আশ্চর্য লাগত না দেখে, যে বড় কবি বড় মানুষ বড় ব্যক্তিরূপের চারদিকে অনেক অভব্য, অসভ্য লোক এমন কায়েম হ'য়ে যায় যাদের স্থানচ্যুত করতে কেউ পারে না। তাই না সুঘটন থেকেও অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। একটা দৃষ্টান্ত দেই। রবীন্দ্রনাথ কবির "মন্দ্র"-র খুবই সুখ্যাতি করেছিলেন। তবু কবি তাঁর "সোণার তরী"-র কেন নিন্দা

করলেন—রবীন্দ্রনাথের এই অনুযোগ তাঁর কাছে এক রবীন্দ্রভক্ত বহন ক'রে এনে দিলেন। কবি দারুণ ক্রুদ্ধ হ'লেন। বললেন: "সাহিত্যিক কি এই সব ভেবে প্রশংসা করবে? Quid pro quo? তাহ'লে কি দাঁড়াবে এই যুক্তি যে, যে আমার সাহিত্যের নিন্দা করবে তার আমি নিন্দা করব, আর যে স্তবগান করবে তার স্তবগান করব? ধিক্!" রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন কি না জানি না কিন্তু কবি নিজে অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন ব'লে সহজে ভাবতে পারতেন না কেউ ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা বলছে। তাই একথাও তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন যে, যে কয়েকটি রবীন্দ্রভক্ত তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে তাঁকে অভব্য আক্রমণ করতেন তাদের রবীন্দ্রনাথই উস্কে দিয়েছেন নিজে আড়াল থেকে। কবি বলতেন প্রায়ই: "কেন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য আখড়ায় নামছেন না—এই সব অশক্ত শিখণ্ডীদের বাণ মেরে কী হবে?"

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা রটনা তিনি কেন বিশ্বাস করতেন এ-প্রশ্ন মনে স্বতই উদয় হয়। কিন্তু কবিরা এমন জনরব যে বিশ্বাস করেন অন্য লোকের চেয়ে বেশি সহজে একথার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। এর কারণ অবশ্য খানিকটা বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে যে কবিদের বেদনাবোধ করবার শক্তিও সাধারণের চেয়ে বেশি। তাই যেখানে তাঁরা কোনো কারণে ক্ষুব্ধ সেখানে নিজেকে অতি সহজ মনে করেন আক্রান্ত বা মার্টার যেহেতু সবাই তাঁকে ভুল বুঝছে। স্পর্শকাতর ও কাণপাতলা তাঁরা স্বভাবে -একথা কবিদের সঙ্গে যাঁরাই মিশেছেন তাঁরাই জানেন। সমতা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ, অল্পতেই তাঁরা দুলে ওঠেন – আর দুলে ওঠেন ব'লেই তাঁরা কবি। এ শুধু আমার কথা নয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক পত্রেই একথা স্বীকার করেছেন। কাজেই এ নিয়ে দুঃখ করা নিষ্ফল: জ্ঞানীরা যেমন জ্ঞানীর মতন আচরণ করেন স্বভাবের প্রবর্তনায়, অভিমানীরাও ঠিক তেম্নি সহজে দুলে ওঠেন স্পর্শকাতরতা তাঁদের মজ্জাগত ব'লে। একজন চিন্তাশীল ঐতিহাসিক বলেছেন—সংসারে দুটি গুণ সব চেয়ে বড়: charity ও understanding: বিচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বুঝতে পারা আরো বড় কথা শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি মনে পড়ে যখন আমি আমার এক কবিবন্ধুর নানা কুকীর্তিতে রুষ্ট হ'য়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম: Human beings are much less deliberate and responsible for their acts than the moralists, novelists and dramatists make them and I look rather to see what forces drove them than what the man himself may hour seemed by inference to hour intended or purposed."

এবার ফিরে আসি কবির শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে। কবি চাইতেন পুত্র পড়াশুনোয় সর্বভুক না হোক বহুভুক যেন হ'তে শেখে। অথচ জীবনের এ একটি অতি শোকাবহ সত্য যে যত বই কিনতে ইচ্ছা করে তত টাকা কারুরই নেই। অগত্যা ছুটলাম চৈতন্য লাইব্রেরি। উঃ সে কী আনন্দ! আমি চেঞ্জে যেতে চাইতাম না বই পড়ার লোভে। ছেলেবেলায় আমি খুব রোগা ছিলাম, তাই আমার দাদামহাশয় আমাকে নিয়ে যেতে চাইতেন চেঞ্জে। কিন্তু আমি এক আধবারের বেশি যাই নি। কবিকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না এ-ও ছিল আমার অন্যত্র না যাওয়ার আর একটা কারণ। তার উপরে হঠাৎ চাপল বইয়ের নেশা। চৈতন্য লাইব্রেরিতে যখন ঢুকতাম মনে হ'ত সে বইয়ের গন্ধ পেয়েই বুঝি ঋষিরা পদ্মগন্ধের স্তব করেছিলেন: "যস্তে গন্ধঃ পুষ্করম্ আবিবেশ।" পড়তে পড়তে খুব দ্রুত পড়া অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। বেশ মনে আছে তিন-চারশো পাতার সব মোটা মোটা বই দু-একদিনে শেষ ক'রে যখন ফের চৈতন্য লাইব্রেরি ছুটতাম তখন পা দুটোকে মনে হ'ত যেন পাখার সগোত্র।

* * * *

কিন্তু হাজার হোক বার তের বছরেব ছেলে তো—ঘুম পাবে না? তখন তলব হ'ত চা-র—বই ছেড়ে ঘুমতে ইচ্ছে করে কখনো—বিশেষ যখন সাক্ষাৎ মাযাবিনী জুমেলিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সামনে নতজানু হ'য়ে পীনবক্ষ পেতে দিয়ে বলছে করো খড়্গাঘাত—না পিস্তলাঘাত বুঝি? মনে নেই—তবে "পীনবক্ষ" পেতে দিয়েছিল এ মনে আছে—কেন না প্রথম পাতায়ই দণ্ডায়মান দেবেন্দ্রবিজযের সামনে ধূল্যবলুণ্ঠিতা নগ্নদেহা জুমেলিয়ার সে ছবি কি ভুলবার? কাজেই কড়া চা খেয়ে ঘুম তাড়াতেই হ'ত উপায় কি? বিশেষ যখন চা আমাদের ওখানে সর্বদাই হাজির। যে আসত চা খেত—আর অতিথি অভ্যাগতের তো বিরাম ছিল না। তা ছাড়া কবি ছিলেন চায়ের দারুণ ভক্ত। আজো মনে পড়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে গাইতাম আমি ও মায়া তাঁর চা-কীর্তন:

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই
যশমান চাহি না
(শুধু) বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভালো
এক পেয়ালা চা—চা—চা—চা।

শেষ তিনটি চা-য়ের আকারে ভৈরবীর লম্বা তান দিতেন কবি—আর সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত, বিশেষ যখন তিনি গাইতেন অন্তিম শ্লোকটি তাঁর মেঘগম্ভীর স্বরে:

অসার সংসার কে বা বলো কার—দারা সুত বাপ মা?

(এ) অসার জগতে যাহা কিছু সার সে ঐ প্রাতের এক পেয়ালা চা, চা—চা—চা।

এ হেন কষিতকাঞ্চনকায়া, সর্বনিদ্রানিবারিণী, নিত্যানন্দদায়িনী চা-দেবীর অপার মহিমায় যদি কোনো হতভাগ্য অরসিক সাড়া দিতে না পারত তাহ'লে তাকে তার তামসিকতা সম্বন্ধে সচেতন না ক'রে কবি জলগ্রহণ করতেন না। গয়াতে একবার এক গয়ালি জমিদার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে এসেছিল। গানের আসর। গান শেষ হ'লে মস্ত ট্রে-তে ক'রে চা আনা হ'ল। সবাই নিল কেবল সেই গয়ালি জমিদারটি বাদ। সে বলল তার ভাঙা ইংরাজিতে: "I don't take."

কবি তার কাছে এসে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন সুরে গম্ভীর মুখে বললেন: You don't take tea?"

সে বেচারি জমিদার—ছাপোষা মানুষ, কলেক্টর সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে ঘাবড়ে স্রেফ কুনিশ ক'রে ফেলল, বলল: "No Sir!"

কবি বললেন: "But you look like a gentleman!

এইরকম বেপরোয়া ছিল তাঁর হাসির ধরণ আনন্দ-পদ্ধতি। কেতা মেনে চলা ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম মামাদের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি। একটি নিমন্ত্রণ পত্রে এই রকম পাঠ ছিল—সভা হয়েছিল আমার মাতুলালয়ে তাই আমার বড় মামা জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারকেও হ'তে হয়েছিল এই আনন্দমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা:

> যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ—এহেন-যে-আপনি—আপনার ভবনের নন্দনকানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশ-নয়না ভামিনী সমভিব্যাহারে, আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন, অকিঞ্চিৎকর অধমদের গৃহে শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়! ইতি।

শ্রীমতী সুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।

এ-আমোদে নানা সাহিত্যিক নানাভাবে আমোদ ক'রে উত্তর দেন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দে:

> ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি, যমপ্রতাপ চ নাহিক মে।
> (ন চ) নন্দনকানন স্বর্ণসুবাহন, পদ্মবিনিন্দিত পদযুগ মে ॥
> আছে সত্যি পদরজরত্তি, তা-ও পবিত্র কি—জানিত নে।
> চৌদ্দপুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে ॥

কিন্তু,

মেঘাচ্ছন্নে শনি-অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা না ঘটে মে।
কিম্বা যগুপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে॥

কবির এধরণের কৌতুকপ্রিয়তার আর একটি কাহিনী কয়েক বৎসর আগে শ্রীঅরবিন্দের শ্বশুর ৺ভূপাল বসু মহাশয়ের মুখে শোনা (তাঁর ভাষায় বলবার চেষ্টা করি যতটা পারি) :

"সে সময়ে তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব। কী আমুদে লোক যে ছিলেন —আর আমাদের জন্যে কীরকম দরাজ হাতে খরচ করতেন যে! বেশ মনে আছে— বড় বড় অনেক লোককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কী কাণ্ড! আমরা বিকেলে গেছি। সন্ধ্যাবেলা তোমার মা ও বাবা এসে বললেন জায়গা হয়েছে। 'এত তাড়াতাড়ি?'—'চলুনই তো।'

"গিয়ে দেখি টেবিলে সাজানো চা স্যাণ্ডউইচ, কেক, চকলেট, ইত্যাদি। ভাবলাম বোধ হয় high tea দিয়েই সারলে দ্বিজু।

"একটু খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই—'চলুন চলুন—ওঘরে।'—'কী ব্যাপার?'— আহা চলুনই তো!'—পাশের ঘরে গিয়ে দেখি কি, মাটিতে শাদা পাথরে লুচি পোলাও মাছ মাংস ইত্যাদি। খেতে বসেছি একটু খাওয়ার পরেই ফের 'চলুন চলুন ওঘরে।' আমরা আর যেতে চাই নে। 'সে কি হয়—you must be a sport': কী করি পাশের ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে সার সার প্লেটে সাহেবিখানা। মজা হচ্ছে যে কোনো খাওয়াটাই জুৎ হল না।'

আমি বললাম হেসে: "পেট ভরল না তাহ'লে?"

ভূপালবাবু হাসলেন: "অত খাবার একটু একটু ক'রে খেলেও যে কণ্ঠাগত প্রাণ হয় দিলীপ। পেট ভরবে না! সে আনন্দময় মানুষটি যেখানে host?" হা হা হা" ব'লে বৃদ্ধের সে কী হাসি।

পঞ্চম উল্লাস

ভূপালবাবু নিজে ছিলেন রসগ্রাহী মানুষ—তাই কবির "আনন্দময়" সত্তাটি সহজেই তাঁর প্রাণ টেনেছিল। সবারই টানত—মানে যারা আনন্দ হাসি উচ্ছলতার সহজ বিকাশ ভালোবাসে। কিন্তু সবাই ভালোবাসে না এ আমি ঠেকে শিখেছি। তাদেরই সম্বন্ধে কবি ছড়া বেঁধেছিলেন:

দেখ দিয়েছেন এই দন্ত কটা মনুষ্যের যে দয়াময়
তাহা চর্বণ করবার জন্যেই শুধু, বাহির করবার জন্য নয়।

হাসতে যারা জানে না তাদের পাড়া দিয়ে কবি হাঁটতেন না। অথচ যখন তিনি তর্কালাপ করতেন বা গম্ভীর আলোচনা করতেন তখন দেখতাম তাঁর অন্য রূপ। পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখে যখন মুগ্ধ হই তখনো এই সত্যটিই নতুন ক'রে উপলব্ধি করি যে হাসি গাম্ভীর্যকে সমৃদ্ধই করে—হাল্কা করে না। নিদারুণ গম্ভীরানন মানুষের সংস্পর্শে এসে যখন প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে তখন জপ করেছি কবির প্রাণখোলা হাসি, রবীন্দ্রনাথের রসিকতা, গিরিশ মেশোর সদা স্নিগ্ধ সখ্যশক্তি শোযোক্ত মানুষটির কথা বলবার সময় এলো কিন্তু তার আগে কবির আনন্দময় ব্যক্তিরূপের কথা আর একটু বলি। বলতে ভালো লাগে আজ আরো বেশি—যখন চারদিকে গম্ভীরাননের শোভা যাত্রায় মনটা স্তিমিত হ'য়ে আসে।

ভূপালবাবু যে-সময়ের কথা বলেছিলেন তখন মা বেঁচে। তারপর অবশ্য কবির হাসির উচ্ছলতা ক'মে নিয়েছিল। যা এতাবৎকাল সামাজিকতায়ই ফুটছিল তা আদর্শবাদে স্ফুট হ'তে সুরু করল তাঁর নানা রচনায়। কিন্তু তবু যখনই মজলিশ হ'ত সেই স্বচ্ছ আনন্দময় সুন্দর মানুষটি সভা উজ্জ্বল ক'রে বসতেন হাসির হররা জাগিয়ে। সে-উজ্জ্বলতা তাঁর প্রাণোচ্ছলতারই আভা, তাঁর আশেপাশে কারুর উজ্জ্বলতার সঙ্গেই যার তুলনা চলত না।

তাঁকে তাঁর অনুরাগীর দল এই প্রাণোচ্ছলতার জন্যে কি রকম ভালোবাসত বলি। একবার কোথায় টুরে গিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায় মাস দুই বাদে। হঠাৎ দেখি নির্মল মুখে গোঁফদাড়ির দারুণ জঙ্গল। মর্মাহত হ'লাম। তিনি হেসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: "এ বাবাকে মনে আর ধরছে না বুঝি?"

লজ্জিত হ'য়ে তাঁর বুকে মুখ ডুবিয়ে চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু তাঁর এহেন রূপ মনে ধরেছে এমন ডাহা মিথ্যা কথাটাই বা উচ্চারণ করি কী ক'রে?

সেদিন বিকেল বেলা তিনি গেলেন ঝামাপুকুরে তাঁর বন্ধু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ওখানে। মা বেঁচে থাকতে তাঁদের ওখানে আনন্দের কী মেলাই যে বসত তাঁকে কেন্দ্র ক'রে! মিত্রদের কয় ভাইই ছিলেন তাঁর ভক্ত ও বন্ধু।

"এ কী?" "এ কী?" "এ কী?"

ফণীবাবু জ্ঞানবাবু হেমবাবু যতিনবাবু সবাই এসে হাজির। consternation—সার্বজনীন!…তারপরই কথা ফুটল মিত্রসুতবৃন্দের।

"ওরে ক্ষুর—ওরে জল—ওরে সাবান।"

"ধরো চেপে ধরো—যতিন তুমি ওদিকে, আমি এদিকে—জান!—"

অগত্যা কবি বললেন হেসে: "আচ্ছা আচ্ছা ছাড়ান নেই যখন নিজেই কামাচ্ছি।" ব'লে নিজে হাতে দাড়ি গোঁফ ফেলে দিলেন।

যেই দেওয়া সবাই "এই আমাদের দ্বিজদা—পায়ের ধুলো নেও, পায়ের ধুলো নেও।"

নিজের দাড়ি গোঁফ নিয়ে পাঁচজনকে এধরনের সানন্দ প্রগল্‌ভতার অধিকার দেওয়া - ওরিজিন্যাল নয় কি?

এই তো গেল তাঁর মজলিশের সদরের দিকটার একটা চলন্ত ছবি। কিন্তু এবার সুরধামের অন্দরের কথাটা একটু বলি।

সেখানেও তাঁর ঔদার্য দ্বার খুলে রেখেছিল যেন সবাইকেই। কে না থাকত? আমার গিরিশ মেশো, মাসিমা, আত্মীয় আত্মীয়ারা অতিথি অভ্যাগত—দুদিনের আলাপীরাও কয়েকদিন ক'রে থেকে যেত।

মামারা দেখে শুনে মায়াকে নিয়ে যেতেন তাঁদের কাছে—কারণ মেয়ে তো একটু একটু ক'রে বড় হচ্ছিল। আমাকেও নিয়ে যেতে চাইতেন, বলতেন এত হট্টগোলে ছেলের পড়াশুনো হবেই বা কী ক রে? কিন্তু আমি যেতাম না।

আবাল্য বহুর মধ্যে থেকেই মানুষ তো—তাছাড়া মামাদের ওখানে আদর যত্ন পেলে কি হয়,* কবির দুর্লভ সঙ্গ ও আসর তাঁদের ওখানে পাব কোথায়? তাঁরা কেউ তো আমার বন্ধু ছিলেন না যেমন ছিলেন কবি। বেশ মনে আছে রমেশচন্দ্রের মাধবী-কঙ্কণ প'ড়ে যা কষ্ট।

"কী রে? কী হয়েছে, মুখ ভার?" বললেন কবি বিকেলে আফিস থেকে ফিরে।

আর কোথায় যাবে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরিয়ে আমার সে কী কান্না—হেমলতা শ্রীশকে প্রত্যাখ্যান ক'রে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে চ'লে গেল শ্রীশকে একা ফেলে। আর কবির আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কী আদর! "সত্যি, হেমলতার কী অন্যায়—ব'কে দেব না? বিলক্ষণ! এতবড় অন্যায়—"ব'লেই সেই প্রাণখোলা হাসি। কী করি

হেসে ফেলতে হ'লস—লজ্জাও পেলাম। তবু সুখ দুঃখের সব কথাই তাঁকে না ব'লে থাকতে পারতাম না তাঁর ঠাট্টার ভয় সত্ত্বেও।

যখন আমাদের নিজেদের বাড়ি হ'ল "সুরধাম" তখন ভিড় আরো বেড়ে গেল, কারণ আমার একাধিক জ্যেঠামহাশয় প্রায়ই সপরিবারে এসে থাকতেন—হয় ইনি, নয় উনি, নয় তিনি। তাছাড়া দুঃস্থ আত্মীয়দের ছেলেরা পড়ত স্কুলে কলেজে সুরধামে থেকেই। বাড়িতে তিলধারণের স্থান থাকত না তখন। কবির নিজের হাঙ্গামই ছিল না। উদাসী যাকে বলে। সবার সঙ্গেই শুতেন। কখনো বা বারান্দায়। লিখতেন নিচের বারান্দায়, না হয় মাঠে। তখন সে আর এক মানুষ—ধ্যানমগ্ন মূর্তি তাঁর আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম মুগ্ধ নেত্রে।

এম্‌নি ক'রে জনতার মধ্যে আমাদের মানুষ করতেন তিনি ইচ্ছে করেই। পাকা পাকা কথা বললে তিনি অসন্তুষ্ট হ'তেন না কিন্তু অপরের সুখের চেয়ে আমার সুখ বড় এ-আইডিয়াকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। আমাকে কেউ বকতে সাহস পেত না, কিন্তু আমিও কোনো special privilege দাবি করতে সাহস পেতাম না। বলতে কি, সে প্রবৃত্তিই হ'ত না। আর পাঁচজনের মধ্যে আমি একজন মাত্র—এই ভাবটাই অজান্তে মনে গেঁথে গিয়েছিল—আমি যে ধনী পিতার একমাত্র পুত্র ও তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একথা কোনোদিন মনেই হয়নি কেননা চিন্তা আমার ওদিকে যাবার ফুরসৎই পেত না। তাছাড়া কবির দান দাক্ষিণ্য দেখে দেখে অর্থে আসক্তি আমার এত কুৎসিত লাগত—আরো টাকা জমানোকে তিনি ব্যঙ্গ করতেন ব'লে। বেশ মনে আছে—হিতার্থী কেউ তাঁকে সঞ্চয়ের উপদেশ দিলেই তিনি গাইতেন তাঁর একটি স্বরচিত বাউল (আমরাও দোয়ার দিতাম) :

ওরে সিন্ধুক-ভরা টাকা মিছে বন্ধ ক'রে রাখা।
যদি লাগল না কার উপকারে এলো নাক ব্যবহারে
সে টাকা তো ধনীর ঘরে শুধুই মুটের ঝাঁকা॥
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে রীতি মতন আয়ু বাড়ে
এই কথাটি একেবারে ব'লে গেলাম পাকা
ওরে সিন্ধুক-ভরা টাকা॥
যে-টাকার জন্যে মরছ ভেবে বারো ভূতে উড়িয়ে দেবে
তোমার ভাগ্যে রইল শুধুই উপোষ ক'রে থাকা।
ওরে সিন্ধুক-ভরা টাকা॥

* * * *

না"। আমাদের মনটা ব্যাপৃত থাকত সাহিত্যে, পুরাণ মহাভারতে, তর্কালোচনায়, গানে-গল্পে। টাকা, পসার, রাজাউজির মারা-জাতীয়-snobism কবির চুচক্ষের বিষ ছিল। বোধ হয় তাই তিনি আরো খুসি হ'তেন যখন দেখতেন আমার মন ঝুঁকছে ক্রমশ পড়াশুনোরই দিকে। ইংরিজি না-ই হ'ল—পড়াশুনো তো।

ক্রমশ হ'ল কি আমার মন ফের একটা মোড় নিল—গল্প ছেড়ে ঢুকল এবার ভক্তি-তত্ত্বে। ব্যাপারটা ঘটল একেবারে হঠাৎ। সব ইতিহাসটুকু বলার স্থান এ নয়—তবু খানিকটা বলতেই হবে—তাঁর ধর্মজীবনের ছবি একটু ফোটাবার জন্যে।

কবি এসময়ে ছিলেন সময়ে সময়ে আস্তিক, সময়ে সময়ে সংশয়ী। আজ বুঝেছি এই ভাবেই আমরা জীবন কাটাই পনের আনা লোক—এ ও তা খুঁজি, কিন্তু আসল ভগবত্তত্ত্বের রসকোষে খুব কম ভাগ্যবানই প্রবেশের অধিকার পান। কবির মনটা ছিল স্বভাবতই ভক্তিপ্রবণ, শ্রদ্ধালু কিন্তু সংসারের হীনতা ও অবিচার দেখে তাঁর মনে প্রায়ই সংশয়ের মেঘ আসত। রবীন্দ্রনাথের ঐ তুটি লাইন তাঁর বড় প্রিয় ছিল প্রায়ই গাইতেন :

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।

এই সময়েই তিনি লেখেন একটা নাস্তিক্যের মেজাজে :

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই
তারা বলে সব দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই।

শুনে শুনে আমার মনেও বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠল। খুব তর্ক করতাম ভক্তি-বাদীদের সঙ্গে (বার তের বৎসর বয়সেই) যে ভগবান আছেন কিনা সন্দেহ। সাংখ্যের একটা শ্লোক চোখে পড়েছিল বিজ্ঞভাবে আওড়াতাম :

ঈশ্বর অসিদ্ধ—যেহেতু প্রমাণাভাব।

এই সময়ের আমার পিসতুত ভাই নির্মলদা আসেন সুরধামে এণ্ট্রান্স পড়তে। (তখনো "ম্যাট্রিক" হয় নি।) পিসেমহাশয় শ্রীনিকুঞ্জমোহন লাহিড়ি পিসিমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পিসিমা ছিলেন পরমাসুন্দরী পিসেমহাশয়ও পরম সুন্দর পুরুষ। আমার ছয় পিসতুত ভাইয়ের মধ্যে চারজন ছিলেন সুদর্শন। নির্মলদা ছিলেন পরম রূপবান্। তাঁর রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। তুদিনে তাঁকে এমন ভালোবেসে ফেললাম যে তাঁতে আমাতে রীতিমত মান অভিমানের পালা সুরু হ'ল।

এহেন নির্মলদার প্রভাব আমার মনের উপর গভীর হবে এ আর বিচিত্র কি? তাঁর কাছে শুনতাম পিসেমহাশয়ের ধর্মজীবনের কথা। স্ত্রীবিয়োগের গভীর বেদনায়

তিনি ধর্মের দিকে ঝুঁকে নাকি গভীর শান্তি পেয়েছিলেন ও ভক্তি ভক্ত ভাগবতেই মশগুল হ'য়ে থাকতেন। যখন আমি নাস্তিকতার বিজ্ঞ যুক্তি দিতাম তখন নির্মলদা হাসতেন স্নেহের তাচ্ছিল্যভরা হাসি: "দূর্ ভগবান নেই এ কখনো হয়?"

কেউ তাচ্ছিল্য করলে আমি রেগে যেতাম। বলতাম: "প্রমাণ? কেউ দেখেছে তাঁকে?" নির্মলদা বলতেন: "অনেকেই দেখেছেন ভক্তেরা। পরমহংসদেব দেখেছেন।" পরমহংসদেবের কথা শুনেছিলাম একটু, গ্রাহ্যই করতাম না। বলতাম: "ওসব কবিকল্পনা—" ইত্যাদি। ক্রমশ একটু একটু ক'রে শুনলাম ধর্মজীবনে উপলব্ধির কথা—পিসেমহাশয়ের উপলব্ধির কথা। তাঁকে দেখতে গেলাম শান্তিপুরে। ভক্তির গানে তাঁর "ভাব" হ'ত। এমন ভাব দেখিনি কখনো ইতিপূর্বে। চম্‌কে গেলাম।

কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তিনি শুনে মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না। ধর্মের বিষয়ে কাউকে নিজের মতামত দিয়ে প্রভাবিত করতে নেই এই ধারণাটি তিনি বিদেশ থেকে এনে লালন করেছিলেন সযত্নে। কাজেই আমাকে যেন ফের ব'লেই দিলেন: "চ'রে খাও।"

তারপরে শুনলাম নির্মলদার রাঙা কাকার একটি দর্শনের কথা। তখন তিনি শয্যাশায়ী—ভাসান দেখতে যেতে ইচ্ছা অথচ উঠতে পারেন না। জগন্মাতাকে কেঁদে বললেন: "মা বৎসরকার দিনে ভাসান দেখব তাও যেতে দিলি নে।" জগন্মাতা করুণায় মূর্তি ধরলেন। "সে মূর্তির আলো সৌন্দর্য বরাভয় হাসির বর্ণনা হয় না মণ্টু"—বললেন নির্মলদা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে।

শুনে বিহ্বল হ'য়ে গেলাম। নির্মলদা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে। এই বইটিই আমার জীবনে ঘটিয়ে দিল যাকে বলে বিপ্লব। ভগবান দর্শন দেন?—কথা কন? তবে আর ভাবনা কী? পরমহংসদেব বলেছেন একটু সাধনা করলেই ভগবান পথ দেখিয়ে দেন।

করব সাধনা। কিন্তু এক মহামুস্কিল হ'ল এই যে সে-সময়ে সুরধামে আমার জ্যেঠামহাশয় সপরিবারে বিরাজমান—তা ছাড়াও আরো লোক আসে যায়। নির্জনতা পাই কোথায়? পরমহংসদেব বলেছেন: "ধ্যান হয় মনে কোণে বনে"। নির্জনে ভগবানকে ডাকতে হবে দেখা দাও ব'লে। কিন্তু একে কলকাতা তার উপর গৃহে অশ্রান্ত জনতা। নির্জনতাই হ'ল সব চেয়ে দুর্লভ বস্তু।

ভেবে চিন্তে আমার উর্বর বালক-মস্তিষ্কে একটা বুদ্ধি জোগাল। Where there is a will there is a way কথাটা তো আর মিথ্যে নয়—জ্ঞানের একটি গভীর এজাহার: তেতালার ছাদে তক্তা দিয়ে আড় ক'রে ঘুলঘুলির মধ্যে পরপর লম্বা

ক'রে সাজিয়ে একটি ছোট্ট কুঠরি (niche) মতন বানালাম। একটি মাত্র বালক সেখানে কোনোমতে বসতে পারে। উপরেও তক্তা নিচেও তক্তা। এক অদ্ভুত garret—তার উপর রবিনসন ক্রুসোর মতন স্বহস্ত-নির্মিত। অর্থাৎ কর্তাই হ'লেন ঘরামি।

এখানে ব'সেই আমার প্রথম ভক্তি-সাধনা সুরু। এখানে ব সেই পড়তাম বারবার কথামৃত, ভক্তমাল, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যদেবের ধ্রুবের প্রহ্লাদের কাহিনী। এ সবের অনেক কিছু আগেও পড়েছিলাম। কিন্তু এই ছোট্ট কুঠরিতে যখন পড়া সুরু করলাম দেখলাম সব অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু সে সব কথা বলা চলে না এ-স্মৃতিকথায়—যেহেতু সে হ'ল একান্ত ক'রে আমারি স্মৃতিকথা, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে বড় জোর দর্শক—উৎসুক সাক্ষী, কিন্তু তার বেশি না। কাজেই এ-প্রসঙ্গের এখানেই ইতি করা যাক।

* * * *

ছাদে স্বরচিত তক্তার কুঠরির সুবিধে ছিল এই যে দুপুর রোদেও ব'সে থাকা যেত। তাই প্রায়ই দুপুরে আমি সেখানে গিয়ে সেই দেড়গজি ঘরের মধ্যে কোনোমতে ব'সে দুলে দুলে পড়তাম শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য: শ্রীরামচন্দ্র দত্তের লেখা পরমহংসদেবের জীবনী, শ্রীসারদানন্দ স্বামীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীগুরুদাস বর্মণের শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনচরিত, বিবেকানন্দ স্বামীর নানা লেখা: জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, বীরবাণী, পত্রাবলী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাববার কথা, উদ্বোধন পত্রিকা, শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্বামিশিষ্য সংবাদ······আরো কত বই যে প'ড়ে ফেললাম কয়েক মাসের মধ্যেই। শেষটায় অসমসাহসিক হ'য়ে শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের তর্জমা পর্যন্ত দুটি স্থূলকায় খণ্ডে কিনে ফেললাম। কিন্তু ঋগ্বেদ পড়তে গিয়ে ঋষিদের 'পরে আর ভক্তি রইল না। কবিকে বললাম আপনার মুখে শুনি বেদের গুণকীর্তন, কিন্তু এ কী আচরণ বলুন দেখি ঐ ঋষিদের? ভগবানের কাছে চাইছেন কি না গরু ঘোড়া ছাগলের সুখ সুবিধা, সুবৃষ্টি, এ ও তা সাত সতের স্বাস্থ্য, বংশরক্ষা, দীর্ঘায়ু ছি ছি ছি! ভগবানের কাছে কি এই সব চাইতে হয়?" তখন আমার বুক জুড়ে আছে পরমহংসদেবের প্রার্থনা: "এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা····· ইত্যাদি।" তিনি ব'লে গেছেন দেহটা শুধু হাড়মাসের খাঁচা—ভগবান লাভের জন্যই দেহ—ভগবান লাভ হওয়ার পর দেহ থাকল বা গেল একই কথা—যেহেতু ভগবৎ লাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর সমাধিস্থ দাঁড়ানো মূর্তির সেই অপরূপ হাসি আমার বালক-

মনের সংশয়-আঁধার ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে। জগন্মাতাকে বলতে গিয়েছেন গলক্ষত রোগ সারিয়ে দিতে যাতে একটু খেতে পারেন কিন্তু জগন্মাতা তাঁর শিষ্যদের দেখিয়ে বললেন: 'এই তো এত মুখে খাচ্ছিস—লজ্জায় আর কথাটি কইতে পারলাম না।' সেই তক্তার কুঠরিতে ব'সে এই সব কথা মনে পড়ত আর গায়ে কাঁটা দিত। এহেন মন নিয়ে ঋষিদের এই সব ঐহিক প্রার্থনা শুনে ঋগ্বেদ মুড়ে সেই যে রেখে দিলাম এক কোণে আর ছুঁইনি এ পর্যন্ত।

কবি শুনতেন সব কথা মন দিয়ে। কিন্তু কোনো মন্তব্য বলতেন না। বলেছি, তিনি চাইতেন আমার মন ভাবতে শিখুক, ভাবার পথে ঝাপসা ঠেকলে প্রশ্ন উঠলে তবে তিনি বলতেন নিজের মতামত, কিন্তু ধর্মের কথা উঠলে বেশির ভাগ সময়েই চুপ। কেন—সেটা তখন ভালো ক'রে বুঝি নি। কারণ মনে রাখবেন, তখন সবে বার পেরিয়ে তেরয় পা দিয়েছি মাত্র—তখন কী ক'রে বুঝব সংশয়-গ্রন্থি ছিন্ন করা বুদ্ধিবাদী মানুষের পক্ষে কতখানি শক্ত? স্বয়ং অদ্বৈত গোস্বামীর সংশয় আসত—চৈতন্যদেব অবতার কি না। সংশয়ের গ্রন্থি যে কত প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে—অবিশ্বাসের শিকড় বুদ্ধি-পূজারী মনে কি রকম বহুদূরব্যাপী, সূক্ষ্মপ্রসারী—এসব হয়ত শ্রীঅরবিন্দের করুণা না পেলে কোনোদিনই তেমন ক'রে টের পেতাম না। তাই এখন দেখতে পাই এ সম্বন্ধে কবির মন পেণ্ডুলামের মত দোল খেত—একবার ভক্তির দিকে ঝুঁকে লিখত ভক্তিস্তোত্র, আবার পরক্ষণে নিরীশ্বরবাদের ক্ষোভ তাঁকে পেয়ে বসত। এ সম্বন্ধে শেষে বলব আরো কয়েকটি কথা। এখন আমার সঙ্গে তাঁর লেনদেনের কথাটা সেরে নিই।

তাঁর মনে বলিষ্ঠতার ও আন্তরিকতার প্রতি একটা সহজ সম্ভ্রম ছিল। তাই বালক ব'লে আমাকে তিনি একটুও অবজ্ঞা করতেন না: বরং ধর্মের দিকে আমি ঝুঁকেছি দেখে গৌরব অনুভব করতেন। তবু তাঁর মনে বোধ হয় দ্বিধা ছিল ধর্ম-জীবনের সব সমস্যার সমাধান বহন ক'রে এনে দিতে পারে কি না। কিন্তু এসব জল্পনা কল্পনা রেখে তাঁর স্মৃতি কথারই খেই ধরি ফের।

তিনি একটা বিষয়ে আমাকে তাঁর প্রবল মনের সমগ্র প্রবলতা দিয়ে জোর দিয়ে গিয়েছিলেন:—সেটা এই যে, জগৎ সমাজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে যা-ই বলুক না কেন,—যতক্ষণ তোমার নিজের হৃদয় মন বিবেক কোনো কিছুকে সত্য ব'লে মেনে নিতে না পারছে, ততক্ষণ হাজার সনাতন হ'লেও সে-সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নেওয়া তোমার পক্ষে হবে মিথ্যাচার। তাই উপনিষদ বেদকে শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও আমার এই ধরণের বেদে-অশ্রদ্ধায়ও তিনি আহত হওয়া তো দূরের কথা—দস্তুরমত খুসি হ'তেন। বলিষ্ঠ মানুষ যেখানেই বলিষ্ঠতা দেখে একটু খুসি না হ'য়ে পারে না—এমন কি এ-বলিষ্ঠতা একটু আধটু

নিষ্ঠুরতার দিকে ঝুঁকলেও সে জোর ক'রে বলতে পারে না—এটা আদৌ ভালো নয়। তিনি পুলকিত হ'তেন দেখে যে আমি নির্বিচারে কোনো কিছুকেই মেনে নিচ্ছি না—কোনো কিছু শ্রদ্ধেয় শুনে এসেছি ব'লেই শ্রদ্ধা করছি না। কারণ ধর্মের ক্ষেত্রেও এতক্ষণ আমি বলতাম জোর ক'রেই যে, ভুল হোক ঠিক হোক সত্যের শেষ যাচাই—"আমার" বিবেক আর কারুর উপদেশ বা এজাহার নয়।

হবি তো হ—ঠিক এই সময়েই আমাদের ওখানে হঠাৎ একদিন মহা বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অভ্যুদয়। এঁর যজুর্বেদ সম্পাদনের কথা (না, সামবেদ বুঝি মনে পড়ছে না) পড়েছিলাম রাজকৃষ্ণ রায়ের কোন্ একটা লেখায়। প'ড়ে এই বেদটি আমি খুঁজেছিলাম সারা কলকাতায়—কিন্তু পুরোনো বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরেও পাই নি। তাই সত্যব্রত সামশ্রমী এসেছেন শুনে আমার আনন্দ আর ধরে না। হয়ত যজুর্বেদে আছে সত্যিকার ভালো কথা—হয়ত ঋগ্বেদের মতন ছাই বই নয় যজুর্বেদ। ভালোই হ'ল এঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে—দরকার হ'লে জেরাও করব—ছাড়ছি নি—এইভাব আর কি—হবে না আনন্দ?

কিন্তু তিনি আমার জ্বলন্ত উৎসাহে দিলেন একঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢেলে। আমি বেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু—ঋগ্বেদ প'ড়ে হতাশ হয়েছি—এ কী কাণ্ড! বললেন কবিকে হেসে: "বলেন কি দ্বিজুবাবু! এইটুকু ছেলে বেদের কথা জানতে চাইছে? কী বুঝবে ও বেদের এই বয়সে?

আর যাবে কোথায়। আমি রেগে একেবারে টং। কবি আমাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে শান্ত ক'রে বেদজ্ঞ মহাশয়কে বললেন হেসে যে সাবধান! আমাকে ছেলেমানুষ বললে আমি যুদ্ধং দেহি ব'লে উঠি।

উঠব না? শুধু তো কবিরই দীক্ষা নয়—তার উপরে আমার দ্বিতীয় গুরু গিরিশ মেশোর কাছে নিয়েছিলাম আর এক পাঠ: "বুড়োরা যখন তর্কে পারে না তখন কান্না সুরু করে—ছেলেমানুষে বোঝে না।" সে সময়ের খবর আপনাকে কী দেব বন্ধুবর? বলেছি কবি প্রকৃতিতে ছিলেন দুই ই, আস্তিক নাস্তিক একাধারে। মনুকে একেবারে দেখতে পারতেন না। বোধ হয় সেই জন্যেই মনুসংহিতা আমারো ভালো লাগে নি—অর্ধেক প'ড়েই আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছিলাম। কেবল ওর একটি শ্লোক দারুণ ভালো লেগেছিল কেন জানি না: "সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বম্ আত্মবশং সুখম্।" কারণ কবির কাছেও শুনতাম এই কথা। পুরুষমানুষকে হ'তে হবে সব আগে স্বাবলম্বী। "Effeminate" শব্দটায় তিনি ঠিক্ সেই মিড় লাগাতেন যে-মিড় মিড়-শুচিবাইগ্রস্তরা লাগান "profligate" শব্দটায়।

আরো মনে রাখবেন যে যদিও কবি প্রথম থেকেই প্রচুর উৎসাহ দিতেন শাস্ত্র-পাঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে "শাস্ত্রী" শব্দটাকে নিয়ে করতেন দারুণ হাসাহাসি। শাস্ত্রীয় কূটতর্কের 'পরে তাঁর ছিল বিজাতীয় অবজ্ঞা। আজো মনে পড়ে তাঁর সেই অনুপম আবৃত্তি সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ মিড়ে অনুষ্টুপ ছন্দে (আষাঢ়ে—কলিযজ্ঞ):

একদা তু বঙালীর হইল বড় মুস্কিল
কূটতর্ক উঠে এক মহাশব্দে ঘরে ঘরে ॥
উঠিল কুটিল প্রশ্ন—সমস্যা জটিল অতি।
শাস্ত্রীয় কি অশাস্ত্রীয় কচুপোড়া হি ভক্ষণ ॥
আবার হইলা দেশে ডাকিতা মহতী সভা।
সমাগত সেই প্রশ্ন বিচার করিতে সবে ॥
আবার সে সভাস্থানে হইলা বহু বক্তৃতা।
আবার বাহবা শব্দে করতালি চটাপট ॥
কিন্তু সেই মহাপ্রশ্ন মীমাংসা হইবে কিসে।
সবাই বক্তৃতাদক্ষ সবাই বক্তৃতা করে ॥
পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত।
দিলে হি বক্তৃতাচোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥

বলেই তাঁর সে-অতুলনীয় হাত নেড়ে ঠোঁটে mock-gravity-র দারুণ ঝিলিক খেলিয়ে (যাতে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত) ফলশ্রুতি পাঠ আজও যেন ছবির মতন দেখিতে পাই:

বঙালী মহিমাকীর্তিকলাপ কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

এই "হি" বলতে মনে পড়ল অতুলদার প্রশ্ন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন একদিন কবির "কর্ণবিমর্দন কাহিনী"-র পঙ্‌ক্তিকা পাঠান্তে: "দ্বিজুদা, ঐ যে "চাপকান পরিয়া আপিস নিত্য, আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য" পড়লেন ওখানে হিটা কি হ'ল? কবি গম্ভীরভাবে বললেন তৎক্ষণাৎ: "ওটা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়।" অতুলদা এ গল্পটা বলতে সে কী অট্টহাস্য করতেন লক্ষ্ণৌয়ে, আজও মনে পড়ে।

* * * *

তবু কবি ক্রমাগতই বলতেন আর্যঋষিদের গৌরবের কথা, যদিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করতেন তাঁদের অধুনাতন উত্তরাধিকারী "বাঙালী"কে। মন্দ্রে তার "জাতীয় সঙ্গীত কবিতায় এ-ব্যঙ্গ রূপ নিয়েছে প্রকাশ্য জালায়:

লজ্জা নাই! 'আর্য' বলি' চেঁচাই হাসিমুখে!
মুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে?
ছিলাম বা কী হয়েছি এ কী!—
একথা নাহি ভাবিয়া দেখি,
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে!
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে!

কিন্তু তবু এ নিশ্চয় তাঁর মূল প্রকৃতিটি ছিল বিদ্রূপীর নয়—শ্রদ্ধালুর। এই কথাই তিনি বলেছেন তাঁর "আলেখ্যে" সার তারক পালিতের উপর লেখা কবিতাটিতে। এর একটু ইতিহাস বলি। লোকেন কাকার কাছে শোনা এ কাহিনী। সার তারক পালিত পুত্রকে ডেকে বলেন তাঁর সব সম্পত্তি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করতে চান—প্রায় পনের লক্ষ টাকা। লোকেন কাকা তাতে ইংরেজিতে বলে: "Father I am proud of you!"

কবি একথা তাঁর মুখে শোনার পরেই লেখেন সার তারক পালিত সম্বন্ধে প্রশস্তি "ভক্ত" কবিতায়:

ব্যঙ্গ কবি আমি? ব্যঙ্গ করি শুধু?—নিন্দা করি শুধু সকলে?
কভু না। আসলে ভক্তি করি আমি, ঘৃণা করি শুধু নকলে।
যেথা আবর্জনা ধরি সম্মার্জনী, তাই ব'লে তো আমি অন্ধ না।
যেখানে দেবতা ভক্তিপুষ্প দিয়ে স্তুতিছন্দে করি বন্দনা।
যাও ছন্দ, তবে পড়ো মহত্ত্বের ঐ চরণারবিন্দে জড়ায়ে,
পরে ঊর্ধ্বে ওঠো—ঊর্ধ্বে উঠে পড়ো সমগ্র বঙ্গে ছড়ায়ে।

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই তিনি চাইতেন আমি পড়ি শাস্ত্র পুরাণ প্রাণ ভ'রে। দামি দামি বই কিনতে যত টাকা লাগে দিতেন যদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হয়। প্রশ্রয় পেয়ে একদিন বায়না ধরলাম "স্মৃতি পড়তে হবে বাবা!"—"সে কি রে? শেষটায় স্মৃতি?"—"কেন নয়! এই দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহে লিখেছেন পরাশরসংহিতার কথা—তাতে বিধান ছিল—যে স্বামী ম'রে গেলে, নিরুদ্দেশ হ'লে ক্লীব হ'লে নষ্ট হ'লে বা পতিত হ'লে বিধবা বিয়ে করতে পারেন"—ব'লেই তাঁর সামনে বিধবাবিবাহ খুলে তাঁরই সুরে ধরলাম আবৃত্তি: "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।'—বাবা, এ পরাশর সংহিতা কোথায় পাওয়া যায়?"

কবি গালে হাত দিয়ে বললেন: "তাই তো, সাংঘাতিক প্রশ্ন!"

কিন্তু হঠাৎ বর দিলেন কল্পতরু। বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন বেরুল উনবিংশতি সংহিতা —অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, পরাশর প্রমুখ ঝাড়া উনিশটি ঋষির সংহিতা! ছোট্ট ছোট্ট ছোট্ট। তৎক্ষণাৎ কেনা! কিন্তু হায়রে! ঋষিদের জ্ঞানের বহর দেখে বইটির দুচার পাতা উল্টেপাল্টেই রেখে দিলাম। বলুন দেখি অত্রি ঋষির কি আর কাজকর্ম ছিল না যে এই সব বিধান দিতে বসে গেলেন :

বৃকশ্বান শৃগালৈস্তু যদি দষ্টশ্চ ব্রাহ্মণাঃ
হিরণ্যোদোকসংমিশ্রং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুদ্ধতি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে যদি নেকড়ে, কুকুর কি শেয়ালে কামড়ায় তাহ'লে সোনামেশানো ঘি খেয়ে তিনি শুদ্ধ হবেন, অথচ ব্রাহ্মণীকে ওরা কামড়ালে তিনি "উদিতং গ্রহনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ" কিনা গ্রহনক্ষত্রের দিকে তাকিয়েই শুদ্ধ হবেন। আ গেল যা! হাইড্রোফোবিয়া হবার ভয়ে যখন মরছে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী— তখন উড়ে এসে জুড়ে বসল কিনা এই শুদ্ধ হবার ভাবনা—ডাক্তার ডাকার ভাবনা ছেড়ে?

"এই সব স্মার্ত পণ্ডিত চালাতেন হিন্দু সমাজ বাবা?" বলতাম আমি খুব রাগ ক'রে। করব না রাগ? উশনঃ মুনি এও লিখেছেন—বহুপুত্র কামনা করবে কেননা সে যদি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দেয় তাহলেই ব্যস্ "তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিম্।" সত্যি অবাক লাগে আজও ভাবতে যে এই সব বই একদল ঋষি লিখে গেলেন কী ব'লে? তাঁদের না হয় কাজকর্মই ছিল না, কিন্তু লজ্জা ঘৃণা কোথায় গেল?

কবির প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল এহেন হিন্দুদের আচারপরায়ণতা নিয়ে বিদ্রূপ করার জন্যে (কল্কি অবতারে বক্তা ভূতনাথ বলছেন) :

আর্য ঋষিগণ—ছিলেন আর্যঋষি যাঁরা
বলো, প্রাণের ভ্রাতৃগণ! কী না জানতেন তাঁরা?
ধরণী যে—মহী, তড়াগ—নদী, আকাশ—ব্যোম
নক্ষত্র যে তারা, সূর্য—রবি, চন্দ্র—সোম,
সবই জানতেন—সবই এই হিন্দুশাস্ত্রে পাবে···ইত্যাদি

ষষ্ঠ উল্লাস

এই সময়ে বছর-চৌদ্দ বয়সে—আমার বিতৃষ্ণা এসেছিল অনেক হিন্দু শাস্ত্রে। পুরাণ উপপুরাণ মাঝে মাঝে পড়তাম কিন্তু ভালো লাগত না আর তেমন। এক বিষ্ণুপুরাণ ছাড়া।

কিন্তু মহাভারতের কথা কবির কাছে শুনতাম ব'লে বারবারই পড়তাম। এবার মূল মহাভারতের অনুবাদ নিয়েই বেশি খাটতাম। সত্যি, যতই পড়তাম মহাভারতের নানা চরিত্র চিত্র, ততই মুগ্ধ হ'তাম। রামায়ণও পড়তাম, কিন্তু রামকে আমার কোনোদিনই তেমন ভালো লাগে নি। এর দুই কারণ ছিল: এক—মধুসূদনের মেঘনাদবধে রামচরিত্র, দুই—কবির "সীতা"-র সীতা চরিত্র। রামকে কবি পছন্দ করতেন না তেমন, কিন্তু সীতার কথা বলতে না বলতে উঠতেন উজিয়ে। আর লক্ষ্মণের মহত্ত্ব। আজো মনে পড়ে সীতায় তাঁর সেই অপরূপ আবৃত্তি যা শুনতে বড় বড় অভিনেতারাও আসতেন। রামের রাজসভায় লবকুশ এসে পৌঁছতেই মহর্ষি বাল্মীকি বললেন লবকে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়ে:

লব! এই এই পিতা রামচন্দ্র, এই পিতৃব্য লক্ষ্মণ তোমার। প্রণম পদে।

লব। (লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া) ভাগ্যবান আমি তপোধন, এহেন পিতৃব্য যার। পদে প্রণমি পিতৃব্য মম।

বাল্মীকি। পিতারে প্রণম লব!

লব। (সাভিমানে ফিরিয়া) মহর্ষি! কৈশোরে ছায়াসম
যে-পত্নী সাম্রাজ্য ছাড়ি' রামানুবর্তিনী বনবাসে
লঙ্কায় যে তার জন্য করে নাই সুদীর্ঘ প্রবাস
অশ্রুপাত বিনা: লোকনিন্দা ভয়ে তারে অনায়াসে
দেয় নির্বাসনদণ্ড যেই রাম—ক্ষমা করো দাসে
ভগবান্—সেই রামে প্রণাম না করে লব।—তার
অটল বিশ্বাসে যিনি করেছেন রূঢ় অবিচার
অগাধ সে-প্রেমে হানি' শেল, তাঁর অনন্ত নির্ভর
দলি' পদতলে—দেব, হোন্ তিনি অযোধ্যা-ঈশ্বর,
হোন্ তিনি নিখিলের পতি—তিনি তুচ্ছ, তিনি ছার।

হোন্ তিনি রাবণবিজয়ী—তিনি ভীরু শতবার।
(রামচন্দ্রকে) পিতা! রামচন্দ্র!
পৃথিবীর পতি তুমি? নরোত্তম
তুমি? বীর তুমি? ধর্মপরায়ণ? নিষ্ঠুর, নির্মম!
ধিক কাপুরুষ ধিক। তোমার পাপের নাই সীমা
ও-উচ্চ ললাটে। প্রভু, এই কৃষ্ণ কলঙ্ক-কালিমা
রবে লেপি' চিরদিন রাজেন্দ্র! জানিও যশোগীতে
বাজিবে বিকট ধ্বনি চিরদিন এ-অন্যায় পিতা!

মনে আছে, যখন তিনি এ অংশ আবৃত্তি করতেন তাঁর গৌরবর্ণ উদার ললাট হ'য়ে উঠত প্রায় সিঁদুরের ম'ত রাঙা, স্বর কাঁপত। আমার বালক হৃদয়ে কিন্তু দুটো ভাবের দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হ'ত পিঠ-পিঠ বেশ পরিষ্কার মনে আছে আজো। আনন্দও হ'ত - কবির চরণে লুটিয়ে পড়তে। এমন পিতা কজন পায়?—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে যেন শিউরে উঠতাম—যদি আমার পিতা হ'তেন লবের পিতার মত—তাহ'লে? উঃ - তাঁকে প্রণাম পর্যন্ত করতে পারতাম না? একি ভাবা যায়? স্বপ্নে কোনো দারুণ আতঙ্কের কিছু দেখে আমরা হঠাৎ জেগে উঠে যেমন স্বপ্নটা অসত্য বুঝে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠি অথচ কার কাছে সেটা বুঝতে পারি না—আমার মনে ঠিক তেমনি কৃতজ্ঞতা ছেয়ে আসত ভাবতে যে আমার পিতা রামের মত নন। আবার কবি যখন রামচন্দ্রের আত্মগ্লানির কাহিনী আবৃত্তি করতেন—মনে হ'ত তিনিই রাম—আহা, যদি হতাম লব, দিতাম দুর্ভাগ্য রামকে একটু সান্ত্বনা। কিন্তু পরে সীতার কথা মনে হ'লেই স্মরণে জেগে উঠত মার অপরূপ সুন্দর কোমল মুখখানি। এহেন মাকে যদি আমার পিতা জঙ্গলে পাঠিয়ে দিতেন (শিশুর পক্ষে কল্পনা তো একেবারে নিরঙ্কুশ) তাহ'লে কেমন ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম? ভাবতেও বুক কেঁপে উঠত—নিজের পিতাকে শ্রদ্ধা করতে না পারা—এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা কি কল্পনা করা যায়?

এ শ্রদ্ধা আমার শিখরে উঠত যখন তিনি পড়তেন সীতার শেষ অঙ্কে বাল্মীকির প্রেম নিয়ে সেই অপূর্ব স্তব। তখন আমার বালক-শ্রবণ সত্যিই যেন শুনত তাঁর বলিষ্ঠ মধুর কণ্ঠে বাল্মীকির ঝংকার।—যখন বাল্মীকিকে বশিষ্ঠ বললেন যে সীতাকে রাম পুনর্গ্রহণ করতে পারেন না কেননা রাজার কর্তব্য এহেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ—"প্রেম না কর্তব্য বড়?" তাতে বাল্মীকি বললেন (মনে আছে পড়তে পড়তে কবির চোখে জল সত্যিই উপচে পড়ত—একাধিকবার তাঁকে চোখ মুছতে দেখেছি):

কর্তব্য কি নাহি স্ত্রীর প্রতি
মহাভাগ ? (রামচন্দ্রকে) মহারাজ শোনো তবে—কহে শাস্ত্র নব
যদি অবজ্ঞাত আজি। তুমি পতি, সীতা পত্নী তব।
পতির কর্তব্য নহে তাহারে আশ্রয় দান তবে ?
মেষ-সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তি মাত্র—যবে
বাসনা রাখিবে, যবে বাসনা করিবে পরিহার -
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা কিম্বা প্র ত্তি তোমার।
শোনো তবে—তোমার ম'তই হায় বক্ষের ভিতরে
তাহারো হৃদযখানি মহাবাজ অনুভব করে।
সীতা পত্নী ভুলে যাও—তুমি রাজা, তব প্রজা সীতা
অপবাদ-অপমান-বিদ্ধা।—যদি বিশ্বপ্রতাড়িতা
নিরপরাধিনী 'আসি' মাগে তব শুদ্ধ সুবিচাব,
তাহারে বিদায় দান ন্যায মতে কর্তব্য রাজাব।
(বশিষ্ঠকে) করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি -
কর্তব্য কি প্রেম বড়।
আমি মূর্খ, আমি বুঝি—প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতব।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে, সেই পথ বাহি'।
প্রেম দেয বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন কবে তাহে।
প্রেম নহে ভ্রম মহাভাগ, বাতুলের স্বপ্ন নহে :
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য প্রেম কভু মিথ্যা নাহি কহে।
প্রেম প্রভু, কর্তব্য তাহাব ভৃত্য। বিশ্ব চরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে ? বিশ্বস্রষ্টা নিবন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময ? প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ।
প্রেমবদ্ধ-পরিণযে নিত্য নব সৃষ্টি মহারাজ !
কর্তব্য—নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণ স্তূপ। তাহে শিল্পী ভাস্করের ম'ত
প্রেম দেয মূর্তি। শুষ্ক কর্তব্য-কঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ। শুষ্ক তরুবর শিরে
প্রেম দেয় কুসুম পল্লব। রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম, পবিত্র শিশির-স্নিগ্ধ জলে

সুমন্দ পবনে। ধীরে চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে
প্রেম আসে সুপ্তিসম। কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে?
চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে। দিগন্ত বিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত। প্রেমে সূর্য ওঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র—চন্দ্রমা প্রেমে হাসে।
প্রেমে বহে বারিধারা, প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে।

মনে পড়ে, কী উচ্ছ্বাস জেগে উঠত যখন এ অপূর্ব প্রেম-স্তবটি তাঁর মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত। সত্যই মনে হ'ত, মাধুর্যে সমস্ত ঘর ভ'রে গেছে। মনে পড়ত বিল্বমঙ্গলের উচ্ছ্বাস—প্রেম নিয়ে সেই অপরূপ ঝঙ্কার তোটক ছন্দে :

মধুরং মধুরং বিপুবস্ত বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিত মেত দহো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ॥

সে আজ কতদিনের কথা। কিন্তু প্রেম সম্বন্ধে তাঁর এই স্তবটি সেদিনও আমাব কানে যেমন মন্ত্রের ওঙ্কারে বেজে উঠত আজো তেম্‌নি বেজে ওঠে।

কিন্তু একটা জিনিস সেই ছেলেবেলাতেই আমার চোখে পড়েছিল যে কবির মধ্যে দুটো মানুষ ছিল : একজন তীক্ষ্ণ বিচারক। বিবেকী বিশ্লেষক আর একজন সরল প্রণয়ী, উচ্ছ্বাসী প্রেমিক। তাই প্রেমের ভক্তির আবেগে কর্তব্যকে যতই যেন না তিনিই ছোট করুন কর্তব্য সাম্‌নে পড়লে সে কর্তব্য তিনি নিখুঁৎ রূপেই নির্বাহিত করতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ আমাদের কাছে প্রায়ই করতেন। একবার চাকরির কর্মস্থান পড়ে সুজামুটায়। সেখানে জমির জরিপ নিয়ে বেশি খাজনা নিতেন সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা। কবি সেখানে গিয়ে সেই বেশি খাজনা আদায় রদ করে দেন যেহেতু সেভাবে খাজনা নেওয়া ছিল বে-আইনি। অফিসারেরা তাতে রাগে ক'রে জজের কাছে আপীল করেন। জজ কবির রায় উল্টে দেন এবং ছোট লাট সার চার্লস্ ইলিয়ট তাঁকে ধম্‌কে দেবার জন্যে ডেকে পাঠান। কিন্তু কবি

তাঁর ধমক কানে তুললেন না—সাফ ব'লে দিলেন মুখের উপরেই যে ছোটলাট সাহেব বরাবর পঞ্জাবে ছিলেন, বাংলা দেশে জরিপের আইন আদৌ জানেন না। সাক্ষাৎ ছোট লাটকে মুখের উপর আইন-অনভিজ্ঞ বলায় কবির প্রমোশন বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরে হাইকোর্টে কবির রায়ই সমর্থিত হয়েছিল ব'লে তাঁকে ডিশমিশ করা হয়নি।

শুধু সত্যাচার ও স্পষ্টভাষিতাই নয়, শ্রমশীলতা ও কর্মকুশলতার জন্যেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর এক উপরওয়ালা সাহেব তাঁর সম্বন্ধে রিপোর্ট লেখেন: "Mr. Roy is a monument of industry and ability." শুধু এই জন্যেই তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন নি। ওরা জানত এশ্রেণীর সাধু উৎকোচ বিমুখ মানুষ কলিযুগে দেখা গেলেও খুব বেশি দেখা যায় না। কবি প্রায়ই বলতেন এসব গুণ তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুর্দার কাছ থেকে। ঠাকুর্দাই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথম ঘুষ নিতে অসম্মত হন—একথা তাঁর আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত ক'রে ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। রাজার ঋণ থেকে তিনি তাঁকে মুক্ত করেন শুধু জমিদারি ভালো ক'রে দেখাশুনার বন্দোবস্ত ক'রে। এজন্যে তাঁর এত খ্যাতি হয় যে লালগোলার রাজবাটি থেকে তাঁকে কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠান বেশি মাইনে দেবেন ব'লে। কিন্তু তিনি বেশি মাইনে পেয়ে চ'লে যাবার কথায় রাজা ম্রিয়মান হয়ে পড়ায় ঠাকুর্দা স্থির করেন অন্নদাতার দুঃখের কারণ হবেন না। লালগোলা তাঁকে ৩০৩৲ মাইনে দিতে চায়। তবু তিনি রাজার কাছে ২০০৲ মাইনের চাকরিতেই কাজ করবেন স্থির করেন।

শুধু এই সততাই নয়, ঠাকুরদার দুঃসাহসী স্পষ্টবাদিতাও কবির মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল বাল্যকালেই। তাঁর কাছে প্রায়ই শুনতাম ঠাকুর্দা কত সময়ে অন্নদাতা রাজার মুখের উপর প্রতিবাদ করতেন কোনো অন্যায় দেখতে না দেখতে। এজন্যে তাঁর চাকরি যাবার সম্ভাবনা খুবই ছিল এবং গেলে তাঁর খুবই দুর্ভাবনার কারণ ছিল। রাজবাড়িতে একদল লোক তাঁর ঋজু সত্যাচার ও নিষ্কলুষ জীবন দেখে বহুচেষ্টা করেছিল তাঁকে সরাতে। কিন্তু রাজা ও রাণী জানতেন যে তিনি গেলে জমিদারি ফের বাঁধা পড়বে মন্দ কর্মচারিদের তহবিল তছরুপের ফলে। তাই তাঁকে পদচ্যুত করার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি, যদিও তাঁর স্পষ্টবাদিতায় সময়ে সময়ে তাঁরা এত বিরক্ত হতেন যে তাঁকে বরখাস্ত করবার জন্যে রুখে উঠতেন। শুধু ঘুষ না নেওয়া তো ছোট কথা—যে যুক্তিতে স্বার্থবুদ্ধির সংস্রব থাকত সে যুক্তিকেও তিনি নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করতেন এম্‌নি ছিল তাঁর সত্যাচারের আদর্শ। একটা উদাহরণ দেই। রাজা সতীশচন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার পরে কথা ওঠে রাজসম্পত্তির

ভার মহারাণী নেবেন, না কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে ঠাকুর্দার নিজের ভাষায়ই বলি: "একদিন হঠাৎ রাণী অন্দরমহলের দ্বারে আমাকে ডাকাইয়া দাসীদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে 'বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে দেওয়া কর্তব্য কিনা।' আমি উত্তর করিলাম যে সম্পত্তি কোর্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে মহারাণীর মঙ্গল, আর রাণীর হস্তে থাকিলে চাকরদিগের পক্ষে মঙ্গল।" অনেক বাদবিসম্বাদের পর সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতেই যায়। কোর্টও ঠাকুর্দাকেই ম্যানেজার বাহাল করে, তাঁর সততা ও কর্মকুশলতার খ্যাতি শুনে। কিন্তু তারা না করতেও পারত তো। ঠাকুর্দা এ-বিপদের সম্ভাবনা আছে জেনেও নিজের স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর মত দিয়েছিলেন ন্যায়বুদ্ধির তাগিদে।

কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে চাকরি নিখুঁৎভাবে করলেও ঠাকুর্দার চাকরির সঙ্গে কবির চাকরির একটা মূলগত ভেদ ছিল: ঠাকুর্দার সঙ্গে রাজা-রাণীর সম্বন্ধ ছিল প্রভুভৃত্যের নয়—বন্ধুত্বের, শ্রদ্ধার, অনুরাগের। যেখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ আছে সেখানে বাদানুবাদ মনান্তরের ক্ষতিপূরণও আছে। ঠাকুর্দার আত্মজীবনীতে বহুবার দেখা যায় যে রাজা বা রাণী নানা লোকের কাছে ক্রমাগত তাঁর নিন্দা শুনে তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়েছেন। এই রাণীই প্রথমে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে বিষয় দিতে চান নি কিন্তু যখন দেওয়া হ'ল তখন পাঁচ হাজার টাকার (সিকিউরিটি) নিজে থেকেই দিলেন। হয়েছিল কি—ঠাকুর্দা লিখছেন—"রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার বাটি আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে কহিলেন যে 'আপনি নাকি জামিনির জন্য চিন্তিত হইয়াছেন! আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না আমাদের জমিদারি আপনার জামিনিতে আবদ্ধ রাখিব।"...এমনি তাঁর সুনাম ছিল।

কিন্তু "পরদিবস মহারাণী আমাকে ডাকিয়া কহিলেন: 'আমি থাকিতে আপনার জামিন অন্যলোক হইবেন ইহা আমার সহ্য হইবে না।' এই কথা বলিয়া পঞ্চসহস্র টাকার গভর্ণমেণ্ট নোট আমার হস্তে দিলেন। তাঁর এইরূপ কৃপায় ও স্নেহে আমার নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া গেল।"

কবির নেত্রদ্বয় কখনো কোনো সাহেবের ব্যবহারে "জলপূর্ণ" হয় নি—তবে অগ্নিগর্ভ হয়েছে বহুবার। কত দুঃখ যে তাঁকে পেতে হয়েছে চাকরিতে সে ব'লে বোঝানো যায় না। তাঁর "মন্দ্রে" "সমুদ্র" কবিতায় তিনি লিখেছেন এক জায়গায়:

হায় শুষ্ক অন্নচিন্তা যদি না থাকিত ও অন্তত
দিবার ছয়টি ঘণ্টা পর-দাস্য না করিতে হ'ত!

আর একটি কবিতায় বলেছেন কবি তাঁর শিশুপুত্রকে উদ্দেশ ক'রে :

কবি' দিবসের শুষ্ক কার্য হায় দাসত্বের ধুলি মুছিয়া অঙ্গে
ফিরি গৃহে বৎস উৎসুক আশায় করিব আলাপ তোমার সঙ্গে।

অমনি ফিরে এলেন কর্মশীল মানুষটি কর্তব্যের বিদেশ থেকে প্রেমের স্বদেশে। তখন কী হবে ? না,

বর্ষায় চড়িবি বক্ষোপরি, ফিরে চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে।
বসন্তে গাহিবি মলয়-সমীরে, শরতে হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে।
উচ্চারিবি ধীরে অমিয় সম্ভার, সম্বোধনে মিষ্ট বচন খণ্ডে।
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার, দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।
ভাঙিবি চুরিবি পাত্রদ্রব্য সব, দংশিবি নাসিকা, মারিবি পৃষ্ঠে।
মমুব মস্তিষ্কে নিত্য অভিনব প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর তারা দিবে তোরে এনে ক্ষেত্রে,
অমনি ভৎর্সিবি ভৎর্সনা কঠোর ছল ছল দুটি সজল নেত্রে।
অমনি ভুলিযা সব উপদ্রব নাহি কবি' আর কোনো প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ গদ্‌গদ বক্ষে তুলে লব, চুম্বনে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

এই উচ্ছ্বাসী স্নেহ তাঁর আরো উজিয়ে উঠত যখন কোনো বন্ধু এসে আমার সুখ্যাতি করত। এখানে তাঁর হয়ত একটা দুঃখ মনে ছিল ব'লেই তার প্রতিক্রিয়ায় এমনটা ঘটত। আমার পাকা পাকা কথা অনেকেই পছন্দ করত না, যার জন্যে কবিকে অনেক কথাই শুনতে হ ত। তাই যদি কদাচ আমার কোনো সমজদার পেতেন —আমার গানেরই হোক, কি স্মৃতিশক্তিরই হোক—অমনি তিনি বিজ্ঞাপন দিতেন আমার আরো সব কাতিকলাপের। (এটা ভালো করতেন বলছি না। তবে বলেছি আমি তাঁর ওকালতি করতে কলম ধরি নি, তাঁর ছবি আঁকাই আমার উদ্দেশ্য) বলতেন: 'ওকে কেউ ঠকাও দেখি মহাভারত রামাযণ পুরাণ টুরাণ নিয়ে। স্যমন্তক মণি কত হাত ঘুরেছিল, দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলের নাম কি ছিল, বিরাটসভায় ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের কী কী কাজ ছিল, জয় বিজয় কোন্ পাপে হিরণাক্ষ হিরণ্যকশিপু হ'ল, কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণবধের অধ্যায়ে কোথায় অনৈক্য, মধুসূদনের ইন্দ্রজিৎ বধের সঙ্গে রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ বধের বিবরণ কোথায় মেলে নি, আরো নানা প্রশ্ন—সাহিত্যিক, পৌরাণিক আকাডেমিক—কী নয় ?

আমি বাহাদুরি অর্জন করবার জন্যে আরো খুব যত্ন করে পড়তাম রাজকৃষ্ণ রায়ের "ভারতকোষ"। এটা ছিল হিন্দু মিথলজির একটি বই। বড় চমৎকার বই। দুঃখের

বিষয় এটি আজকাল আর পাওয়া যায় না। এ বইটিতে নানা নাম, দেশ, উপাধি ইত্যাদি নিয়ে বহুখণ্ড ও বর্ণনা থাকত। এক কথায়, পৌরাণিক অভিধান আর কি। এ বইটির একটি নবসংস্করণ আপনারা যদি উদ্যোগী হ'য়ে প্রকাশ করেন তো খুব ভালো হয়। বইটি সব শুদ্ধ ৫০০।৬০০ পাতার বেশি হবে না।

এই সব কূট প্রশ্নে আমি আরো পাকা হ'য়ে উঠছিলাম আমার দ্বিতীয় বাল্যগুরু গিরিশ মেশোর উৎসাহে তথা সহযোগিতায়। আমার পুরাণ-ইতিহাস পড়ার তিনি একজন ছিলেন সাথী ও সতীর্থ। তাই তাঁতে আমাতে প্রতিযোগিতা চলত। এখানে একটু থেমে তাঁর কথা বলতে হবে একটু বড় করেই, দুটি কারণে: (১) তাঁর মতন মানুষ সর্ব দেশে সর্বকালেই অতি বিরল, (২) তিনি ছিলেন কবির শুধু ভায়রা-ভাই না—ছোট ভাই বন্ধু ও শিষ্য একাধারে। তাছাড়া তাঁর কাছে কবির চরিত্র-মহত্ত্বের নানা দিকের কথা শুনতে শুনতে কবিকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে চেনা আমার পক্ষে সহজতর হয়েছিল—এও একটা কারণ)

না। আরো একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে এই যে তিনি ছিলেন একজন মানুষের মতন মানুষ। আমেরিকায় Reader's Digest ব'লে একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা হয়ত দেখে থাকবেন। তাতে নানা লেখককেই ওরা লিখতে বলে এক একটা স্মৃতিকথা: "The Most Unforgettable Character I Have Met" এ-ধরণের স্মৃতিকথা লিখতে অনুরুদ্ধ হ'লে আমি নির্বাচন করতাম, কবির পরেই গিরিশ মেশোকে।

পাঁচ ফুট পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি লম্বা মানুষটি। অতি বলিষ্ঠ। দারুণ কষ্টসহিষ্ণু, যাকে বলে hardy: সুগঠিত মুখাবয়ব কিন্তু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আর তেমনি কৃষ্ণ কেশ ও দাড়ি। কবি তাঁকে দেখেই লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত হাসির গানটি, যেটি তিনি মেশোর সামনেই গাইতেন অঙ্গভঙ্গি ক'রে খাম্বাজ টপ্পার চলতি তান দিয়ে:

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ, অকস্মার ধাড়ি
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ
(তেমনি ঐ) কালো মুখে কালো দাড়ি।
যেমনি দেহখানি স্থূল
বুদ্ধি তারই সমতুল
(আবার) যেমনি বুদ্ধি তেম্‌নি বিদ্যে
(যেমন) গরু টানে গরুর গাড়ি।

কবির এ গানটি গাওয়ার সময়ে আজো মনে পড়ে মেশোর সে উদার হাঃ হাঃ হাঃ

অট্টহাস্য। তাঁকে মাসিমা নাম দিয়েছিলেন "কালোশিব"। মাসিমা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী—তন্বী। দাদামশায়ের দশ মেয়ের মধ্যে মা ও মাসিমা ছিলেন ডাকসাইটে রূপসী। এহেন সুন্দরীর বর হল কিনা মিশকালো! বোধ হয় তাইতেই পতিব্রতা মাসিমা রাগ করে স্বামীকে উপাধি দিয়েছিলেন "কালোশিব"।

আমরা কিন্তু বলতাম সদাশিব। আজ বয়স প্রায় পঞ্চাশ হ'তে চল্ল বহু দেশ দেখেছি, বহু মানুষের সঙ্গেই এসেছি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ইংরাজ ফরাসী রুষ চেক ইতালিয়ান হাঙ্গেরিয়ান সুইড আরো কত বিদেশীর সঙ্গেই আলাপ হ'ল, বন্ধুও পেয়েছি কম নয়। ভারতবর্ষেও উত্তর দক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সর্বত্রই গিয়েছি—আমার মতন ভ্রাম্যমান্ জগতে আরো থাকলেও যে বেশি নেই এ নিশ্চিত। কিন্তু এত দেশ দেখে, এত বেড়িয়ে, এত মিশেও গিরিশ মেশোর অপরূপ স্মৃতিটি আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বলতায় আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়েই বিরাজ করছে। এত পরিচয়ের পরেও বলতে পারি যে, কবির পরে, তিনিই ছিলেন আমার কাছে "সবচেয়ে অবিস্মরণীয় চরিত্র।"

অদ্ভুত ছিল যে তাঁর চরিত্রবল, তার চেয়েও আশ্চর্য ঔদার্য! পড়াশুনো তিনি বেশি করেন নি। মাত্র এণ্ট্রেন্স পাশ। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তি ছিল—সচ্ছল অবস্থা। হ্যারিসন রোডে দোতলা বাড়ির একতলায় তাঁর পিতৃদেবের ঔষধের দোকান হিমসাগর তৈল দন্তমঞ্জন ইত্যাদি। উপরের তলায় মেশো, মাসিমা তাঁদের দুই মেয়ে শান্তি ও সুধা। শান্তি আমার চেয়ে এক বৎসরের ছোট, শান্তি সুধার চেয়ে পাঁচ ছয় বছরের বড়। এর অনেক পরে যে কল্যাণী—ফুটফুটে মেয়ে। তিন বোনের মাত্র সেই আজ বেঁচে। বম্বেতে গত বৎসর তার সঙ্গে দেখা হ'ল, কত গল্পই যে করা গেল তার সঙ্গে মেশোর সম্বন্ধে।

মেশো ছিলেন প্রকৃতিতে ও শিক্ষাদীক্ষায় আধা ব্রাহ্ম। সগোত্রে মাসিমার সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর রেজিস্ট্রি করে। চলতি ভাষায় একেই বলে ব্রাহ্ম বিবাহ। ব্রাহ্ম বন্ধু-বান্ধবী ছিল তাঁর অগস্তি। শিল্পী নয় কবি নয় অথচ অগুন্তি বন্ধু—এ আমি দেখি নি কখনো। তাঁর বাড়িতে অনেক সময়ে ভোরবেলা থেকেই অতিথি আসত—রাত বারটা একটার সময় মেশো শুতেন। মস্ত দুটি ঘরেই চলত গানের মজলিশ, কথার কল্লোল, হাসির হর্রা। অতিথিরা অনেকে রাতেও থাকতেন—গড়াগড় ঢালা ফরাসে শুয়ে।

তাঁকে একটি মিথ্যা কথা বলতে কেউ কখনো শোনে নি। ক্যারম খেলছি, তিনি ছিলেন ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন "ঐটে পকেটে ফেলতে পারলে দশটাকা।" বললেন মেশো। যেই বলা—ওমা, অমনি কি টুক্ ক'রে ঘুঁটিটা প'ড়ে গেল পকেটে! হঠাৎই

প'ড়ে গেল, পড়ার কথা নয়। তৎক্ষণাৎ মেশো দশ টাকার একটি নোট গুঁজে দিলেন হাতে। " আমি যদি নিতে রাজী না হতাম শুনতেন না। "নেবে না কি? বাজির টাকা না?—চপ খেয়ো। নিতেই হবে। বা রে বা! আমি কি শেষটায় নরকে যাবো? মেশোকে নরকে পাঠাবে? বেশ ছেলে যাহোক।"

আবালবৃদ্ধবনিতা ছিল তার বন্ধু। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য ছিল তাঁর বান্ধবী-বৎসলতা। রবীন্দ্রনাথ আমাকে "বান্ধবীবৎসল" উপাধি দিয়েছেন, তীর্থংকরে দেখে থাকবেন। কিন্তু তাঁর বান্ধবীবৎসলতা যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন "born great" আমাকে বড় জোর বলা যায় ধরে বেঁধে great (some have greatness thrust upon them).

মেয়েরা তাঁর কাছে এসে সহজেই বলত সব মনের কথা খুলে। কত পরিবারে যে তাঁর জন্যে দুয়ার খোলা ছিল সে কী বলব! শুধু ব্রাহ্ম পরিবারে নয়—যেমন ৺হেরম্ব মৈত্র, ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, বিজয় মজুমদার, ৺নীলরতন সরকার, ৺সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রভৃতি—হিন্দু পরিবারের অনেক কুলবধূও তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করত যেন আপন ভাই, মামা বা কাকা। কখনো এতটুকু কলুষ ছোঁয় নি তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সত্ত্বেও। 'কাজলের ঘরে নিরন্তর থাকলে একটু আধটু কালি লাগবেই' পরমহংসদেবের এ উপমাটি খাটে শতকরা নিরানব্বই জনের সম্বন্ধে। কিন্তু বাকি একজন সব নিয়মকানুনকেই যান ডিঙিয়ে—চলতি অভিজ্ঞতার বার যাঁরা তাঁরাই না ব্যতিক্রম—অলোক-সামান্য। মেশো ছিলেন—পথ চলতে ঘাসের ফুল নয়—সহস্রদল পদ্ম। প্রতি সখিত্বেরই হাসি অশ্রু তাঁর নির্মল বলিষ্ঠ পুরুষ-চরিত্রের পাপড়িতে শুভ্র শিশিরের মত টলমল করত। বাড়ত তাতে শিশিরেরও শোভা, পাপড়িরও অথচ দেখতাম এক নতুন জিনিষ। সেটা শোভার চেয়েও বড়—তার নাম অসাধ্যসাধন: সংসারে নারীসঙ্গের মধ্যে থেকেও নির্লিপ্তি।

উদাসী মানুষ অথচ সবার মাঝেই আছেন। শিশুদের সঙ্গে খেলার সাথী। (কতরকম খেলা যে রোজ তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে নিত্য উদ্ভাবিত হ'ত!) মেয়েদের গল্পের সাথী (শুধু গল্পের না, তারা বলত তাঁকে এমন সব কথা যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে নি কোনোদিন)! কিশোরের উৎসাহের সাথী (কত খবর যে তিনি জোগাতেন তাদের জন্যে—তাদের শিক্ষার ও আদর্শের, স্বপ্নের খোরাক জোটাতে)! যুবকদের তর্কের সাথী! (তাঁর মতন তার্কিক কটাই বা দেখেছি জীবনে?) প্রৌঢ়দের আলাপের সাথী! (কত শ্মশ্রুল গম্ভীর মুখই যে তাঁর ওখানে দেখতাম সদ সর্বদা—অথচ তাদের গম্ভীর মুখেও দন্তরুচি কৌমুদী বিকিরিত হ'ত তাঁর হাসিরা

গল্পালাপে) সবশেষে বুদ্ধদের জ্ঞানের সাথী। (তাঁর মতন জ্ঞানী কটাই বা দেখেছি দুনিয়ায় ?)।

সেই সঙ্গে কী অভয়! সাইকেলে ক'রে মধুপুর, রাঁচি, কাশি, হিল্লি দিল্লি, মক্কা, মদিনা বেড়াতেন তিনি তাঁর একদল ভক্তদের নিয়ে। ফিরে আসতেন কখনো দু সপ্তাহ বাদে, কখনো কখনো বা তিন চার পাঁচ সপ্তাহও হ'ত। মাসিমা ভেবে অস্থির। "বুড়ো বয়সেও আক্কেল হবে না তো" বলতেন কখনো কখনো খুব মাথা ঝাঁকিয়ে, রাগ ক'রে। তিনি ছিলেন গড়পড়তা স্ত্রী—অসামান্য স্বামীর সঙ্গে এঁটে উঠবেন কী ক'রে। তাই মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে হ'ত বৈকি সময়ে সময়ে রীতিম'ত খিটিমিটি। কিন্তু মেশো বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাসিমাকে রাজি করাতেন। কেন রাজি করাতে হ'ত বলি।

তাঁর বড় মেয়ে শান্তির বয়স তখন চোদ্দ। মাসিমা বলতেন "সোমত্ত মেয়ে"। অতি বুদ্ধিমতী, গায়িকা। সেও ছিল একটা পার্শনালিটি। মেশো তাকে মিশতে দেবেন সবার সঙ্গেই অবাধে। "আচণ্ডাল প্রতিহতরয়োযস্তু প্রেমপ্রবাহঃ"—তাঁর প্রেম জাত মানত না। মুসলমান, বৈষ্ণব, হাড়ি, ডোম, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান, মুচি, মেথর সবার হাতেই তিনি জলগ্রহণ করতেন--মাসিমাকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে জলগ্রহণ করাতেন। এ-ও না হয় হ'ল। কিন্তু যেখানে সেখানে সোমত্ত মেয়ে যাবে সাইকেল চ'ড়ে--শুধু কলকাতার ভিড়ের রাস্তায় নয়—বাইরেও? মধুপুরে কুয়োয় ঘটি প'ড়ে গেলে কোমরে দড়ি বেঁধে মেশো শান্তিকে কুয়োয় নামাবেন ঘটি তুলতে? শ্মশানে ঘুরতে যাবে অন্ধকার রাতে? মাসিমা সময়ে সময়ে কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিতেন। কিন্তু মেশো নির্বিকার পুরুষ, বলতেন আবৃত্তির সুরে "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।"

কিন্তু তাই ব'লে কি প্রকৃতি তাঁর কঠোর ছিল? অসম্ভব, তাঁর বাইরেটা যেমন কঠিন "কালোবরণ" ভিতরটা ছিল তেমনি কোমল শুভ্রকান্তি। মনে আছে তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। একদিন মাসিমা শান্তিকে আদর করছেন। আমি তো ছয় বৎসর বয়স থেকেই মাতৃহারা। মেশো মাসিমাকে বললেন: "মাতৃহারা শিশুর সামনে কখনো নিজের সন্তানকে আদর কোরো না।"

নিজের মেয়েদের তিনি ভালোবাসতেন গভীরভাবে-স্ত্রীকেও বাসতেন। কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ হ'ত না সে স্নেহ। প্রকাশ হ'ত তাঁর কাজে বিশেষ অক্লান্ত সেবায়। সত্যিই তিনি স্ত্রীর ও মেয়েদের শুধু আদর যত্ন না, করতেন—"সেবা"। অথচ সেবা কারুর নিতেন না। আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বভাববলীয়ান্ "মরদ্"—(তাঁর একটি প্রিয় কথা ছিল--"মরদ্‌কি বাত হাতি কি দাঁত"—যা করো করো মিথ্যা বোলো না

মস্ট্‌ —ব'খে যাও—মাতাল হও, জাহান্নমে যাও, সেও ভালো কিন্তু মিথ্যে কথা বোলো না—মরদ্‌ হ'য়ে।' • •

বাল্যকালে আমাকে তিনি নিয়ে যেতেন শ্রীহরিমোহন ঘোষালের কাছে। বলতেন কী তাঁর মনের জোর ছিল—সুকুমারী ব'লে একটি অভিনেত্রীকে বিবাহ করেছিলেন এই উদারচরিত ব্রাহ্ম। ঘোষাল মহাশয় আমাকে বোঝাবেনই পৌত্তলিকতা খারাপ। আমিও বুঝব না : কিছুতেই না, পরমহংসদেব বলেছেন মেশো হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন : "তর্কে নজির দেওয়া নেই।" তখন অগত্যা উদ্ধৃতি ছেড়ে ধরতাম যুক্তি : "মনস্থির করতে হ'লে একটা নিশানা চাই।" কবির মতন মেশোও ছিলেন আস্তিক নাস্তিকের মাঝামাঝি কিন্তু এ কথায় সায় দিতেন। বটেই তো। নিরাকার আবার কি? দূর্‌। ঘোষাল মহাশয়ও মহাতার্কিক, উঠতেন উদ্দীপ্ত হ'য়ে, চলত তাঁতে আমাতে ফের তুমুল তর্ক - ভাবুন বন্ধুবর, একবার ভাবুন—এগার বার বছরের ছেলের সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট বছরের আচার্যের তর্ক পৌত্তলিকতা নিয়ে! তর্কান্তে মেশো পিঠ্‌ চাপড়ে বলতেন : "সাবাস্‌ জোয়ান!"

ঘোষাল মশায়ও হো হো ক'রে হেসে উঠতেন, "সত্যি গিরিশবাবু। এইটুকু ছেলে এমন চমৎকার তর্ক করে! কার কাছে তর্ক করা শিখলে খোকা?"

আমি (গম্ভীর হ'য়ে) : খোকা বলতে নেই। যারা যুক্তিতে এঁটে উঠতে পারে না তারাই বয়সের দোহাই পাড়ে।

কথাটা মেশোর যদিও আমার ব'লে চালাতে হ'ল প্রাণের দায়ে। অবশ্য তাঁর কথা ধার করতে আমার গৌরবই বোধ হ'ত কারণ, বলেছি, আমার বাল্যজীবনের ছিল দুটি সর্বোত্তম আদর্শ—কবি ও মেশো। এদের মতন মানুষের কাছে ঋণ-বৃদ্ধিতেই তো আনন্দ-বৃদ্ধি।

এ আদর্শ চরিত্রের পরিণতি হয় আরও অভাবনীয় বেদনার মধ্যে দিয়ে। সে কাহিনী বলবার মত। যদিও সে-ইতিহাসের কাল কবির দেহাবসানের পর—তবুও তাঁর চরিত্রটির ছবি যখন আঁকতে বসেছি, তখন সংক্ষেপে বলতেই হবে।

মাসিমা নানা কারণে রুগ্ন হ'য়ে পড়েন। প্রথমে কাঁধে শোথ হ'য়ে বহুদিন ভোগেন। তখন কবি বেঁচে। মেশো ও মাসিমাকে তিনি আমাদের সুরধামে এনে রেখেছিলেন ভালো ক'রে চিকিৎসা করতে। তখন দেখতাম মেশোই মাসিমার শোথ ধুয়ে দিতেন রোজ। উঃ সে লম্বা নালির মতন শোথ, আমার গার মধ্যে কেমন করত। কিন্তু মেশোর ঘৃণা ছিল না এতটুকু—না পুঁয সাফ করতে, না ময়লা।

শোথ সারার পরে মাসিমার হ'ল আরো সাংঘাতিক ব্যাধি : গোড়ালিতে—দুষ্টক্ষত

gangrene সে পচা দুর্গন্ধে অনেক সময় মাসিমার কাছে বসাও দায় হ'ত—বিশেষ যখন দূষিত পুঁষ রক্ত গল্‌গল্‌ ক'রে বেরুত। কিন্তু মেশো স্থিতপ্রজ্ঞ, নির্বিকার। সাইকুল, হৈ হৈ, বনভোজন সব ছেড়ে মেশো স্ত্রীর সেবায় লেগে গেলেন। রান্না থেকে সুরু ক'রে বেড্‌ প্যান দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কায করতেন তিনি আর শান্তি। কারণ সুধা তখন খুবই ছোট। অথচ এত সেবার ক্লান্তির মধ্যেও মেশো মেয়েদের সুন্দর পড়াতেন, বেহালা শেখাতেন, মেলামেশারূপ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতেন। সংসারের দুরূহ কর্তব্য করতেন একাই - কারুর সাহায্য চাইতে তাঁকে কেউ কখনো দেখে নি। তাঁর অনেক যুবক ভক্ত ও তরুণী শিষ্যারা নিজে থেকে এসে তাঁর ভার লাঘব করত সময়ে সময়ে, কিন্তু সে আর কতটুকু করা? মাসিমা যে প্রায় সাত আট বৎসর ভুগে মারা যান শেষটায় যক্ষ্মা ধরল। তবু মেশো নার্স রাখেন নি—নিজেই সেবা করতেন অক্লান্তভাবে। ডাক্তারও ডাকতে চাইতেন না কারণ তাঁর মত ছিল: নিজের শরীরকে বুঝতে চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য, বুদ্ধিমান মানুষ ডাক্তারের কথায় চলবে কী? আমার শরীর আমি যেমন বুঝব ডাক্তার তেমন বুঝবে কেমন ক'রে? তিনি আরো বলতেন: যত স্বাভাবিক ভাবে থাকবে তত শরীর ভালো থাকবে। বালিশ মাথায় দিতেন না মাথা উঁচু ক'রে শোওয়া অস্বাভাবিক ব'লে। ওষুধ খাওয়াও স্বাভাবিক নয় অতএব ওষুধ খাব না। মৃত্যু পর্যন্ত খান নি তিনি একটি ফোঁটাও ওষুধ। অথচ মারা গেলেন দারু যক্ষ্মা রোগে। তখন আমি জার্মনিতে।

তাঁর চরিত্রের এমনি একটা সহজ জোরালো ভঙ্গি ছিল যে তাঁর এধরণের মতামত আমাদের মধ্যে অনেককেই পেয়ে বসত। তাই আমিও বালিশ মাথায় না দিয়ে শুতাম। ওষুধ না খাওয়ার পণ নিতে হ'ত না কারণ আমার অসুখই করত না। কিন্তু তবু একটু আধটু অসুখ করলেও ওষুধ খেতাম না। তিনি নিজেকে সকলের সমান বলতেন বটে কিন্তু আমরা জানতাম তিনি আমাদের গুরু। আর এমন গুরু - পায় কজন? বলতাম বেশি আমি আর শান্তি।

শান্তি ছিল তাঁর প্রধানা শিষ্যা। বালিশ মাথায় দিত না তো বটেই—ওষুধও খেত না। রাণীক্ষেতে যখন মারা যায় বছর দশ বারো আগে তখন আমাকে শেষ দেখা দেখতে চেয়ে লিখেছিল একটি চিঠি। তাতে লিখেছিল মৃত্যুশয্যায়ও সে ওষুধ খায় নি। মেশো মৃত্যুশয্যায়ও রোগযন্ত্রণায় আর্তনাদ করেন নি, শুনলাম শেষ পর্যন্ত পাঞ্জা লড়েছেন ও ওষুধ খান নি। কিন্তু মাসিমার কথাটা সেরে নিই।

বলেছি মাসিমা ছিলেন মার পরের বোন। দুই বোনের খুব ভাব ছিল। মাসিমার কাছে শুনতাম প্রায়ই: "দিদিমণির কী মনই ছিল রে।—অমন মন আজকাল দেখা

যায় না। আমার ছমাসের ছেলে ক্ষিতীশ যখন মারা যায়"—(ক্ষিতীশ ছিল মাসিমার একটি মাত্র ছেলে)—"তখন জানিস, দিদিমণি এসে তোকে আমার কোলে দিয়ে চ'লে গেল! বলল: 'কাঁদিসনে সুশি। ছেলে তোর ম'রে গেছে কে বলল? এ-ই তো তোর ছেলে।' বলতে বলতে তাঁর চোখে ধারা ব'য়ে যেত। "বুঝলি বাবা—যে তোকে একদিন না দেখলে দিদিমণি চোখে অন্ধকার দেখত সেই তোকে কিনা সে আমার কোলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল আমার শোক কাটাতে? তোকে আমি অনেক দিন কাছে রেখেছিলাম সে সময়ে—তাই তো তোর ওপর আরো মায়া প'ড়ে গেছে বাবা! তুই যে আমার সত্যিই ছেলে বাবা—আমার বুকের দুধ খাবার মানুষটি যখন ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল, তখন তুই-ই যে এলি তার বদলি। তাই তো অমন শোক অত সহজে সামলাতে পেরেছিলাম।"

এই জন্যেই আরো শান্তি সুধা ছিল আমার নেওটো। তারা কখনো আমাকে নাম ধ'রে দাদা ডাকেনি—শুধু "দাদা" ডাকত—মায়ার মতন।

মার কথা আরো শুনতাম মাসিমার কাছ থেকে। কারণ অমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কে বলবে "দিদিমণির" কথা? মাসিমা সময়ে সময়ে খুবই দুঃখ পেতেন কবির চাকর বাকরের চুরির বহর দেখে—বলতেন কবিকে: "দ্বিজদা, করছেন কি? দুটো ছেলে মেয়ে রয়েছে যে—এমন করলে—" কবি কথা কানে তুলতেন না গাইতেন ঐ "সিন্দুক ভরা টাকা"। তখন মাসিমা আমাকে ডেকে বলতেন চোখের জল ফেলে: "কী যে কষ্ট হয় বাবা। এমন সোনার সংসারটা কী হ'য়ে গেল। পাঁচ ভূতে লুটে-পুটে খেল গা। দিদিমণি আজ থাকলে—"

আমি: কী হ'ত মাসিমা?

মাসিমা: সে ছিল একটা মানুষের মতন মানুষ। অমন মাকে পেয়েও পেলি না ভাবতেও চোখ ফেটে জল আসে বাবা! কী ধৈর্য, কী বিবেচনা, কী সমান দৃষ্টি সবার প্রতি! সুগৃহিণী তো বটেই। দ্বিজদা টাকা যা জমিয়েছেন সেই সময়ে—সেই অন্নপূর্ণার গুণে। নৈলে তোদের কী যে হ'ত ভাবি।

আমি (অবজ্ঞাভরে) হুঁঃ। টাকা জমানো না কি আবার একটা কীর্তি।

মাসিমা (রেগে): কী যে বলিস যা তা। গৃহিণীপনার কী জানিস তুই। বাজে খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমানো কত শক্ত তার কী খবর রাখিস শুনি। তোর মাথাটাও খেলেন তো দ্বিজদাই। দিদিমণি আজ থাকলে কি আর তোকে এমন ক'রে ব'য়ে যেতে দিত।

আমি (হেসে): আহা বলো না মাসিমা কী হ'ত (ব'লেই গলা জড়িয়ে ধরতাম।)

মাসিমা (আমাকে বুকে টেনে) : ওরে, দিদিমণি সে ছিল সত্যিই দিদিমণি। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী যাকে বলে—

আমি (হেসে) : লেখাপড়া না জানা সরস্বতী !

মাসিমা (রেগে) : ফে—র ? তোদের হয়েছে মাথা গরম দুটো বই প'ড়েই। লেখাপড়ার নাম যে বিদ্যে এ ভুলেও মনে করিস নি। দিদিমণির কাছে বিদ্বান্‌রা আসত উপদেশ নিতে জানিস ?

আমি : কিসের ? গৃহি'পনার ?

মাসিমা : যা যাঃ—তোর সঙ্গে আবার নাকি মানুষ কথা কয়—ডেঁপো ছেলে কোথাকার ! গৃহিণীপনার সম্বন্ধেও মুখ নেড়ে কথা। জানিস, দিদিমণি কী ক'রে সংসার চালাতেন তোর বাবাকে বাঁচিয়ে ? পাছে তাঁর এতটুকু অসুবিধে হয় এই ভয়ে একবার তিনমাস না চার মাসের মাইনে না পেয়েও সংসার চালিয়ে ছিলেন। শেষটায় দ্বিজদার উপরওয়ালা ডেকে বলে তাঁকে—কী ব্যাপার, চার মাসের মাইনে দিতে আমাদের ভুল হ'য়ে গেল ব'লে তুমিও চাইলে না ?

আমি (কৌতূহলী) : বটে ? তারপর ?

মাসিমা (হেসে) : সে শুনে আমরা কত হাসব বল ? সত্যিই তো—দ্বিজদা বললেন মাথা চুলকে—ভুল হ'যে গিয়েছিল। সে-ও ছিল তেম্‌নি মানুষ ! চাকরি করতে ভুল হয় না—মাইনে চাইতেই ভুল ! সে সময়ে বুঝি তিনি সীতা লিখছিলেন। তাই ডাল-ভাতের খোরাক পর্যন্ত ভুল ! সীতা লেখা আর দিদিমণিকে প'ড়ে শোনানোই ছিল তখন ঐ দুটি মানুষের খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু দ্বিজদার কাছেই শুনেছি উপরওয়ালা সাহেব বলল : 'চার মাস মাইনে নিলে না—তোমরা কি জমিদার ?' তাতে তোর বাবা বললেন : জমিদারির মধ্যে আছে একটা চালা ঘর ভিটেয় কৃষ্ণনগরে।—'তবে ? সংসার চলল কী ক'রে ?'—দ্বিজদা মাথা চুলকে বললেন : 'তা তো বলতে পারিনে সার আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস না ক'রে, বুঝলি ? পাছে তাঁর লেখার ব্যাঘাত হয় ভেবে চার মাসের মাইনে না পেয়েও লক্ষ্মী প্রতিমা চালিয়ে দিলেন সংসারটা— আর তুই বলিস কিনা গৃহিণীপনা ফেল্‌না ! অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলিস নি— পাপ হয়।

কথাটা আমি বললাম যতটা পারি মাসিমারই ভঙ্গিতে। মনে পড়ে, এসব কথা বলতে বলতে মাসিমার চোখ জলে ভ'রে আসত, বলতেন : তোর মেশো সীতা প'ড়ে

প'ড়ে শোনান তোদের আর তোরা হাঁ ক'রে শুনিস। কিন্তু জিজ্ঞেস করিস তোর মেসোকে সীতার এই ছবি দ্বিজদা আঁকলেন কা'কে দেখে ?

বলতে বলতে চোখ মুছতেন "সে সতীলক্ষ্মী আজ থাকলে কি আর দ্বিজদা এমন সন্নিসী হ'য়ে যেতেন রে ? না পাঁচভূতে এসে তাঁর রোজগারের টাকাটা লুটে পুটে খেত।"

মাসিমা মাঝে মাঝে জোর ক'রে গিয়ে থাকতেন আমাদের ওখানে—সংসারের খরচ বাঁচাতে ও একটু যত্ন করতে। কিন্তু তাঁর ওখানেও তো সামলাতে হ'ত। গিরিশ শর্মা ছিল যে আরো "উড়ন চ'ড়ে" —উভয় সঙ্কটে কোন্ দিক সাম্লান বেচারি মাসিমা ?

একথা এত ক'রে বললাম মার ছবিটা একটু ফোটাতে। আমার তাঁকে খুব কমই মনে পড়ে। তবে মনে পড়ে একটা ছবি। কবির একদিন খুব অসুখ। বমি করছেন। মা কপালে হাত দিয়ে ব'সে আছেন। উৎকণ্ঠা ও স্নেহের মিলনে সে অপরূপ সুন্দর মুখখানি যেন দশগুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরে যখন কবির লেখা পড়তাম মাকে উদ্দেশ ক'রে—

চাই নি আমি কখনো তো কারুর কাছে কিছু
　　দেয় নি কিছু কেহ,
কেবল তুমি, প্রিয়তমে দিয়েছিলে গভীর
　　অযাচিত স্নেহ।
তোমায় আমায় বিবাদ হয় নি—এমন মিথ্যা কথা
　　কেমন ক'রে কই ?
কখনো বা আমার বিবাদ কখনো বা তোমার
　　হবে অবশ্যই।
তুমি মানুষ, আমি মানুষ—গড়া দোষে গুণে
　　একটু বেশি কম,
তদুপরি অনেক সময় বুঝতে পরস্পরে
　　হ'তে পারে ভ্রম।
তবু তুমি আমায় ভালো বেসেছিলে জানি
　　ভ'রে তোমার বুক,—
হেথায় অনেক স্বামীর ভাগ্যে ঘটে না সর্বদা
　　যে-সৌভাগ্যটুক্।

মাসিমাকে গিয়ে চেপে ধরতাম : "মাসিমা! বাবা-মারও তাহু'লে ঝগড়া হ'ত? কেন?

মাসিমা (একগাল হেসে) : পাগল ছেলে! বিয়ে যখন করবি তখন পাবি এর জবাব। যাঃ—এসব কথা জিজ্ঞেস করে?

আমি (নাছোড়বন্দ, মাসিমার গলা জড়িয়ে ধ'রে) : বলো না—লক্ষ্মীটি মাসিমা!

মাসিমা (চোখ কপালে তুলে) : অ্যাঁ! কী ছেলেরে তুই? বাপ মার ঝগড়ার খবর চাস খুটিয়ে? (আমার আদরে আবদারে অতিষ্ঠ হ'য়ে) : আচ্ছা আচ্ছা—একটু বলি তবে শোন্ (আমি জানতাম মাসিমা বলতে খুবই উৎসুক যা একটু পীড়াপীড়ির অপেক্ষা)—তোর ঐ বাবাটি দেখতেই উদাসী, কিন্তু আসলে বড় সোজা মানুষ নন—বুঝলি? কথায় কথায় বড় গলা ক'রে বলেন—নিজে শিবঠাকুরটি—কারুর ওপর এতটুকু জোর করেন না। কিন্তু জলের চাপ জানে যারা ডুবসাঁতার কাটে। যেন সে-আলৃগোছে জোর করার চাপটা জানতেন দিদিমণি। এমন কতবার হয়েছে দ্বিজদা দিদিমণির মধ্যে কিছু নিয়ে বাধ্‌ল, অম্‌নি দ্বিজদা করলেন কি? বললেন দিদিমণিকে : 'তোমার যা প্রাণ চায় কোরো কেবল এখন থেকে কয়েকদিন বৈঠকখানা ঘরেই আমার বিছানা হয় যেন।' ব্যাস্ আর কথাটি না—দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে চ'লে গেলেন বৈঠকখানা ঘরে। দুদিন তিনদিন চারদিন যায়—শেষটায় দিদিমণিই এসে সন্ধি করতেন। বলতেন দ্বিজদাকে : 'সব ঝগড়াতে কি সন্ধি করতে হবে শেষটায় আমাকেই এগিয়ে এসে?—আর ঐ এক ব্রহ্মাস্ত্রে!' দ্বিজদা অমনি পিট পিট বলতেন : 'তোমাদের চোখের জলের ব্রহ্মাস্ত্রকে কি অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে ঠেকাবার পথ রেখেছ?' ব'লেই সে কী প্রাণখোলা হাসি। দিদিমণিকেও হেসে ফেলতে হ'ত।

সপ্তম উল্লাস

কিন্তু এবার মাসিমার নিজের কথা একটু বলি।

আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন আমার দাদামশায় (ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার) ছিলেন যাকে সাহেবপুরাণে বলে "স্বনির্মিত" মানুষ। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে তিনি হয়েছিলেন নিযুতপতি। তাঁর মুখেই শুনেছি, যৌবনে তাঁকে হেদোর বেঞ্চিতে রাত কাটাতে হয়েছে। এই মানুষ পরজীবনে বহু লোককে আশ্রয় দান করেছিলেন ও বহু পোষ্য পুষেছিলেন। তাদের মধ্যে অবশ্য সব আগে ছিল তাঁর দশ কন্যা ও তিন পুত্র। আমার মা ছিলেন সবার বড় সুরবালা। তারপর এই মাসিমা—সুশোভিনী। তাঁকে আমরা শুধু "মাসিমা" ডাকতাম শুধু তাঁর ওখানে আমাদের দ্বিতীয় স্বালয় (home) ছিল ব'লে নয়—মেশো আমাদের দ্বিতীয় পিতা ছিলেন ব'লেও বটে।

কিন্তু কথাটা যেন ঠিক শোনাল না—মাসিমার মাতৃত্বকে যেন একটু গড়পড়তা মাসিয়ানা ব'লে ডিশমিশ করা হ'ল। এ কৃতঘ্নতা। কারণ তাঁর মাতৃত্ব সত্যিই মাসিয়ানা জাতের ছিল না: আমার কাছে তিনি ছিলেন প্রায় যমজ মা। তাঁর বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিলাম একথা ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে কি রকম একটা টান বোধ করতাম তাঁর প্রতি। শুধু এইজন্যেও নয় অবশ্য—তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যেও বটে।

একথায় হয়ত আপনারা রাগ করলেন। জনশ্রুতি বলে হিন্দু সন্তান মা মাসির রূপ দেখে না। কথাটা ধার্মিক হ'তে পারে কিন্তু সত্য কি? বড় জোর এইটুকু মানতে পারি যে এমন সুছেলে আছে যাদের কাছে মা-মাসির রূপ একটা অবান্তর প'ড়ে পাওয়া মূল্যহীন বস্তু। কিন্তু এ মানতে বাধে যে সব ছেলের চোখই একরকম। অন্তত আমার চোখ যে শৈশব থেকেই রূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল এ সবাইয়েরি চোখে পড়ত। তাছাড়া এ কথা স্বীকার করতে ভয়টা কিসের যে সুপুরুষ ও রূপবতীর আমি স্বভাব-ভক্ত প্রথম থেকেই—এখানে আমার কাছে মা, মাসি, মেশো, পিশে, ভাই, বোন নেই। আমি বার বার দেখেছি আমার আত্মীয় আত্মীয়াদের মধ্যে যাঁরা দেখতে বেশি ভালো তাঁদের আমি বেশি ভালোবাসতাম। মা-র রূপের কথা আজো মনে পড়ে। সে স্নিগ্ধ রূপশিখার স্মৃতি আজো অন্তরে আমার আলো হ'য়ে জলছে। আমার নয়টি মাসির মধ্যে আরও দুটি মাসি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন: ন-মাসিমা রাধারাণী ও সমবয়সী মাসিমা

সুষমা।' আজ সুদূরের দিকে চাইলে দেখতে পাই যে অন্য মাসিরা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করা সত্ত্বেও আমি মেজমাসিমার পরে এই দুই মাসিমাকেই সব চেয়ে ভালবাসতাম। ন-মাসিমাকে হয়ত একটু ভয়ও করতাম—কারণ তিনি স্নেহময়ী হ'লেও মেজমাসিমার মতন প্রশ্রয়দায়িনী ছিলেন না—রাগ হ'লে তাঁর শাসনে তথা দাপটে বাড়িতে কাকপক্ষী তিষ্ঠুতে পারত না। তবুও অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন ব'লে তাঁর আদর যত্ন স্নেহ আমার অন্য মাসিদের আদর যত্নের চেয়ে বেশি ভালো লাগত। যাক এ সব বাজে কথা। কথাটা তুললাম মেজ মাসিমাব রূপের 'পরে একটু জোর দিতে। অত রুগ্ন দেহ সত্ত্বেও কী অপরূপ মুখশ্রী ছিল যে তাঁব। আব কী মিষ্টি হাসি।

কিন্তু মেশোর সঙ্গে তাঁর বাধত প্রায়ই। কারণ, বলেছি, মাসিমা ছিলেন ধনিকন্যা—চাইতেন পিতার আনুকূল্য। বাপ মেয়ের জন্যে কববে এতে দোষের কী আছে! কিন্তু মোশো সইবেন শ্বশুরেব আনুকূল্য! ঈশ্! তিনি বিবাহ করার সময ভাবী শ্বশুরকে সাফ বলে দিযেছিলেন যে মেয়েকে যৌতুক দিতে চাইলে শ্বশুর লাভ আর তাঁর ভাগ্যে হবে না। তিনি বিবাহ করতে চেয়েছিলেন মেয়েকে—মেয়ের পিতৃমুদ্রাকে না, এ কথা মাসিমা আমাদের কাছে প্রাযই বলতেন। কথাটা ছিল কবির, কারণ কবিও মাকে বিবাহ করার সময়ে ভাবী শ্বশুরকে বলেছিলেন একথা। মাসিমা এই নিয়ে খুব গৌরব করতেন যে "দিদিমণির" পবে কেবল তাঁকেই ধনশালী পিতা শাঁখা শাড়ি দিয়ে পার করেছেন—আর সব বোনেবা বেশ মোটা যৌতুক নিয়ে তবে পতিগৃহে পাতিব্রত্যে পটু হযেছেন। মেশো তাঁব এ ধরনের ক্ষোভের কথায় রাগ করতেন; বলতেন: "অন্যে কে কী করছে তা ভেবে মনের বাজে খরচ বন্ধ না করলে নিজেকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার খরচ জুটবে কোত্থেকে!' মাসিমা কখনো কখনো চুপ ক'রে থাকতেন কিন্তু মাঝে মাঝেই ফের উঠতেন ঝংকার দিয়ে যখন দাদামহাশয তাঁকে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাইলে মেশো স্রেফ্ না ক'রে দিতেন। কিন্তু মেশো কানেও তুলতেন না হেসে বলতেন তাঁর অসামান্য জারকশক্তি হার মেনেছে শুধু ঐ এক জাযগায়—শ্বশুরের টাকা হজম করতে। এতে মাসিমা দুঃখ পেতেন। কারণ দাদামহাশয় খুবই চাইতেন আনুকূল্য করতে—মেয়েকে চেঞ্জে পাঠাতে, চিকিৎসায় খরচ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মেশো নারাজ, নিরুপায। মধুপুরে তাঁর একটি বাড়ি সব মেয়েদের জন্যে উইল ক'রে গিয়েছিলেন ব'লে কেবল সেখানে মাসিমা যেতে পারতেন। আর কোথাও না—কোনো এলাহি স্টাইলে থাকা তো অকল্পনীয়। "গরিবকে বিয়ে করেছ গরিবিয়ানা চালেই থাকতে হবে তোমাকে"—বলতেন মেশো মাসিমাকে। এতে পতিব্রতা মাসিমার গৌরব বোধ হ'ত বটে—তবু গরিবিয়ানা চালে থাকতে বড় মানুষের মেয়ের

একটু কষ্ট তো „অনিবার্য : তাই মাসিমাকে সময়ে সময়ে চোখের জল ফেলতে হত' বৈ কি। গৌরবের সুর উঁচু—মনপ্রাণ সে পর্দায় স্থায়ী হ'তে পারে এক নাটক নভেল, আর-এক বহু তপস্যায়।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তিনি স্বামীর অগাধ হৃদয়ের স্নেহ ও সেবা থেকে। এ নিয়ে তিনি সত্যিই গর্ব করতে পারতেন—এমন মহৎ নির্লোভ তেজস্বী মানুষটি যাঁকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিল—আর, কী একনিষ্ঠ ভালোবাসা সে!

এখানেও কবির সঙ্গে মেশোর মিল ছিল। আমরা এ যুগে একনিষ্ঠতার তেমন মর্যাদা দিই নে। কেন দিই নে তার নানা কারণ আছে—সে সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে অনেক গবেষণা করেছি জানেনই তো। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আজ যেন নতুন ক'রে বুঝতে পারি একনিষ্ঠতার মধ্যে একটা মহিমা আছেই। বহুবল্লভতার মধ্যে প্রতিভা নানা খোরাক পেতে পারে এ কথা অকুণ্ঠে মেনে নিয়েও তাই বলা যায় যে একনিষ্ঠতা খাঁটি হ'লে তার মধ্যে অন্তরাত্মার একটা গভীর তৃপ্তির আশ্রয় থাকে। ভগবৎপ্রেমের গোড়াকার কথা যে ঐকান্তিকতা, একনিষ্ঠতা তারই মানবিক সংস্করণ। কবির ও মেশোর একনিষ্ঠতার দৃশ্য সুদূরের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আজ দেখি তখন সম্ভ্রম আসে আরও এই জন্যে যে এ কীর্তি আমাদের মতন বহুমুখী স্বভাবের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ বলেছি মেশোর চরিত্রে এতটুকু কলঙ্ক কেউ দিতে পারে নি। অথচ নারীসঙ্গ তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। এইখানেই কবির সঙ্গে তাঁর একটু তফাৎ ছিল। কবি আমার মামিমা ও মাসিমাদের সঙ্গে ছাড়া আর কোনো মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে এগুতেন না। কখনো হয়ত মেশো আমাদের এখানে এসেই গেছেন রাঙা জ্যেঠাইমা ও নীলিমাদির কাছে। কবি "গিরিশ গিরিশ" ক'রে বার দুই ডেকেই আমার দিকে চেয়ে বলতেন : "ঐঃ যাঃ।—পারা গেল না তোর মেশোকে নিয়ে, মেয়েদের দলে ভিড়েছে ফের। যা—ডেকে আন্ ওকে অন্দর মহল থেকে—নিশ্চয় ও সেখানেই আসর জম্‌কাচ্ছে।"

এহেন বহুরমণীবান্ধব মেশো দিনের পর দিন মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও মাসিমার এতটুকু মনঃকষ্টের কারণ হন নি। পতিব্রতা স্ত্রীর ছিলেন তিনি পত্নীব্রত স্বামী—বাসর থেকে শশ্মান পর্যন্ত। এজন্যে স্বামীর প্রতি মাসিমার শ্রদ্ধার অবধি ছিল না—যদিও শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয়ও ছিল গাঢাকা দিয়ে। কারণ তিনি বুঝতেন মেশো প্রবৃত্তিতে ছিলেন অত্যন্ত অনাসক্ত নির্ভীক মানুষ। তাই দাম্পত্য কলহে মাসিমাকেই হার মানতে হত শেষটায়—বারবার। মেশো ছেড়ে দিয়েই তাঁকে আরো বেঁধেছিলেন।

এই ভাগ্যবন্ত দম্পতীর দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অবসান হয় মাসিমার গ্যাংরিণের তাড়সে। মেশোর মনে হয়ত একটু দুঃখ ছিল যে তিনি অর্থাভাবে ভালো ক'রে মাসিমার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাই জন্যেই হয়ত তিনি আপত্তি করেন নি যখন মাসিমা দাদামহাশয়ের ওষুধ খেতে চাইলেন। কিন্তু মাসিমা এতে উৎসাহ পেয়ে যদি বলতেন ওষুধ খেলে রোগ সারে তখন মেশো বলতেন যে সারতে পারে কিন্তু অস্বাভিক ভাবে রোগ সারিয়ে লাভ নেই—মানুষটা কুমোরের চাকের মতন একটা রোগের চাকা থেকে অন্য একটা রোগের চাকায় প'ড়ে ঘুরে মরে।

অনেক বুদ্ধিমান্ যুবক বা বুদ্ধিমতী তরুণী তাঁর এধরনের যুক্তিকে 'bankruptcy of reason' বললে তিনি টপ ক'রে বলতেন: আপনার বুদ্ধিতে ফকির হওয়াও ভালো কিন্তু অপরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়াও কিছু নয়।

গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি মাসিমার মৃত্যুতে। বলিষ্ঠতা আঘাত থেকে বাঁচায় না—বাঁচায় আঘাতের জন্যে মুহ্যমান্ হওয়ার অগৌরব থেকে। তাই খুব কম লোকেই জানত মাসিমার অকাল-মৃত্যু তাঁকে কতটা বেজেছিল। তবু আমাদের কাছে একদিন প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল তাঁর একটা ছোট্ট ধমকে। মাসিমার মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই একটি বন্ধু আসেন মেশোর ওখানে। আমি ও শান্তি তখন বুঝি ক্যারম খেলছি। সুধা কি পড়ছিল, অতিথিকে দেখেই কেঁদে ফেলে। কারণ অতিথি মাসিমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মেশো কঠিন স্বরে বললেন: "সুধা! তোমার দুঃখ তোমার নিজের—সেটা অপরের উপর চাপাবার তোমার কোনো অধিকার নেই। অপরকে তোমার দেবার কথা আনন্দ, যতটা পারো, নিজের বেদনা রাখো নিজের জিম্মায়—নইলে আর মানুষ কি?"

এ শুধু তার মুখের কথাই ছিল না। মাসিমার মৃত্যুর পরে একদিনের জন্যেও কেউ তাঁকে এতটুকু বিগলিত দেখে নি। সেই সদাহাস্য, শিশুসাথী, তর্কমুখর, পরোপকারী মানুষটি ছড়ার পর ছড়া কাটছেন, গান করছেন বেহালা বাজিয়ে; স্বহস্তে কুটনো কুটছেন, উনুন জ্বালছেন, বাটনা বাটছেন। বলতে ভুলেছি অমন ওস্তাদ রাঁধিয়ে জীবনে কমই দেখেছি। কত রকম রান্না যে তিনি জানতেন—মেয়েরা তাঁকে সাথী পেয়েও সমীহ করত কি সাধে?

একদিন আমাকে বললেন: "স্রগ্ধরা ছন্দ জানো মণ্টু?" আমি তখন সংস্কৃত ছন্দের খুব চর্চা করছি—ছেলেবেলা থেকেই কবির ছোঁয়াচে আমার সংস্কৃত ছন্দে অনুরাগ জন্মেছিল—পজ্ঝটিকা, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা এসব আওড়াতে পারতাম নিখুঁৎ ভঙ্গিমায়। কিন্তু

স্রগ্ধরা জানতাম না।' স্রগ্ধরার নমুনা হচ্ছে বিখ্যাত: ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারু চন্দ্রাবতংসং। "মানে কি মেশোমশায়!"

"আরে, এরও মানে জানো না! আমাদের পণ্ডিত মহাশয় জানতেন। তাই বলেছিলেন রেগে, এটুকুরও মানে জিজ্ঞেস করছিস তোরা? শোন্ ধ্যায়েন্নিত্যং, কিনা মহেশং, রজতগিরি কিনা নিভং। তবে চারুচন্দ্র যে কতখানি বতংসং সে বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে!' হাঃ হাঃ হাঃ।

তাঁর এধরনের রসিকতায় আমরা তো হেসে গড়িয়ে পড়তাম। আর এ-ধরনের প্রফুল্লতা মাসিমার মৃত্যুর পরেও সমানই অক্ষুণ্ণ দেখেছি। কিন্তু স্রগ্ধরার কথাটা বলতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মেশো বললেন: "শোনো, মুখস্থ করো। বড় গভীরভাব—আহা—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ —আর মুসলমান নূর সেখ পাঠাচ্ছেন খাসী মুর্গী ও কদু কিনা লাউ দিয়ে রান্না করা চালসিখানা খাবার নিমন্ত্রণ গলবস্ত্র হ'য়ে। ব্যাপারটা হচ্ছে: তাঁর পিতা আল্লা আল্লা শুনতে শুনতে খোদার পদারবিন্দ—ভজন করতে করতে পশ্চিমমুখী হ'য়ে মুরশিদাবাদের কাছে—মর্তদেহ ত্যাগ করেছিলেন। বুঝেছ তো! এইবার শোনো:

খোদাপাদারবিন্দদ্বয়ভজনপরঃ পশ্চিমাস্যঃ পিতা মে
শ্রুত্বাল্লাল্লেতি-বাণীং মুরশিদনিকটে মর্ত্যদেহং জহৌষ।
খাসী মুর্গী-সুখানা কদুকিছুভবিতা মৎপিতুশ্চাল্সিখানা
সেখশ্রীনূরনামা গলধৃতবসনঃ প্রেত্যসম্পাদনীয়া ॥

ত্রিশবৎসর আগেকার শোনা শ্লোক। খাতায় টুকে রাখি নি, হয়ত অনুস্বার বিসর্গের একটু আধুটু এদিক ওদিক হ'য়ে থাকতে পারে তবে ভুল নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। (চাল্সিখানা মানেটা কী আমি ঠিক জানি না—কবুল করছি)

এথেকে আশা করি বুঝতে পারবেন কেন এ-মানুষটি আমাদের কাছে এত প্রিয় হ'য়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমাদের সব কাজ কর্ম আশা আকাঙ্ক্ষায়ই তাঁর যোগ ছিল। জীবনে আমরা তাকেই সব চেয়ে সহজে ভালোবাসি যে সহজেই ঔৎসুক্য বোধ করে আমার সত্তার নানা বিকাশের সম্বন্ধে। শত্রুকেও ভালোবাসা যায়—ভালোবাসা যায় না কেবল তাকে যে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন।

মেশো আমাদের কাছে শুধু স্রগ্ধরা ছন্দের না—আরো কত বিস্ময়ের তথ্যই যে এনে হাজির করতেন। একদিন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের খুব সুখ্যাতি করলেন। মেশো বলেছিলেন মানুষ শুধু বাড়েই না—কমেও, মাথায়। কে একজন তর্ক করলেন —তা হতেই পারে না। প্রশান্ত মহলানবিশ বুঝি কোন্ এক বৈজ্ঞানিক না ডাক্তারি

বই থেকে প্রমাণ পেশ ক'রে দিলেন যে মানুষ কখনো হয়ত একটু বাড়ে কখনো একটু কমে। প্রশান্তর কথাটা আমার ঠিক মনে নেই—সে কাছে থাকলে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতাম। তবু কথাটার উল্লেখ করলাম দেখাতে মেশোর কি রকম উজ্জ্বল বুদ্ধি ছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধি। নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতেন নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতেই। শান্তি সুধা দুজনেই পড়াশুনোয় খুব ভালো হয়েছিল তাঁর স্বকীয় শিক্ষাপদ্ধতির গুণেই।

স্বাধীনচিন্তার ছিলেন তিনি মূর্ত বিগ্রহ। কবি তাই তাঁকে এত ভালোবাসতেন। পরমহংসদেব বলতেন গাঁজাখোরের গাঁজাখোরকে দেখলে বড় আনন্দ। বলীয়ান্ মানুষ দোসর খোঁজে দুর্বলদের মধ্যে না। তাদের দয়া দিতে পারে, স্নেহ বিলোতে পারে, কিন্তু সমধর্মী নৈলে বন্ধুত্ব করতে পারে না এ নিশ্চয়। কবির সঙ্গে তাই মেশোর এমন অন্তরঙ্গতা হয়েছিল।

মেশোর সাহিত্যে অনুরাগের একটি মূল কারণ ছিল অবশ্য কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। নৈলে, ঠিক সাহিত্যরসিক বলতে যা বোঝায় তা মেশো ছিলেন না। তবে কবির হাসির গান, স্বদেশী গান, প্রেমের গান তাঁর সাদামাটা গলায় গাইতেন জ্বলন্ত উৎসাহে। মেশোর সবচেয়ে প্রিয় কাব্য ছিল কবির সীতা। প্রায়ই আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন। কবির আবৃত্তি শুনে শুনে তিনিও চমৎকার আবৃত্তি করতে শিখেছিলেন। তাঁর উদ্ভাসিত কণ্ঠে "প্রেম না কর্তব্য বড"-র আবৃত্তি আজও ভুলতে পারিনি।

শুধু সীতাই নয়। কবির অন্য অনেক কবিতাও তিনি প্রায়ই প'ড়ে শোনাতেন। যেমন "ত্রিবেণী"তে তাঁর "প্রবাসে" কবিতায়—

হাস্য শুধু আমার সখা, অশ্রু আমার কেহই নয়
হাস্য ক'রে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।

কিম্বা মন্দ্রে কবির "নববধূ" কবিতাটি। মনে আছে শেষের দিকে যখন তিনি পড়তেন নববধূর পরিণত অঙ্গীকার :

ক্রমশ দিন কাটিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা ভীতি নিকট পরিচয়ে ;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমার সখা তিনি,
ভুবন 'পরে এমন আর কাহারে নাহি চিনি।
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এক স্নেহ,
বুঝেছি আমি—এমন আর আপন নহে কেহ।
পূর্বজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি ব'লে জানি ;
পরজনমে তাঁহারে মোর দেবতা ব'লে মানি।

এ দেহমন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে সঁপি,
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।—

তখন মাসিমার চোখ জলে ভ'রে আসত। "সতীলক্ষ্মী" ব'লে তিনি উদ্দেশ্যে তাঁর দিদিমণিকে প্রণাম করতেন—যার প্রসাদে কবি পেয়েছিলেন নববধূর মন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি।

মেশোরও চোখে বাষ্পাভাস দেখা দিত যখন তিনি পড়তেন তাঁর দিদিমণির উদ্দেশ্যে লেখা (যাকে মেশোও দিদিমণি বলতেন):

এসেছিলে সে দিন তুমি, যেমন ক্লান্ত নিদ্রাবেশে
সুখস্বপ্ন আসে।
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ
বসন্ত বাতাসে।
শুষ্ক তপ্ত নদীতটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত
ঢেউয়ের ম'ত এসে
স্মৃতি হ'তে হারা একটি অজানা রাগিণীর ম'ত
কোথা গেলে ভেসে! ·····
প্রিয়তমে! আজি তুমি জানি না'ক কোথায় গেছ,
কোথায় আছ, আর
কোনো শাস্ত্রের কোনো ধর্মের সাধ্য নাই ক দিতে পারে
তাহার সমাচার।
যেথা থাকো (থাকো যদি) আশা করি আছ সুখে,
আশা করি তবে
তোমার জন্য—যাহাই হোক না—আমাদের এজগৎ চেয়ে
কিছু ভালো হবে।

আমারও চোখে জল আসত। তবে বলেছি আমি স্বভাবে চিরদিন দর্পী। চোখের জল অপরের সামনে সহজে পড়ত না এক মেশোর সামনে ছাড়া, তখন মেশো আদর ক'রে টেনে নিতেন বুকে। বলতেন কবির কথা:

"মণ্টু, দ্বিজদাকে সামান্য মনে কোরো না। তিনি সাধারণ মানুষ নন। মহাপুরুষ। সত্যিই মহাপুরুষ। ছাই মেখে সন্নিসি হ'লেই মহাপুরুষ হয় না জেনো। প্রাণ বড়

আলেখ্য—"বিপত্নীক" কবিতার দুটি স্তবক।

হ'লে তবেই তাকে মহাপুরুষ ব'লে চিনবে। কতবড় প্রাণ* তাঁর বুঝতে শেখো। ব'লেই ফের আবৃত্তি গাঢ় কণ্ঠে :

করেছি কর্তব্য যাহা সেইটুকুই আমার যাহা জমা।
করেছি অন্যায় যাহা সেইটুকুই খরচ দিও বাদ।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি দুঃখ কোরো তাই ক্ষমা।
তোমাদের যেটুকু দিয়েছি, সুখ—কোরো আশীর্ব্বাদ।
তোমাদের মধ্যে আমি আসি নিত করতে বিসম্বাদ,
কেড়ে নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ ভাই।
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে—ক্ষম অপরাধ।
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি—কোনো দুঃখ নাই।
জমার চেয়ে খরচ বেশি হ'য়ে থাকে—তোমরা দোষী নহ।
জমা যদি বেশি থাকে—তোমাদেরি সেটা অনুগ্রহ।

আরো বলতেন : "তোমরা জানো না বাবু, আমি জানি দ্বিজদা কী ক্ষমাশীল। তাঁর "পাষাণীতে" (পাষাণী ছিল মেশোর আর একটি অতি প্রিয় বই) "গৌতমের কথা উথলে উঠেছিল তো তাঁর নিজেরই হৃদয় থেকে"—আবৃত্তি, যেখানে অহল্যা ফিরে এসে ক্ষমা চাইতে পুত্র শতানন্দ রুখে উঠে বলল :

"যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড কুলটা নারীর
হোক সে স্বকীয় পত্নী অথবা জননী।"

তাতে গৌতম উত্তর দিলেন :

ক্ষান্ত হও প্রিয়তম! শাস্তি দিব? হায়!
আকণ্ঠ নিমগ্ন পাপে আমি মূঢ়মতি
দুর্বল মনুষ্য নিজে, সাধ্য কি আমার
কর্তব্যস্খলিত মূঢ় মনুষ্য উপরি
বসিব বিচারাসনে? (অহল্যার প্রতি) এস অভাগিনী!
বিধির সুবিধে এই—আজি পাইলাম
যাহা পূর্বে কভু পাই নাই—প্রিয়তমে
তোমারে প্রথম দিন হৃদয় ভিতরে।
এস প্রপীড়িতা পরিত্যক্তা প্রাণেশ্বরী!

* ত্রিবেণীর - শেষ কবিতা—"অবসান"।

এস বাণবিদ্ধ মম পিঞ্জরের পাখি
হৃদয় পিঞ্জরে ফিরে এস।

মেশো একবার মাত্র আমাকে কঠোর স্বরে তিরস্কার করেছিলেন আমি "নিরপেক্ষ" ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে কবির কবিতার তুলনা করেছিলাম ব'লে। বলেছিলেন—"তোমার মুখে আমি তোমার বাবার কাব্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা শুনতে চাই নে—শুনতে চাই শ্রদ্ধার কথা—ভক্তির কথা—বিচারের নয়। নিরপেক্ষ হওয়া শক্ত নয়—শক্ত হচ্ছে ভক্তিমন্ত হওয়া।"

তাঁর কাছ থেকে এই সূত্রে আমি যেন নতুন ক'রে পাঠ নিয়েছিলাম ভক্তিতত্ত্বের—কবির প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি দেখে আমার মন যেন ভক্তির মহিমা উপলব্ধি করত আরো নিবিড় ভাবে। কত ভাবেই যে এ-ভক্তি তাঁর প্রকাশ হ'ত একটা দৃষ্টান্ত দিই।

কবির অপ্রকাশিত নানা হাসির ছড়া তিনি আবৃত্তি করতেন তাঁর নিজস্ব রসাল ভঙ্গিতে। যথা কবির "বিবাহে উপরিলভ্য আমার অষ্ট শ্যালিকা" "যদি দেখতে চাই ও মুখখানি ঘোমটা দিয়ে কেন ঢাকো", ইত্যাদি। আর একটা:

গ্রীষ্মে ঘাম, শীতে সর্দি, রাতে মশা, দিনে মাছি,
ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির—তবুও তো বেঁচে আছি!
বজ্রাঘাত ভূমিকম্প ওস্তাদের লম্ফঝম্ফ,
রাস্তায় সব ভক্তবৃন্দের কীর্তন এবং নাচানাচি—
তবুও তো বেঁচে আছি!
ব্যারিস্টার, উকিল-মোক্তার, হাকিমের জেরার মধ্যে,
সম্পাদক, কংগ্রেসবক্তা, গ্রন্থকার—গদ্যে পদ্যে
নাটক ও নভেল বৃষ্টি বিনা তাল গানের সৃষ্টি
অদ্ভুত সব বেজায় কন্সার্ট—মনে হয় থামলে বাঁচি—
তবুও তো বেঁচে আছি!
ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা আদির মৃত্যু মন্ত্র,
রকমারি 'প্যাথি' নিয়ে ডাক্তারদের ষড়যন্ত্র
ছাত্র যত অকালপক্ক কেচ্ছা এবং উড়ো তর্ক
অ্যাকট্রেসদের কটাক্ষবাণ সদাই নাকের কাছাকাছি—
তবুও তো বেঁচে আছি!

এই কবিতাটির শেষ চরণে 'অ্যাকট্রেসদের কটাক্ষ' বলতে বলতে তাঁর সে কী উল্লাস?—

"শুধু বেঁচে থাকা নয়—মণ্টু"—বলতেন মেশো—"এমন বেপরোয়া ভাবে বেঁচে থাকা—কে কী বলছে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে—একেই তো বলি মরদ। ভেবে দেখ দেখি—কত সুন্দরী মেয়েকে তিনি একবার শুধু ডাকলেই এসে হাজিরি দিত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা, আটত্রিশ বছর কি আর বয়স—যাঁর অমন স্বাস্থ্য—তার উপর অত টাকা রূপ যশ মান—অথচ অ্যাকট্রেস কি, পরমাসুন্দরীদের কটাক্ষও কি তাঁকে এতটুকু বিচলিত করতে পেরেছে? সব যার হাতের মুঠোর মধ্যে সে যখন মুখ ফিরোয় তখনই তাকে বলি উদাসী—এই বাপের কীর্তি নিয়ে করতে চাও তুমি নিরপেক্ষ সমালোচনা? মণ্টু, শোনো বলি। সমালোচনা রাম শ্যাম যদু হরি সবাই করতে পারে—কিন্তু ভক্তি করতে পারা, এ যে পারে তাকেই বলি চক্ষুষ্মান্। এই জন্যেই আমি এত মানা করি তোমায় তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে। তিনি অধিকার দিয়েছেন তাঁর নিজগুণে। তোমার গুণপনা বুঝব যখন তুমি বুঝবে এ কত বড় গুণ দেখেশুনে।"

শাস্ত্রে বলেছে ভক্তিমান্ হবার একটি শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে ভক্তিমন্তদের সঙ্গ করা। মেশোর সঙ্গ আমার সত্যি চোখ ফুটিযে দিয়েছিল ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে। তাঁর মুখে কত সময়েই যে শুনেছি কবির চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা, সে কী বলব। শুনতে শুনতে আমার বালক মনে জেগে উঠেছিল ভক্তির প্রতি একটা সহজ টান। একথা এত ক'রে বলছি এই জন্যে যে কবিকে যতটা ভক্তি করতে পেরেছিলাম ততটা ভক্তি করা আমার মতন তর্কপ্রিয় উদ্ধত স্বভাবের বালকের পক্ষে সম্ভব হ'ত না সে সময়ে—যদি না মেশোর মতন অসামান্য মানুষকে তাঁর প্রতি ভক্তিতে এভাবে নত দেখতাম। যে-মেশো কাউকে মানতেন না, তিনি কবির কাছে নত হ'তেন ঠিক শিষ্যের মতন সহজ আনন্দে। তাঁর উৎসব সভায় মেশোর স্থান কতখানি ছিল যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করি যখন কয়েক বৎসর পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর 'পরে তাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

বন্ধু মিলনের দিনে বারংবার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে।

কবির মৃত্যুর পরে একদিন মেশো চুপি চুপি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিলেন: "মণ্টু! সাবাস। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু একলা কেঁদে নিও।"

কারণ তাঁর মৃত্যুর দিনের পরে কেউ আমাকে চোখের জল ফেলতে দেখে নি।

কবির মৃত্যুর পরে আমি যখন থিয়েটার রোডে দাদামহাশয়ের অভিভাবকতায়

থেকে কলেজে পড়ি তখন মেশোর ওখানেই ছিল আমার সবচেয়ে বেশি গতিবিধি। কত বুদ্ধিমান্, জ্ঞানোৎসুক, মজলিশি ছাত্র, অধ্যাপক, চাকুরে, ছেলে মেয়ে শিশু বুড়ো যে সেখানে যেত! সবাইকে নিয়েই তিনি জমাতেন আসর। সেনেটে বা দ্বারভাঙা বিলডিঙে পরীক্ষা দিতে গেলে দুপুরে মেশোর ওখানেই খেতাম। মাসিমার সে চোখের জল ভুলব না। "আহা, আজ যদি দ্বিজদা থাকতেন—তুই গান ও পড়াশুনোয় এত উন্নতি করেছিস দেখলে কী আনন্দ হ'ত তাঁর বল্ দেখি!"

অম্নি মেশোর আনন্দময় মুখখানিও ম্লান হ'য়ে আসত। কবির বিরহ তিনি কতখানি অনুভব করেছিলেন আমি জানতাম। এ নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করতেন না। কিন্তু নানা সময়ে তাঁর নানা কবিতা প'ড়ে আবৃত্তি করতে করতে কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হ'য়ে আসত। আর মাঝে মাঝে বেহালা বাজিয়ে শান্তির সঙ্গে কোরাসে গাইতেন কবির মেবার পতনের পরে সেই পরাধীনতার অপরূপ বিষাদের গান:

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কী গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।

কবির মৃত্যুর পরে তাঁর জীবনে একটি গভীর পরিবর্তন এসেছিল—বা ধীরে ধীরে আস্‌ছিল বলাই ভালো। বাইরের দিকে তিনি কাউকে সে-কথা বুঝতে দিতেন না—কিন্তু অন্তরের দিকে তাঁর মনে একটা নূতন জিজ্ঞাসা জেগে উঠছিল। কবির হাসির গান গাওয়া তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

* * * *

সংসারীদের মধ্যে কবির পরে এত শ্রদ্ধা আর কাউকে আমি করতে পারি নি—কোনো সংসারীর শ্রদ্ধাও বোধ হয় আমার কাজে এত মহার্ঘ মনে হয় নি। বলেছি, তাঁর যখন দেহাবসান হয় পুরীতে—তখন আমি জর্মানিতে। সেখানে তাঁর একটি ছোট চিঠি পাই। চিঠিপত্র তিনি বড় একটা লিখতেন না। তবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি লিখেছিলেন আমাকে শুধু এই কথাটি জানাতে: "তোমাকে শুধু স্নেহই করি নি মন্টু, গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলাম। এতেই আমার সবচেয়ে আনন্দ। এই কথাটি তোমাকে জানিয়ে রাখি আজ—যদি মুখে বলার সুযোগ আর না হয়।"

তাঁর মতন দেবচরিত্র যে আমার মতন সামান্য কিশোরকে "শ্রদ্ধা" করতে পেরেছিলেন এতে আমার কত গর্ব আমারও তাঁকে আর মুখে বলা হ'ল না—কারণ আমার দেশে ফেরার আগেই তাঁর দেহান্ত হয়।

তাঁর সম্বন্ধে বলার কথা আরো কত আছে। যারা তাঁকে একটু কাছ থেকে জেনেছিল তারা সবাই আমার একথায় সায় দিবে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কীর্তির দিক দিয়ে বলার কথা কম ব'লেই তাঁর জীবন-চরিত লেখা কঠিন। আরো এই জন্যে যে তিনি ছিলেন বাইরে যেমন উচ্ছল, ভিতরে তেম্নি গভীর। এখানেও তাঁর সঙ্গে কবির মিল ছিল। কত সময়েই আমার মনে হয়েছে যে এধরনের বন্ধুত্ব বোধ হয় এযুগে আর এমন সুষমা সৌরভে ফুটতে দেখব না। কারণ এ-যুগের একটা গোড়াকার কথা "সমালোচনা"। কিন্তু বিচারের দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ আর প্রেমের দৃষ্টি দিযে বরণ এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ যে আশমান জমিন তা তিনিই দেখিযে ছিলেন তাঁর প্রেমের সহজ ব্যাপকতায়।

একবার কার একজনের অটোগ্রাফের খাতায তিনি লিখেছিলেন নিজের রচিত একটি চতুষ্পদী—মাসিমার মৃত্যুর পরে—

সুখ নাহি পাওয়া যায় সুখেরে খুঁজিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে ভরে প্রাণ।
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান॥

চারটি লাইনে একটি সমগ্র জীবনের মূলমন্ত্র এমন অপরূপ ক'রে কয়জন কবি প্রকাশ করেছেন জানি না।

* * * *

অষ্টম উল্লাস

সুকিয়া স্ট্রীটে একটি বাড়িতে যখন কবি থাকতেন তখন মেশো প্রায়ই আসতেন তাঁর এক মান্ধাতার আমলের fixed wheel সাইক্‌লে চ'ড়ে। আমাকে নিয়ে যেতেন তারই সামনের লোহার ডাণ্ডায় বসিয়ে। কবি দুপুরে আপিসে গেলে আমি প্রায়ই মেশোর ওখানে ব'সে "আড্ডা" দিতাম, কিম্বা তর্ক করতাম, কিম্বা পুরাণ মহাভারত নিয়ে নানা বিদ্যে দেখাতাম।

মেশো পুরাণ মহাভারত পড়তেন অনেকটা যেন আমার সাথী হ'তেই—মাতৃহারা বালককে উৎসাহ দিতে। শুধু আমাকেই যে তিনি এভাবে উৎসাহ দিতেন তা নয়—তাঁর উৎসাহপ্রার্থী আরো অনেক পোষ্যপুত্র ও পোষ্যকন্যা ছিল—ভাই বোন তো অগুন্তি: গিরিশদা বলতে ছিল তারা সবাই অজ্ঞান। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর একটা গভীর মমতা ছিল আমি মাতৃহারা ব'লে। তাই প্রায়ই এসে সুকিয়া স্ট্রীট থেকে আমাকে তাঁর সাইক্‌লে চড়িয়ে নিয়ে নেতেন তাঁর হ্যারিসন রোডের "চিরসভা"-য়। সেখানে তাঁতে আমাতে চলত এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা। ব্যাপারটা এই:

পুরাণ মহাভারত ভাগবত হরিবংশ এই সব প'ড়ে প'ড়ে আমরা উদ্ধার করতাম সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতির কুলজি: ভৃগুর কয় ছেলে, চন্দ্রের কয় স্ত্রী, কশ্যপমুনির কয় মেয়ে—ব্রহ্মার মানসপুত্র মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু—এদের কার কয়জন স্ত্রী—তাদের ছেলে মেয়েদের নাম কি ইত্যাদি ইত্যাদি। মস্ত মস্ত ম্যাপের আকারের শাদা কাগজে লেখা হ'ত এই সব কুলজি। মেশো হয়ত সময়ে সময়ে নানা পুরাণ ঘেঁটে আবিষ্কার করতেন—"এই দেখ, অগ্নিপুরাণে পাওয়া গেল অমুকের ছেলে ছিল কুলিশহট্ট—এটা মহাভারতে পেলে না তো?" অমিও ফের শোধ তুলতাম: এই দেখুন হরিবংশে রয়েছে অমুকের মেয়েও ছিল—মস্তকভক্ষিণী—তার খবর আপনি বিদ্যুৎপুরাণেও পেলেন না তো।" অম্‌নি মেশোর সেই অট্টহাসি: "হাঃ হাঃ হাঃ—ব্যস্ তুম্ ভি মিলিটারি হম্ ভি মিলিটারি—পাঞ্জা লড়ো।"

লড়তাম পাঞ্জা। তারপর টাগ্ অফ ওয়ার। মুগুর, বারবেল। এইসব ক'রে যৌবনে আমি দারুণ জোয়ান হ'য়ে উঠেছিলাম। এও ছোঁয়াচে প'ড়ে, কারণ মেশো ছিলেন বিষম পালোয়ান—কুস্তিও জানতেন। তাই আবাল্য আমরা আরো চেয়েছিলাম দেহেও জোয়ান হ'তে, শুধু মনেই না।

তবে বলিষ্ঠতার দিকে ঝোঁক আমার একটু বেশি ছিল বোধ হয় স্বভাবেই। কারণ

বলিষ্ঠতার একটা আনুষঙ্গিক হ'ল বেপরোয়া ভাব, আর আমি কথাবার্তায় ছিলাম নিরঙ্কুশ। মেশো ও কবি দুজনেই আমাকে উৎসাহ দিতেন তাই "কারে ডর"? কিন্তু তবু সময়ে সময়ে যে-বীজ বুনেছেন তার ফলের কিছু স্বাদ কবিকে পেতেই হ'ত। No rose without a thorn বলে না?—একটা উদাহরণ দিই খুব অল্প বয়সের। আমার বয়স যখন ছয় কি সাত তখন তাঁর সঙ্গে ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়ি দাবা খেলা দেখতাম। দাবা খেলতে শিখে নিয়েছিলাম, সাত বছর বয়সের মধ্যেই বেশ ভালো খেলতে পারতাম। শুধু তাই না—উপরচাল ব'লে দিতাম কবিকে -"দেখবেন ঐ বোড়েটা চাপায় আছে, ওঠসা কিস্তি যদি দেয় হাবু –

"হাবু কী রে?—হাবু বাবু বল্?"

"আপনি যে হাবু বলেন?"

কৃষ্ণবর্ণ, সদাশয় হাবুবাবু হেসে উঠলেন: "তা বলুক বলুক।"

পিতৃবন্ধু হাবুবাবুকে হাবু বলতাম অম্লানবদনে! একি ভুলবার কথা?

কবির বন্ধুরা এসময়ে আমাকে আমার মুখরতা সত্ত্বেও খুব স্নেহ করতেন। কারণ এই যে আমার চটপটে কথা শুনে তাঁরা ভারি আমোদ পেতেন, কিম্বা হয়ত এই জন্যে যে আমি ছিলাম শৈশবেই মাতৃহারা।

সব সময়ে নয় অবশ্য। কারণ ছোট মুখে বড় কথা অনেক বড়দের কাছে অনেক সময়ে কী রকম দুঃসহ হ'য়ে ওঠে জানেন তো। কাজেই আমার মুখে সময়ে সময়ে রোখালো তার্কিক বিজ্ঞতার বুলি শুনে অনেকে আমার 'পরে বিরক্তও হ'তেন দারুণ। তখন তাঁদের চিত্তজয় করতে হ'ত গানে। খুব বিপদে পড়লে মেশোর শরণ নিতাম তিনি আমার প্রতি বিরূপদের বোঝাতেন যে সব ছোট ছেলেরাই কিছু ছোট হ'য়ে জন্মায় না।

* * * *

মনে আছে আমাদের "ওখানে" তিনি আসতেন প্রায়ই ভোরের দিকে। কবি প্রায়ই ঘুমোতেন বারান্দায় একটি খাটে। মেশো নীরবে তাঁর পা টিপে ঘুম ভাঙাতেন। কবি চোখ মেলেই এক গাল হাসতেন: "কী হে? গিরিশ! এখনো মেয়েমহলে হাজিরি দাও নি? ও মণ্টু, তোর মেশোমশায় রে!" আমি লাফিয়ে উঠতাম। মেঘেনদা হেমেন প্রতিমা আরো যদি কেউ থাকত তারাও।

তারপর প্রায়ই গান শেখার মহলা। শান্তিকেও মেশো তখনো নিয়ে আসতেন হয় তাঁর সঙ্গে ক'রে, সাইকেলের ডাণ্ডায় বসিয়ে, না হয় শান্তির নিজের একটা বাচ্চা সাইকেলে চড়িয়ে। ওর কণ্ঠস্বর ছিল যাকে ওস্তাদি ভাষায় বলে "মর্দানা"। একবার ভারি

মজা হয়েছিল। গ্রামোফোনে ও দিয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গাওয়া একটি টপখেয়াল :

"আমার কথা কোসনে লো সই
দেখা হ'লে তারি সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস না যে
বেঁচে আছি প্রাণে প্রাণে।"

গানটি নিধুবাবুর। সুরেনমামা গাইতেন এটি ইমনকল্যাণে তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গিতে। এ-ভঙ্গির কিছু আয়ত্ত করেছিল হেমেন তার আশ্চর্য দরদী কণ্ঠে। শান্তি এ গানটি বোধহয় তার কাছেই শেখে। কিন্তু আমি ও মায়া যখন গ্রামোফোনে প্রথম শুনি—বেশ মনে আছে দুজনেই দারুণ চম্‌কে উঠেছিলাম শান্তির "আ—মার"—এর এক সপ্তকী গমকে। মায়া এত হাসতে পারত যে বলা যায় না। ওর ধবধবে রঙ হাসতে হাসতে ঠিক টকটকে আবীরের মতন হ'য়ে উঠত। এ-হাসিতে দীক্ষা আমাদের প্রায় আঁতুড় ঘরেই—এবং দীক্ষাদাতা ছিলেন যুগল গুরু : কবি ও মেশো।

* * * *

সে যাই হোক শান্তি যখন আসত তখন আরো ভালো লাগত গান গাইতে। কারণ ওর ছিল আশ্চর্য প্রাণশক্তি। মেশোর মেয়ে তো! তখন ওর বয়স তো মাত্র বারো কি তের। কিন্তু সেই বয়সেই ও কথা বলত কী যে পাকা পাকা! আমার চেয়েও পাকা, ভাবতে পারেন? মনে আছে মা যখন মারা যান, আমার ছ'বছর বয়সে, তখন মামিমা মাসিমারা আমাকে বলতেন মা বিদেশে গেছেন। তখন শান্তির বয়স পাঁচ। ও একদিন আমাকে এসে বলল : "দাদা, বড় মাসিমা কোথায় গেছেন আমি জানি।" যাকে বলে important air. আমি অধীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করতাম : কোথায় রে?" ভাবলাম ওকে বোধ হয় মামিমা কিম্বা মাসিমাদের কেউ গোপনে বলেছেন মা কোথায় গেছেন। (বাবা তখন টুরে—বিদেশে) ও বলল ফিসফিস ক'রে : স্বর্গে। আর আসবেন না।"

কী যে কষ্ট হ'ল আমার! মায়া অবশ্য কিছু বুঝত না। কারণ তার বয়স তখন মাত্র চার। ঠিক ফুলফোটা কান্তি তার। হেলে দুলে যখন চলত জাঙিয়াপরা মেয়ে সবাই ঠায় চেয়ে থাকত ওর দেহকান্তি দেখে এমন গৌরী মেয়ে আমাদের দেশে বিরল। বলেছি সৌন্দর্য আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল ছেলেবেলা থেকে। তাই মায়ার রূপও আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম ছবছর বয়স থেকেই।

"কিন্তু মা আর আসবেন না!"—বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল, আরো দুঃখ হ'ল মায়ার কথা ভেবে। বিজ্ঞভাবে ভাবতাম—ও বেচারি তো বোঝে না!

এখন আশ্চর্য এই যে দুদিন যেতে না যেতে সব ভুলে গেলাম।... পরে একটি নভেল পড়েছিলাম—মাতৃহারা বালক ক্রমাগত মার কথা ভাবে। মোটেই না—অবশ্য যদি তার জীবন সুখের হয়। তবে যদি বিমাতা এসে অত্যাচার করে, কি মার অভাবে বাপের অধোগতি হয় তাহ'লে আলাদা কথা। কিন্তু সচরাচর বাড়ন্ত শিশুর দৃষ্টি যাবে সামনে দিকে। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি মনে পড়ে আমাকে লেখা: "চলি বলেই ভুলি—আর ভুলি ব'লেই চলি।"

ভোলালেন আমাকে প্রথম দিকে বড় মামি মা—আজ সহজেই। আমার তিন মামার মধ্যে বড় মামা ৺জিতেন্দ্র নাথ মজুমদার সে-সময়ে—১৯০৩ সালে বলিষ্ঠ প্রিয়দর্শন যুবক। মা মারা যাবার কয়েক মাস আগেই বড় মামার বিবাহ হয়। বড় মামিমা তখন সবে বার পেরিয়ে তেরয় পা দিয়েছেন। কী স্নুন্দর যে তিনি দেখতে ছিলেন সে সময়ে! আর কী বুদ্ধি! সমস্ত ঘরকন্না ঐ তের বছরের গিন্নি সমঝে নিলেন দুদিনে। সঙ্গে সঙ্গে মায়াকে ও আমাকেও বুকে তুলে নিলেন। পরে যখন তাঁর প্রথম সন্তান 'প্রতুল' হয় তখনো আমার প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ একফোঁটাও কমে নি। রোজ সে বড় যত্নে খাওয়ানো—বিশেষ ক'রে ক্ষীরভাত—কোলে বসিয়ে! কেবল এক অত্যাচার ছিল তাঁর। রোজ আমাকে খাওয়াবেনই সকাল বেলা এক গেলাস দুধ আর সন্ধ্যাবেলা এক গেলাস। এখানে তিনি ছিলেন অচল-অটল কিছুতে ছাড়তেন না—বহু আদর যত্ন ক'রে লোভ দেখিয়ে, কুকুরছানা বিড়ালছানা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প ব'লে—তাঁর তূণে আনমনা করার অস্ত্র ছিল কি একটা?

এহেন মামিমা যে সহজেই আমার মার স্থান অধিকার করবেন এর আর বিচিত্র কি! কিন্তু দেখতে দেখতে মাকে ভুলে গেলাম এ-দৃশ্য কবিকে বেজেছিল। অবিশ্যি তিনি জানতেন যে আমি ভুলে যাবই দুদিনে। তাই লিখেছিলেন গভীর অনুকম্পায় তাঁর মাতৃহারা কবিতাটিতে (আলেখ্য):

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে
মায়ের মূল্য আছে?
এখন রে তোর কাছে মা কি মাসি পিসি মামি
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী।

কিন্তু পরে—করেছিলেন কবি ভবিষ্যদ্বাণী—

পড়বি যখন মাতৃস্নেহের গাথা
ইতিহাসে অথবা অন্যথা
তখন রে তোর আপন মায়ের কথা

স্বপ্নের ম'ত ভেসে আসবে সব
তখন বুঝবি মায়ের মূল্য
বুঝবি নেই কেউ মায়ের তুল্য
তখন যাদু মায়ের অভাব করবি অনুভব।

কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র আংশিকভাবে সফল হয়েছিল।

আমি একটু বড় হ'তে না হ'তে মায়ের কথা ভেবে আমার নিজের "অভাবের" কথা ভেবে দুঃখ বোধ করতাম বটে—কিন্তু তার দশগুণ দুঃখ বোধ করতাম কবির "অভাবে"র কথা ভেবে। বিশেষ আলেখ্যে আমার উপর লেখা এই কবিতাগুলি পড়ার পর থেকে। গৌরবও হ'ত বৈকি—আমার মতন সামান্য একটুখানি ছেলেকে এহেন রূপবান্ গুণবান্ দশাশই পিতা এই রকম ভালোবাসেন! চোখ জলে ভ'রে আসত কিন্তু মার জন্যে নয়—তাঁর জন্যে।

এইখানেই ছিল তাঁর চরিত্রের এক আশ্চর্য যাদু। তিনি ভোলাতে পারতেন। মামি মাসি আমাকে যে ভুলিয়েছিল সে ছেলে-ভোলানো। মাকে সত্যি ভুলিয়েছিলেন তিনি নিজে। অবশ্য সময়ে সময়ে মার কথা মনে হ'ত না এমন নয়। তখন মাসিমা শান্তি সুধাকে বা মামিমা প্রতুলকে আদর করলে লুকিয়ে চোখের জল ফেলতাম—আমার মা থাকলে আমাকেও তিনি এমনি আদর করতেন না কি? কিন্তু সে-স্মরণ ক্ষণিকের। মনটা আমার তখনি ছুটে যেত কবির কাছে, আরো এই জন্যে যে তাঁর এ দুঃখের কাহিনী বোঝাতেন আমাকে মেশো।

* * * *

কিন্তু এবার বড় মামিমার কথা একটু বলি। বলেছি আমার নয় মাসি। তিন মামা। বড় মামা ছিলেন মার পরেই। মা ও বড় মামা পিঠোপিঠি: পরস্পরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মা মারা যেতে বড় মামা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। দিদিমণিকে তিনি দেবীর মতন মনে করতেন।

বড় মামিমা মাকে মাত্র কয়েকমাস দেখেছিলেন। কিন্তু তাইতেই মাকে তিনি গভীর ভাবে ভালোবেসেছিলেন। কারণ মা তাঁকে ভ্রাতৃজায়া ব'লে বরণ করেন নি—আদরিণী কন্যা বলেই ঘরে তুলেছিলেন। মা-ই ছিলেন বাড়ীর সবচেয়ে আদুরে মেয়ে। দিদিমা আমাকে কতদিন চোখের জল ফেলে বলেছেন: "জানিস তোর মার কি রকম জোর ছিল? তোর দাদামশায়ের দুটো লোহার সিন্দুক। তোর মা আবদার ক'রে হেসে বলত: মাগো! এর একটা খালি আমার। অন্যটা তোমার বাকি সব ছেলেমেয়ের!

এ অবশ্য মার মুখেরই বলা। কারণ পিতৃধনের কথা ভাববার প্রশ্নই উঠত না। কবিও ছিলেন এবিষয়ে মেশোর মতনই কঠোর। শ্বশুরবাড়ি থেকে মা এক পয়সাও নেবেন না। মেশোর মতন তিনি যখন বিবাহ করেন তখন শ্বশুর মহাশয় মেয়েকে কোনো যৌতুকই দিতে পারবেন না এই সর্ত ক'রে তবে বিবাহ করেছিলেন।

এহেন দিদিমনিকে বড মামিমা ভালোবাসবেন এতো জানা কথা। বিশেষ ক'রে ননদিনীর রূপের জন্যে। সে রূপ ছিল আশ্চর্য। অন্য সব বিভূতির মতন রূপও এমন একটা স্তরে উঠতে পারে যখন তাকে নিয়ে আব মতভেদ পর্যন্ত হয় না। মার ছিল সেই জাতের কান্তি—শুধু নয়নানন্দদায়িনী নয়, তার উপর চিত্তহারিণী। দিদিমা বলতেন গর্ব ক'রে "জানিস আশু চৌধুরীব বাড়ি লাট সাহেব এসে তোর মাকে দেখে বলেছিলেন এমন সুন্দর মেয়ে তিনি ঠাকুর বাড়িতেও দেখেন নি।"

তবে মা বেশভূষা করতে একেবারে জানতেন না। মাব একটি বড় ছবি আজো আমার মাতুলালয়ে আছে—তাঁর বিয়েব সময়ের তোলা। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি হাস্যকর বেশ। ঠাকুর বাড়ি ও ব্রাহ্মসমাজের কাছে হিন্দুদের খুবই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এজন্যে। "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্" - সাধু কালিদাস!

মেজমাসিমাও খবই রূপসী ছিলেন, তবে মার মতন নয়। নমাসিমার ও সুষমা-মাসিমার বেলাযও ঐ কথা। তবে সুষমা এক বিষয়ে অন্য মাসিদেব হারিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুর বাড়িতে সে খুব যেত ব'লে প্রসাধনের আর্টটা শিখেছিল। তার মীরাবাই অভিনয় দেখে দলে দলে কিশোর পাগল হ'যে তাকে চিঠি লিখত আব সে আমাকে দেখিয়ে তার ডাগর চোখ আরো ডাগর করে বলত "কী কাণ্ড রে মণ্টু, ভাবতে পারিস ভাই?" এ কিন্তু কবির মৃত্যুর অনেক পবের কথা তাই এ প্রসঙ্গ থাক।

কবির জীবদ্দশায় সুষমা আমাদের এখানে খুব আসত। আমার চেয়ে সে ছিল মাত্র ছয়মাসের বড়। আমরা প্রায় পিঠোপিঠির মতন ব্যবহার করতাম। খেলতে খেলতে রাগ হ'লেই তার ঝাঁকডা ঝাঁকডা চুল ধ রে আমি ক'ষে টান দিতাম আর সে আমাকে চুটিয়ে খিম্‌চোত। কিন্তু এত সুন্দর সে দেখতে ছিল যে, ভাবে আমাদেব আড়ি হ'ত খুবই কম!

মামিমার সৌন্দর্যও আমাকে মুগ্ধ করত। তিনি অবশ্য আমার সুন্দরী মাসি তিনটির সঙ্গে দাঁড়াতে পারতেন না রূপের প্রতিযোগিতায়, কিন্তু তাঁর রূপে তাঁর তীক্ষ্ণ সুবুদ্ধি ও অনাবিল স্নেহশীলতা আনত এক নব দীপ্তি। এসম্বন্ধে এক মজার গল্প বলি।

আমার তখন সাত আট বছর বয়স। তবু আমার এক দূর সম্পর্কের ইন্দুমামার কোলে চড়েই যেতাম থিয়েটারে। আশ্চর্য— বলতেন প্রবীণারা এই এক রত্তি ছেলের

একবারও ঢুলুনি পর্যন্ত আসে না গা!—রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জাগে! অনেকে কবিকে বারণ করত। কিন্তু শুচিব্রতীদের এই বারণের জন্যেই যেন আরো তিনি নিয়ে যেতেন আমাকে থিয়েটারে কারুর কথাই কানে না তুলে। যাক্ যা বলতে এপ্রসঙ্গ উঠল : ক্রমাগত থিয়েটার দেখে দেখে আমার কথার বাঁধুনি এসে গিয়েছিল।

সেদিনকার কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। এক দিনের স্মৃতি কেন জানি না, মনে হয় না কি যেন গতকাল ঘটেছিল? আগের দিন রাতে অভিনেত্রী নরীসুন্দরী কবির "বিরহ" প্রহসনে গোলাপী সেজে পান সাজতে সাজতে গেয়েছিল :

"আরে থালে মেরি মিঠি খিলি
মেরি সাথ বৈঠকে ইঁয়া নিরিবিলি।" ইত্যাদি।

মামিমা সকালে বললেন : কেমন লাগল বাবা!

ঘরভরা লোক, দাদামহাশয় দিদিমা মামা মাসিরা সবাই। কবিও ছিলেন।

আমি বললাম : চমৎকার মামিমা।

মামিমা : কাকে সবচেয়ে ভাল লাগলো তোর?

আমি (তৎক্ষণাৎ) : কেন নরীসুন্দরীকে।

মামিমা (হেসে) : খুব সুন্দর বুঝি!

আমি (তৎক্ষণাৎ) : ঠিক তোমার মতন নবযৌবনসম্পন্না মামিমা।

মামিমা (লজ্জায় লাল হয়ে) ছি বাবা, অমন কথা কি বলতে আছে মা-মাসিকে?

আমি (অবাক্) : বাঃ। সত্যি কথা বলতে নেই?

* * * *

এই জন্যেই অনেকে আপত্তি করত। বলত কবি ছেলেটির মাথা খাচ্ছেন। ঐ বয়সে থিয়েটার, গান, বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা, পাকা পাকা কথা—এসব তো ভালো লক্ষণ নয়।

কিন্তু কারুর আমাকে শাসন করার জো ছিল ভেবেছেন? মা মারা যাবার পরে মাঝে মাঝে আমি আমার মামার বাড়ি থাকতাম—মানে দাদামশায় দিদিমার বাড়ি—কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (এখনকার গুরুদাস লাইব্রেরির ঠিক পাশেই তিনতলা বাড়ি)। ঐ বাড়িতেই নাকি আমি জন্মেছিলাম তখন দাদামহাশয় দিদিমা মামা মাসিরা সবাই মিলেমিশে থাকতেন—প্রকাণ্ড একান্নবর্তী পরিবার। ছোট ছেলে মেয়েও ছিল প্রচুর। সুষমার চুলটানা ছাড়া আমি "বলং বলং বাহুবলং" নীতি প্রয়োগ বড় একটা করতাম

না—কেবল মাঝে মাঝে আমার প্রায় সমবয়সী ছোট মামা ভ্যাংচার বুকে বসতাম চেপে—যখন সে বেশি বিদ্রোহ করত। আমার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সচরাচর কেউ করত না। ভ্যাংচাও আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসত। তবু এক একবার যখন শাসন মানত না তখন বুকে চেপে না ব'সে করি কী?

কিন্তু তখনও কেউ আমাকে শাসন করতে পারবে না—দিদিমার মানা। তিনি দুর্দান্ত রাগী মানুষ ছিলেন। আর আমি ছিলাম তাঁর প্রথম নাতি, চক্ষের মণি। তাঁর কাছে যেদিন রাত্রে শোব একটি ক'রে টাকা পাব, এই তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল। যখন খুব অর্থাভাবে পড়তাম শুতাম তাঁর কাছে। তবে সাধারণত জমিয়ে বই কিনতে। বেশভূষার সখ আমার ছিল না—না খেলাধুলোর।

আমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না কি সবারই চোখে পড়ত। পাকা হ'লে কি হয় ছেলে সেয়ানা আছে— যদি ব'খে না যায় তবে মানুষ হবে—বলতেন আত্মীয়ারা। কিন্তু খতিয়ে বখা হব, না মানুষ হব এ নিয়ে প্রকেট মহলে ঘোর মতভেদ ছিল। কিন্তু তাঁদের কারুর টুঁ শব্দ করার জো ছিল না: দিদিমা ছিলেন দারুণ রাশভারি মানুষ—আমাকে কেউ কিছু বললেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন: "ওরে ও ধ্যানে বসা ছেলে সাক্ষাৎ শুকদেব গোস্বামী!" মাসিমা যা হাসতেন শুকদেব গোস্বামী শুনে।—"হ্যাঁ রূপসী মেয়েদের প্রতি যার ছ বছর বয়স থেকে টান সে শুকদেব হবে না তো শুকদেব আর কার নাম?" দিদিমা ঝংকার দিয়ে বলতেন: "আমার জনম বৃথায় গেল চিনতে পারলাম না।"

"ধ্যানে বসা ছেলে' আর এই 'আমার জনম বৃথাই গেল চিনতে পাবলাম না' এই দুটি কথা দিদিমার মুখে কতবার শুনেছি তার সংখ্যা নেই। শেষে মামিমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: "ধ্যানে বসা ছেলে মানে কি মামিমা?'

মামিমা বললেন: যে সব ছেলের জন্মাবার সময় মাথা আগে বেরোয় না—আসন-পিঁড়ি হ'যে বসা নিম্নদেশ আগে বেরিয়ে আসে তাদের বলে ধ্যানে-বসা ছেলে। এরা নাকি সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়।"

ভয় দিদিমার সত্যিই ছিল। মাও নাকি কাঁদতো আমার কুষ্ঠিতে ছিল ব'লে যে আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে যাব। এত অপেক্ষা ক'রে মিলল যে ছেলে (মার বিয়ের দশ বৎসর বাদে আমার জন্ম) সে কি না সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে! এ কান্নার কাহিনী শুনতাম আমার আর এক মাসি স্বর্ণলতার কাছে যাঁকে মা পুষ্যি নিয়েছিলেন—যখন সবাই সাব্যস্ত করল মা বন্ধ্যা।

এহেন ছেলে মাতৃহারা। তার উপর দেখতে সুন্দর, তার উপর পুরাণ মহাভারতও

মুখস্থ, তার উপর এমন গায় গলা কাঁপিয়ে! আমি ছিলাম সারা বাড়ির আদুরে গোপাল। কাজেই মার অভাব বোধ করব কী ক'রে বলুন? খিদে থাকলে তবে তো খাবারের কথা মনে হবে?

যারা আদুরে হয় তাদের বদনামই আমরা বেশি শুনে থাকি। কিন্তু তা ব'লে একথা বলা যায় না যে আদুরে ছেলেদের সবই খারাপ। কেন না তারা দারুণ অভিমানী হয় ব'লে তাদের ঠেকানো সহজ – যেখানে অনাহূত সে-পাড়া দিয়ে তারা হাঁটে না। কিন্তু যারা ছেলেবেলা থেকে একটুও আদর পায় নি অনেক সময়েই তাদের অনুভবের ত্বক্ হ'য়ে দাঁড়ায় গণ্ডারের চামড়া এও তো দেখা যায়। আপনার নানা গল্পে এধরণের মানুষের ছবি ফুটেছে বড় সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের কাছে কত যে শুনেছি এ জাতীয় অতিথিদের অভ্যুদয় ও উপবেশনশীলতার করুণ কাহিনী! একটা গল্প বলার লোভ হচ্ছে—অবান্তর হ'লেও। বক্তা—শরৎচন্দ্র। বললেন আমাকে "জানো মণ্টু, রবীন্দ্রনাথ আমার পথের দাবীর ভূমিকা লিখলেন না এর কী ক'রে শোধ তুলেছি?"

"কী ক'রে?"

"কবি গি-র সঙ্গে দিয়েছি তাঁর আলাপ ক'রে।"

কিন্তু অভিমানী হওয়ার এ একটা সুফল আছে—ব'লে বলা চলে না যে কুফলও নেই। আমি আজ যখন পিছন দিকে চেয়ে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই কত ছেলে-মেয়ের মনে দুঃখ দিয়েছি—সময়ে সময়ে অজান্তে—যে দুঃখের উদ্ভব হ'ত না যদি আমি এতটা আদর না পেতাম সবার কাছ থেকে। এর অবশ্য চারা নেই। কিন্তু এছাড়া আর একটা কুফল আছে যা নিবার্য—অথচ নিবারিত হয় না প্রায়ই। সেটা হ'ল এই যে আদুরে ছেলেরা অনেক সময়ে অল্প বয়স থেকেই দলপতি টলপতি গোছের কিছু একটা হ'য়ে উঠতে চায়। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই ঘটত। ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই আমি নায়কতা করতাম, এমন কি বড়দেরও হুকুম করতাম—আর তারা তামিল করত। এতে আমি আশ্চর্য হ'তাম না—মনে হ'ত এ বুঝি আমার জন্মস্বত্ব। নৈলে কি আর ভালোমানুষ ভ্যাংচাকেও সাজা দিতে হয় তার বুকের উপর চেপে ব'সে? ভালোমানুষ বলছি এইজন্যে যে অন্তত আমার সঙ্গে লেনদেনে বেচারির অপরাধ ছিল না। সে শুধু আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসত ব'লেই নয় আমার হুকুম তামিল করা যে তার স্বধর্ম এ নিয়ে তার শিশু মনে সচরাচর প্রশ্ন পর্যন্ত উঠত না। কিন্তু শিশুও মানুষ তো? কাজেই মাঝে মাঝে কী করত বলি—তাহলেই বুঝবেন।

তখন কবির তারাবাই অভিনয় হচ্ছে। তারাবাই-ই কবির প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। আমাদের খুব উৎসাহ। পৃথ্বীরাজ কালীর মন্দিরে রাজদ্রোহী সারঙ্গদেবের

মুণ্ডপাত করবে দ্বৈরথ যুদ্ধে—ডুয়েল। আমি পৃথ্বীরাজ সাজবই, ভ্যাংচাকে সাজতে হবে সারঙ্গদেব। দর্শকের অভাব নেই ছোট ছোটরা থেকে আরম্ভ ক'রে বড়রাও দেখতে আসতেন। অথ, টিনের তরোয়াল বক্লশে ঝুলিয়ে পৃথ্বীরাজের প্রবেশ :

আমি (ওরফে পৃথ্বীরাজ) :

কালী ! জগদম্বা ! আজি করিব তোমার
পূজা নরবলি দিয়া। আমার অথবা
সারঙ্গদেবের মুণ্ড লোটাবে চরণে ইত্যাদি
সারঙ্গদেবের প্রবেশ—(অর্থাৎ
আমার মতনই একটি টিনের তরোয়াল ঝুঝিয়ে ভ্যাংচা।)

ভ্যাংচা (ওরফে সারঙ্গদেব) : কই বলি কই পৃথ্বী ?

আমি (খুব চেঁচিয়ে) : আছে বলি।

ভ্যাংচা (সত্যিই ভয় পেয়ে) : কই কিছুই দেখি না।

আমি (তরোয়াল ঝাঁ করে খুলে) :

হ্যাঁ আছে। সারঙ্গদেব ! বলি মাতৃপদে
তুমি কিম্বা আমি। ইত্যাদি
নিষ্কাশিত কর খড়্গ।

ভ্যাংচা (অগত্যা লাফিয়ে উঠে তরোয়াল খুলে কাঁপতে কাঁপতে)

উত্তম তাহাই হোক। অসি
কর মুক্ত। পৃথ্বীরাজ (চিঁ চিঁ ক'রে) রাখিও স্মরণে
আমি তব স্নেহাতুর কোমল-স্বভাব
অথর্ব পিতৃব্য নহি।
(বলতেই আমার হুংকারে আরও মিইয়ে গিয়ে)
দয়া করিব না
কঠিন কৃপাণ এই শোণিত-লোলুপ।

আমি (বজ্রনাদে) : রক্ষা করো আপনারে বিশ্বাসঘাতক ! ব'লেই উল্লম্ফন।

ভ্যাংচা ব'লে রেখেছিল অনেক কাকুতি মিনতি করে : বেশি জোরে লাফ দিস্ নে ভাই তাহ'লে যুদ্ধের আগেই ভয়ে প'ড়ে যাব। আমি তাকে কত আশ্বাস দিতাম—তবু তার ভয় কাটে নি পুরোপুরি—কে বলতে পারে, যদি সত্যিই টিনের তরোয়ালে গলা কাটা যায়—কারণ থিয়েটারে দেখাত সারঙ্গদেবের মুণ্ডপাত ! তাই আরো ও সারঙ্গ সাজতে চাইত না। নিতান্ত বাধ্য হ'য়েই আমার

হুংকারের উত্তরে চিঁ চিঁ ক'রে সাড়া দিত। তারপরই দুই টিনের তরোয়ালে খটাখট ও ভ্যাংচা ওরফে সারঙ্গদেবের পতন সবাইয়ের হাততালি কেবল সুষমার কোকিয়ে কেঁদে ওঠা : "ভ্যাংচা মরে গেল।" যত বলি "মরল সারঙ্গদেব", ও বলবে : "স্পষ্ট দেখলাম আমাদের ভ্যাংচা!—" ভয় পেয়ে প্রায়ই এইরকম গোলমাল করত ব'লে শেষে ওকে আর আসতে দেওয়া হ'ত না।

কিন্তু ভ্যাংচা বেচারির রোজই ধরাশায়ী হ'তে হ'বে, শেষটায় অবিচারের প্রশ্ন উঠল। বলল কাঁদ কাঁদ সুরে "রোজই আমি খুন হব কেন ভাই। এক একদিন তুইও হ।"

আমি (অবজ্ঞার সুরে) : কী? আমি খুন হব? পৃথ্বীরাজ কখনো খুন হয়? তারাবাই পড়িসনি? কেউ কি তাকে হারাতে পেরেছে যুদ্ধে?

ভ্যাংচা (লজিকের ইনস্পিরেশনে) : তা না হয় তুইই একদিন সারঙ্গদেব হ, আমি হই পৃথ্বীরাজ, তাহ'লে তো তুই খুন হবি?

আমি (গম্ভীর ভাবে) : সে কি হয়? তোকে কখনো পৃথ্বীরাজ পার্ট মানায়?

এতেই সে সময়ে সময়ে নিতান্তই প্রাণের দায়ে—বিদ্রোহ করত সারঙ্গদেব আর সাজবে না ব'লে। তখন একান্ত নিরুপায় হ'য়ে শুধু ডিসিপ্লিন বজায় রাখতেই তার বুকের উপর চেপে বসতে হ'ত :

বল্ সারঙ্গদেব সাজবি?

ভ্যাংচা (কেঁদে) : সাজব সাজব ভাই, ছেড়ে দে, কথা দিচ্ছি।

সুষমা কখনো কখনো থাকত কিন্তু এই ডিসিপ্লিনের দৃশ্যেও সে সমানই ডুকরে কেঁদে উঠত। তার মনটা ছিল যেমন নরম তেম্নি ভয়কাতুরে। প'ড়ে গিয়ে কারুর হাত পা কপাল বা চিবুক থেকে রক্ত বেরুলেও সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত আহত শিশুটি "ম'রে গেল রে" ব'লে। তাকে বিজ্ঞ ভাবে কত বোঝাতাম যে এর নাম অ্যাক্টিং সারঙ্গদেবের মুণ্ডু থিয়েটারেও কাটা যায় না—কেউ কেটেছে কি কোম্পানি তাকে ফাঁসি দিয়েছে। কিন্তু সে অত লজিকের ধার ধারত না। "মারামারি কাটাকাটি আবার কী খেলা ভাই?" বলত সে "আয় আমরা কানামাছি খেলি কিম্বা নেচে নেচে গাই :

'যা বিষ্টি ধ'রে যা লেবুর পাতা করমচা।"

ব'লে মিনতিভরা সুরে আমার হাত ধরত কত আদর ক'রে। আমি ঝাঁকিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলতাম : যাঃ। ওসব মেয়েলি।

তখন আমার বয়স সাত আট। ভ্যাংচা ছিল আমার চেয়ে ছ'মাসের ছোট, সুষমা ছ'মাসের বড়।

* * *

তবে মিথ্যা বলা পাপ। বীরত্বের আদর্শে আমার স্খলনও হ'ত সলজ্জে স্বীকার কচ্ছি। মেয়েলি খেলাও আমি খেলতাম সময়ে সময়ে—সে শুধু সুষমার কয়েকটি সখী এলে। তাদের মধ্যে একজনের মুখখানি অল্প অল্প মনে আছে—সে ছিল বড় সুন্দর। কিন্তু তার নাম মনে নেই। তারা নেচে নেচে নাইত গোল হ'যে হাত ধরাধরি ক'রে—আমি যোগ দিতাম: "Here's the robber passing by" পরের লাইনগুলো মনে নেই।

* * *

কিন্তু এ ধরণের মেয়েলিপনার পরেই বীর বালকের ফের জাগত অনুশোচনা। কারণ ছেলেবেলা থেকে এই মেয়েলি সব কিছুর উপর অবজ্ঞা সত্যিই বদ্ধমূল হ'যে গিয়েছিল। তার একটা কারণ বড় বিচিত্র: সেটা হচ্ছে এই যে আমি সহজেই মেয়েদের প্রিয়পাত্র হ'তে পারতাম। জীবনে যা আমরা না চাইতেই পাই তার প্রতি হয়ত একটু অবজ্ঞাই জন্মে যায় অজ্ঞাতে। পর জীবনে আমার এ মনোভাবের বদল হয় যখন বুঝি জীবনে মেয়েদের দান কত বড। তখন আরো উপলব্ধি করি মেয়েদের সম্বন্ধে কবির শ্রদ্ধার মূল্য। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আমার বাল্যকালে আমি দেখতাম কবি পুরুষ মানুষের পক্ষে মেয়লি কোমলতা, ঢংঢাং অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। এ থেকেই হয়ত প্রথম দিকে আমার মনে মেয়েদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা মতন এসে থাকবে। বালক বয়সে বোঝা যায় না স্বধর্মের রহস্য। মেয়েদের কাছে মেয়েলি স্বধর্ম—তাই সুন্দর, পুরুষালি বিধর্ম তাই ভয়াবহ। পুরুষের কাছে "প্রতিজ্ঞাটা" উল্টে বলা দরকার।

কিন্তু মেয়েদের—মানে কম বয়সের মেয়েদের—'পরে আমার প্রথম শ্রদ্ধা হয় বোধহয় বড় মামিমার চরিত্র-গুণে। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে কমই দেখেছি। কী বিবেচনা! এত অল্প বয়সে গরিবের ঘর থেকে এসে তিনি ধনীর গৃহে কী ক'রে এত সহজে স্থান ক'রে নিলেন ভাবতে আজও আশ্চর্য লাগে। তবে এর একটা কারণ, তিনি ছিলেন খুব ভালো বংশের মেয়ে—গরিব হলে কী হয়। তাই ধনের অভাব তাঁর স্বভাবের আভিজাত্যকে এতটুকু টস্‌কাতে পারে নি। আত্মসম্ভ্রম নিটোল রেখেও কী যে নম্রমুখী ছিলেন তিনি!

কবি এই জন্যে তাঁকে ভালোবাসতেন। মাসিমায়েদেরও তিনি খুবই ভালোবাসতেন

কিন্তু মাসিমারা তাঁর কাছে ছিল বোনেরও বাড়া প্রায় কন্যাস্থানীয়া। বেশ মনে আছে মার অকালমরণের দু একবৎসর পরেই দিদিমা তাঁকে বলেন রাধারাণী মাসিমাকে বিয়ে করতে। বলেছি, তিনিও ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু কবি হোহো ক'রে হেসে উঠলেন : "ওকে যে চিরদিন নিজের মেয়ের মতন ভেবে আদর ক'রে এসেছি মা, এখন বিয়ে করব কী বলছেন ?"

দিদিমা বিস্মিত সুরে বলতেন : "তাতে কী ? মেয়েছেলে দুদিনে বড় হ'য়ে যায় তাছাড়া মন্টু মায়াকে দেখবেই বা কে বলো ? সংসারটার দিকেও তো চাইতে হবে। এত টাকাকড়ি তোমার"—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কবি কেবল হাসতেন। আর এ ভাব তাঁর একতরফা ছিল না। তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা সদাশিব খোলাখুলি ভাব ছিল যে আমার মাসিমারা আজও বলেন জল-ভরা চোখে : "দ্বিজদাকে আমরা কোনো দিন ভগিনীপতি ভাবি নি, ভাবতাম বড় দাদা—অভিভাবক।"

কিন্তু তিনি প্রকৃতিতে ছিলেন হিন্দু। তাই—মার জীবদ্দশায়—শালীদের সঙ্গে আদিরসাত্মক রসিকতাও করতেন বৈ কি কিন্তু সে রসিকতা এত অনাবিল, এত সহজ যে শুচিব্রতীদের ছাড়া আর কারুর কানে কুরুচি মনে হ'ত না। একটি উদাহরণ দেই। এ থেকে আমার মাসিমাদের ছবি ফুটে উঠবে ব'লেও বটে। এ কবিতাটি মেশো প্রায়ই আওড়াতেন :

কমলিনী মোহিতকুমারী কমলা সুষমাকে লক্ষ্য ক'রে :—

বিবাহ উপরিলভ্য আমার অষ্ট শ্যালিকা।
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দেখতে শুনতে খাসা আছে।
আটটির মধ্যে চারটি কিন্তু একান্তই বালিকা।
নিতান্ত নগণ্য—কিন্তু ভবিষ্যতের আশা আছে।

স্বর্ণলতা ওরফে ফুলমাসিমাকে লক্ষ্য ক'রে :—

বয়স্থা শালীদের মধ্যে চতুর্থ টি, সে চারি
ছোটবোনের দিদি—যদি নিচের থেকে ধরা যায়।
নিতান্তই অবলা এবং নিতান্ত গোবেচারি
কর্তব্য হিসেবেই শুধু ঠাট্টা আশটা করা যায়।

রাধারাণী ওরফে নমাসিমাকে লক্ষ্য ক'রে :—

তৃতীয়টি স্বভাবতই চপলা ও মুখরা,
মিষ্টর চেয়ে তীব্রভাবটাই বেশি, যদি খোঁজা যায়।

রূপে গুণে কথার ধারে যেন হীরের টুকরা।
ঠাট্টাগুলো কর্ণে না হোক, কর্ণমূলে বোঝা যায়।

স্নেহলতা ওরফে সেজমাসিমাকে লক্ষ্য ক'রে :—

দ্বিতীয়টি শান্ত শিষ্ট স্বল্প মিষ্টভাষিণী,
কিন্তু তিনি তাহার একটি চাহনিতেই জয় করেন।
মনে ভালোবাসেন যখন মুখে বলেন 'বাসিনি'
আর বলতে কি, আমার স্ত্রীটি তাঁকেই একটু ভয় করেন।

সুশোভিনী ওরফে মেজমাসিমাকে লক্ষ্য ক'রে :—

প্রথমাটি অর্থাৎ আমার স্ত্রীরই যিনি কনিষ্ঠ,
দস্তুর ম'ত তিনিই আসল শালীর মতন বটে বেশ।
তাঁহার সঙ্গেই সম্বন্ধটা আমার একটু ঘনিষ্ঠ
এবং সব বাক্যামোদে তাঁহার সঙ্গেই পটে বেশ।

আজো মনে পড়ে মাসিদের মুখে সে প্রীত প্রসন্ন লজ্জার ভাব যখন সর্ব সমক্ষে কবি এই ধরণের ঠাট্টা করতেন অট্টহাস্য ক'রে। এই সহজ প্রাণখোলা রসিকতার ভাবটা আজকাল উঠে গেছে রুচিবাগীশদের দুর্দান্ত সুরুচিয়ানার চাপে। আমি কিছুতেই মানতে পারি না যে এধরণের রসিকতা খারাপ। আমার দিদিমা সম্পর্কীযারা প্রায়ই আমাকে "বর" ডাকতেন। দাদামহাশয়েরা মাকে কনে ডাকতেন। এতে অশ্লীলতা কোথায়? আমার সময়ে সময়ে এখনো রাগ হয় ভাবতে যে বিলিতি পিউরিটানিসমের আবহাওয়ায় আমরা সাধ করে এমন একটা সুন্দর রসাল রসিকতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। মনে আছে কবি মাকে নিজে ঠাট্টা করতেন আমাদের দিদিমার এক সুদর্শন মামাতো ভাইকে নিয়ে "উঃ বরের সঙ্গে কথায় খুব যে হাসি" ব'লে। যেখানকার যা সেখানে সেটি বেমানান হয় কখনো? এসব রসিকতায় যাঁরা অশ্লীলতার আপত্তি তোলেন, জানবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের মনে পাপ আছে। একথা আমি ফিরিয়ে নেব না কিছুতেই।

*　　*　　*　　*

তবু মাসিমাদের সঙ্গে কবির যে ধরণের সম্বন্ধ ছিল মামিমার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল তার চেয়েও মধুর। মামিমার যখন বিয়ে হয় তখন তিনি নিতান্ত কচি ছিলেন একথা প্রথমেই বলেছি। সেই আমাদের বাড়িতে প্রথম এল "পরের মেয়ে"। এ আগমনের মাধুর্য তাই কবির চোখে অপরূপ হ'য়ে উঠেছিল। কারণ শ্বশুরবাড়ী তাঁর কাছে

নিজেরই বাড়ি ছিল, তিনি ছিলেন শ্বশুরের জামাই তো না - জ্যেষ্ঠপুত্র তথা বন্ধু। মামিমার কান্না আজো মনে আছে বাপের বাড়ি থেকে আসার সময়ে। বড়মামা ফিটনে ক'রে আসবার সময়ে আদর ক'রে নববধূর চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন—আরো অনেক কিছু। তখন আমার বয়স ছয় বৎসর। তাই মামা ভাবেন নি আমি দেখেছি সব বা বুঝেছি কিছু! এ নিয়ে পরে মামিমাকে ঠাট্টা করেছি কত দিন। মামিমার সুন্দর মুখ প্রথম প্রথম লজ্জায় লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠত: "যাঃ ফাজিল ছেলে মা মাসির সঙ্গেও এই সব ঠাট্টা!" কিন্তু আমি এ দীক্ষা পেয়েছিলাম কার কাছে সেটা বুঝবার পরে তিনি আর তত আপত্তি করতেন না আমার ঠাট্টায় - শুধু হেসে আমায় বুকে টেনে নিতেন। বুঝেছিলেন ঠাট্টা তামাশায় এ বাড়িতে আপত্তি নিষ্ফল।

কবি বড় মামিমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন আরো একটি কারণে যে মামিমার বাবা ছিলেন বহু পূর্বে কবির সহপাঠী। তাই বন্ধুকন্যাকে নিজের কন্যার চোখে দেখা তাঁর পক্ষে কঠিন হয় নি। মামিমা আজও প্রায়ই বলেন: "দ্বিজদাকে আমরা ভাবতাম নিজের বাবার মতন—নন্দাই ভাববার কথা মনেও হয় নি।" কবিকে সত্যি মামিমা যত ভালোবেসেছিলেন তত ভালো যে আমার মাসিমারাও বাসতে পারেন নি সে হয়ত এই জন্যেই। কবির স্নেহ-কোমল চিত্তেও অশ্রুমুখী নববধূর মুখখানি গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল সেই বিবাহের রাত্রে। তাই পরে একটি বিবাহের পদ্যে লিখেছিলেন (কৃষ্ণনগরের মহারাজার—ত্রিবেণী):

ভাই ধরো এ রত্নে হৃদয়ে যত্নে
রেখো তারে সমাদরে
ঘর ছেড়ে আজ পরের মেয়েটি
আসিছে তোমার ঘরে।

বড়মামিমা কবিকে এত আপনার মনে করতেন আরো এই জন্যে যে তিনি যে বাপের বাড়ির অভাব বোধ করতেন এতে কবি রুষ্ট তো হ'তেনই না বরং তুষ্টই হ'তেন। মেয়ে বিবাহের পরে দুদিনেই বাপ মাকে ভুলে যাবে এইটেই তাঁর কাছে অন্যায় মনে হত। মামিমা খুব বেশি ভালবাসতেন তাঁর বাবাকে, আর বিয়ের পরেও সে ভালোবাসা কমেনি একথাটার মানে আপনি বুঝবেন আশা করি? দেখবেন, উদারচরিত হ'তে চেয়ে বলে বসবেন না কিন্তু যে সে তো সব মেয়েই বাসে। বললে আমি এ ঔদার্যে একটুও অভিভূত না হয়ে শুধু বলব যে, না। সব ছেলেমেয়ে বাপমাকে সমান ভালবাসে না, বাসতে পারে না—যেহেতু এই চলতি ধারণাটাই ভুল যে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার সম্বন্ধ প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক ধরণের। তাই দেখা যায়

যে, সব মেয়েকে সমান বাজে না বাপের বাড়ির সঙ্গে ঘর সম্বন্ধ তুলে দিতে। মামিমাকে বাজত বলে ডবল দুঃখ পেতে হ'ত, কারণ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভালো বউ বলে তাকেই, যে বিয়ে হ'তে না হ'তে বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে পারে হাসিমুখে। মামিমাকে এইজন্যে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে, যে জন্যে কবি তাঁকে একটু বেশি স্নেহ করতেন এবং নিতান্তই বালিকা জেনেও ছড়া লিখতেন যখন মাসিমা প্রথম প্রথম একটু ঘোমটা টানতেন :

(যদি) দেখতে চাই ও মুখখানি ঘোমটায় তারে কেন ঢাকো
(যদি) কাছে রৈলে সুখ হয়, কেন আড়ালে আড়ালে থাকো ?
আড়াল থেকে কেন শুনি চুড়ির মধুর ঠুনঠুনি ?
কাছে এসে বোসো—না হয় মিষ্ট ডাকে না-ই ডাকো।
হই কি না হই মনের ম'ত দেখে যাও না চাও গো যত
হ'লেই সেটা উভয়ত— কোনো আপশোস থাকে না কো।
কহেন কবি করুণ পদ্যে : "গান শুনতে চান বাড়ির মধ্যে ?
দুশোটা গান গাইতে পারি যদি শ্রীচরণে রাখো।"

মামিমার লজ্জা কেটে যেতে অবশ্য বেশি সময় লাগে নি। কারণ তিনি কবিকে "নন্দাই" ভাবতেন না, ভাবতেন গুরু, দাদা। আর ঠাট্টা ক'রেই কবি মামিমাকে এত সহজে কাছে টেনে নিয়েছিলেন—যে কথা মামিমা আজো বলেন চোখের জল ফেলে।

কবিকে তিনি এত আপন মনে করতেন যে সময়ে সময়ে খুব দুঃখ পেলে কি দাম্পত্য-কলহ হ'লে আমাদের সুরধামে এসে আশ্রয় নিতেন। তখন আমার পনের বৎসর বয়স হবে কাজেই খুব স্পষ্ট মনে আছে। বেচারি মামা আসতেন গুটি গুটি কয়েক ঘণ্টা বাদেই। বলতেন সলজ্জভাবে : "বৌ! চলো।" মামিমা (মুখ নিচু ক'রে ঘোমটার মধ্যে থেকে সাভিমানে) : "না আমি দ্বিজদার কাছেই থাকব।" কবি (হো হো ক'রে হেসে) : "তা কি হয় বৌ ? মুখে বৌ বলি তাইতেই ভয় করে, সত্যি হ'লে কি আর রক্ষে আছে ?"—মামিমা (আরো লজ্জিত সুরে) "কী যে বলেন দ্বিজদা !"—যাহোক এম্নি ক'রে দাম্পত্য কলহের অবসান হ'ত কবিরই মাধ্যস্থ্যে : মামিমা শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতেন—জলভরা চোখে কবিকে গভীর ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে। শুধু ভক্তিই না। কবির প্রতি তাঁর ছিল একটা বড় সুন্দর কোমল করুণা "আহা" ছিল যার বীজমন্ত্র। বলেছি, কবি শেষ বয়সে সাহেবিয়ানা ছেড়ে একেবারে বৈষ্ণব ব'নে গিয়েছিলেন। সে ফিটফাট ধোপদুরস্ত বেশ ভূষা ছিল না। খালি গায়েই

বারান্দায় বেড়াতেন গুন্ গুন্ ক'রে গান বাঁধতে বাঁধতে। আর মাঝে মাঝে খুব পা চুলকোতেন। কী খড়িই যে উঠত! শাদা হ'য়ে যেত সারা পা।

এম্‌নি সময়ে, হয়ত বা খালি পায়েই, চ'লে গেলেন সটাং বড় মামিমার কাছে: "বৌ একটা কী চমৎকার গানই বেঁধেছি—শেখো শেখো।"

ঐ দেখুন, আসল কথাটাই বলা হয় নি। বড় মামিমা সুন্দর গাইতেন। কণ্ঠ একটু ভাঙা ভাঙা ছিল, কিন্তু বড় মিষ্ট ও সুরেলা। সবচেয়ে ভালো গাইত আমার রাঙা মাসিমা মোহিতকুমারী ও ছোট মাসি তমালিনী। কিন্তু তারা তখনো গান শিখত না—তমালিনী তো তখন খুবই কচি। শিখতেন প্রধানত মামিমা আর আমার মেজমামা। ভ্যাংচারও কণ্ঠস্বরের জৌলুষ ছিল। তবে সে ছিল না-শিখে-পণ্ডিত—শুনে শুনেই চেঁচাত—কথা সব উল্টো পাল্টা ক রে কিন্তু সুর ঠিক রেখে। কবির গিরি গোবর্ধন গানটির সে যে কী হাল করত! কবি হয়ত গাইছেন বড মামিমার সঙ্গে: তাঁর নিজের লঘুগুরু সংস্কৃত ছন্দে রচিত কৃষ্ণ-স্তব "প্রেম নিমীলিত, নয়ন বিলোল, কদম্বতলে বনমালী।" ভ্যাং-চা তারস্বরে গাইবেই: 'প্রেম নিমীলিত নয়ন বিলোলত, দম্ব তলে বনমালী।"

কিন্তু মামিমা ছিলেন কবির অনুগত শিষ্যা। কথা সুর দুয়েই ছিলেন তিনি নিখুৎ। তাঁর মুখে কবির গান "একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি," "একটু আলো একটু আঁধার একটু সুখ ও একটু ব্যথা," "জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়," "আজি তোমার কাছে ভাসিযা যায় অন্তর আমার" আরো কত গান যে শুনতাম।

গতবছর যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, বড় মামিমার কাছে একদিন আমি ও ধীরেন * গিয়েছিলাম। ধীরেন কেবলই মামিমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে—"বলুন তাঁর কথা।" তাকে মামিমা ছলছল চোখে বলতে লাগলেন—গভীর ভক্তির সুরে আর ধীরেন শুনতে লাগল—যে কী মুগ্ধ হ'য়ে!

মামিমার কথা একটু তাঁর ভাষায়ই বলবার চেষ্টা করি না কেন, "সে আর তোমাকে কি বলব ভাই ধীরেন! অমন মানুষ আর দেখলাম না। কী আনন্দময় পুরুষই যে ছিলেন দ্বিজদা! যেখানে যেতেন আনন্দের প্লাবন যেত ব'য়ে। আর কী উদাসী

* কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লালগোলার হবুরাজা। কবির এতবড় ভক্ত জীবনে কমই দেখেছি। তাঁর নাটক গান এঁর প্রায় মুখস্থ বললেই হয়।

উদার প্রাণ। থেকে থেকে গুন্‌গুন্ করতে করতে হঠাৎ এসে হাজির—'বৌ। আর একটা গান বেঁধেছি।'

'আমি : 'কিন্তু একী— পায়ে ও কী ?'

'দ্বিজদা (কাতরস্বরে) : খড়ি উঠেছে।

'আমি - দাঁড়ান ব'লেই একবালতি গরম জল এনে অনেকক্ষণ ধ'রে পায়ে তেল লাগিয়ে সাবান দিয়ে ধুইয়ে দিই তবে পা-টা পরিষ্কার দেখায়। কত কাদাই যে বেরুল! যখন সাফ হ'যে গেল বললেন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে : 'তাই তো। প্রায় ভদ্দর লোকের পা বলে ভুল হচ্ছে!' ব'লেই সে কী হাসি হো হো ক'রে! অমন সরল প্রাণখোলা হাসি আর শুনলাম না—আর ঐ গিরিশদার। ওঁরা ছিলেন দুই ভাই—এক মায়ের পেটের, সত্যি বলছি ধীরেন।

"কখনো হয়ত দেখি—দুপায়ে দুটো চটি। 'এ করেছেন কী দ্বিজদা ? কার চটি?' তিনি চেয়ে দেখেন দুপাটির এক পাটিও তাঁর নিজের নয়। কোথায় গিয়েছেন ফেরবার সময় দুজনের দুপাটি চটি দুপাযে দিযে এসেছেন বেরিয়ে হয়ত গান বাঁধতে বাধতেই—কে জানে ?

"কখনো গান শিখিয়ে বেরিয়ে গিযে রাস্তা থেকেই বৌ—দেখ তো আমার জুতো কোথায় ? রাস্তায় পৌঁছে তবে নিজের খালি পা চোখে প'ড়ে ঠাকুরের জুতোর জন্যে টনক নড়েছে। তখন সে কী কাণ্ড! সারা বাড়ি সরগরম। খোঁজ খোঁজ! আর খোঁজ! জুতো স্রেফ্ লোপাট। সে কী! এই জুতো ছিল—উবে গেল!! শেষটা দেখা গেল নিচে স্নানের ঘরে হাত ধুতে গিয়েছিলেন সেখানেই জুতো প'ড়ে রয়েছে। জুতো পায়ে দেওয়া তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন কি না তাই জন্যেই হ'ত প্রায় এধরণের জুতোবিভ্রাট।

"কখনো পকেটে হাত দিযে—'ঐ যাঃ। দশটাকার দুটো নোট ছিল!'—'সে কি দ্বিজদা!'—'আর সেকি—গাঁটকাটা' বলেই একগাল হেসে : 'কিন্তু তার মধ্যে একটা নোট এত ময়লা যে কেউ নেবে না। কেমন জব্দ।' ব'লে কী আনন্দ। আমরা তো হেসে কুটিকুটি।

"কখনো হঠাৎ নাচের সাধ হ'ল। আমরা সব দোর বন্দ ক'রে দিলাম। আমার তিন চারটি ননদ গিরিশদা ও দ্বিজদা ঘোমটা প'রে নৃত্য। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না ধীরেন।

"কখনো হাসির গান। তিনি গাইবেন গিরিশদা ও আমরা কোরাস দেব—'হ্যাঁ তা বটেই তো তা বটেই তো।' সে একদিন গিয়েছে ভাই ধীরেন। জীবনে এমন আনন্দময় পুরুষ একটা আবির্ভাব, ভাই, সত্যিই আবির্ভাব।

"আর সে কী স্নেহ। এতটুকু স্বার্থ ছিল না। কিছু চাওয়া নয় শুধুই দেওয়া—বিলিয়ে দেওয়া—হাসি গান, মজার গল্প—সবচেয়ে বড় তাঁর উদার হৃদয়ের দরদ। বুঝতেন তিনি মেয়েদের ব্যথা। গিরিশদাও। ঐ দুটি মানুষ যেন ছিলেন এক ছাঁচে ঢালা। এমন জুড়িও কি চোখে পড়ল ?—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে- আমাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা ধীরেন, তাঁদের পবিত্রতা। আজকালকার মানুষের মধ্যে এ পবিত্রতার লেশও দেখতে পাই নে। তাই নেই তাদের আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা। তারা চায়- দেবে কোত্থেকে! মিশতে পারবে কেন মেয়েদের সঙ্গে—আর মিশতে এলেই বা মেয়েরা চাইবে কেন মিশতে! মেয়েরা টের পায় ধীরেন, কোথায় ভালোবাসা পবিত্র আর কোথায় কলুষ এসে লাগে। মেয়েদের মধ্যে দ্বিজদা বা গিরিশদার যে অবাধ ছাড়পত্র ছিল তার কারণ এই পবিত্রতা। এমন পবিত্রতা আজকাল দেখা যায় না। পবিত্রতাও একটা প্রতিভা।"

এই প্রতিভার প্রেরণাতেই লিখেছিলেন তাঁর তেজস্বী পৌরুষে একটি রূপসী নর্তকীর নাচ দেখতে দেখতে :

"গুণপনা আছে মাথায় ক'রে লব
কিম্মৎ পাবে নাইকো ভাবনা
তবে তুমি আমায় পাবে না হৃদয়ে
তোমার হৃদয় আমি পাব না।
দেখতে ভালো যাহা দেখতে ভালোবাসি
শুনতে ভালো যাহা শ্রাব্য সে,
কিন্তু জেনো মিষ্ট ছন্দোবন্ধ হ'লেই
হয় না কোনো কালেই কাব্য সে।
কাছাকাছি বটে ব'সে আছি তোমার,
কিন্তু দূরে অতি—অন্তরে,
আমার কাছে গ্রীক কি হিব্রু ভাষায় লেখা
তোমার ও হৃদয়গ্রন্থ রে।
ভালোবাসা চাহে ভালোবাসা—আর
কামী চাহে শুধু কামিনী
কামের গোলাম হব, এখনো হে নারী
এত নিচে আজো নামি নি।"

এই নির্লিপ্তির কথাই বলেছিলেন বড় মামিমা। অন্য অনেক মেয়ের কাছেও শুনেছি তাঁর মধ্যে এই দূরত্বের কথা। ভালোবাসা যেখানে নেই সেখানে তিনি রক্ষা করতেন তাঁর সহজ অভিজাত্যের দূরত্ব কিন্তু যেখানে ভালোবাসতেন সেখানে তিনি নত হ'তেন অকুণ্ঠেই। বলেছি রাঙা জ্যেঠামহাশয়দের ছোট মেয়ে প্রতিমা "ছোটকাকা" বলতে ছিল অজ্ঞান। তার কাছে তিনি যেন থাকতেন কেনা হ'য়ে। অথচ কত বড় বড় সভা থেকে আসত তাঁর নিমন্ত্রণ তিনি যেতেন না, এও তো স্বচক্ষেই দেখেছি —বারবার!

* * *

নবম উল্লাস

শুধু ঘরোয়া কথা বলার আত্মতৃপ্তির জন্যে এ সব লিপিবদ্ধ করছি ভাববেন না। এসব কাহিনীর তলেই ঐ কবি উদাসী মানুষটির প্রভাব চলেছিল অন্তঃশীলা ধারায় এইটে বোঝাতেই এতশতর অবতারণা। তাঁর নাটক তাঁর গান, তাঁর শিষ্যশিষ্যা শালী-শালাজ-শালা সবাই তাঁর চারদিকেই দানা বেঁধেছিল যেন। এটা হয়েছিল দুটি টানে: তাঁর কবিত্বের, আর তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাবের আশ্চর্য সরলতা যার গুণে অপরে উপাধি কাটিয়ে মানুষটাকে ছুঁতে পারত সহজেই। এ শ্রেণীর সরলতা আমি জীবনে আর দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না—কেবল মেশোর ক্ষেত্রে ছাড়া। তবে বলাই বেশি যে মেশোর ব্যক্তিস্বরূপও আশ্চর্য জোরালো ও সরল হ'লেও তিনিও প্রধানত কবিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কবির শক্তিমত্তা, পবিত্রতা, আনন্দময়তা সব থেকেই তাঁর সবল প্রাণশক্তি রস টেনে নিয়েছিল। এতে তাঁকে খাটো করা হচ্ছে না– বড়ই বলা হচ্ছে। কারণ বড় প্রভাব বিনা বাঁচা মানে (কবির ভাষায়) জীবন শুধুই জীবন ধারণ।" প্রতি বরেণ্য বিকাশই আঁধারের পিছুটান কাটিয়ে আলোর সরিক হ'তে যাওয়ার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই রাসেল তাঁর একটি চিন্তাপূর্ণ বইয়ে লিখেছেন যে বড় মানুষকে তার যুগ তৈরি করে একথা পুরোসত্য নয়—বড় মানুষও তার যুগকে তৈরী করে নেয় অনেকখানি। সে প্রস্তুতির খানিকটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে কিন্তু অনেকখানিই প্রচ্ছন্ন থাকে। বলতে কি একটা বড় ব্যক্তিস্বরূপ – পার্সনালিটি —কেমন ক'রে গড়ে ওঠে ও কেমন ক'রে সক্রিয় হয় তার হদিশ পাওয়া প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি। কারণ শুধু তার কীর্তিকলাপ দিয়ে গোটা মানুষটাকে মাপা যায় না—তার ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্র পরিমণ্ডলের খবর খানিকটা অন্তত রাখা চাই। কিন্তু থাক এ-তত্ত্বকথা, কবির গানের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

বড়মামিমা যে কথা সেদিন ধীরেনকে বলেছিলেন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য: কবির ব্যক্তিস্বরূপের আকর্ষণী শক্তির উৎসমূল নিহিত ছিল তাঁর আনন্দময় পরিমণ্ডলেই বটে। সব বড় স্রষ্টার মধ্যেই থাকে এই আনন্দদায়িনী শক্তি—কিন্তু তাঁদের সবার চরিত্রের মধ্যে থাকে না ব্যাপকতা, প্রসার। যেমন ধরুণ শরৎচন্দ্র। কবির মতন বহুমুখী না হ'লেও তাঁরও প্রতিভা ছিল অলোকসামান্য একথা তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু যাঁরা দুজনকেই কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের প্রাণশক্তি কবির মতন স্বভাব-দরদী হ'লেও তাঁর মতন স্বতোবিশাল ছিল না। অপরূপ ছিল

তাঁরও চরিত্রমাধুর্য—হাসিতে গল্পে তিনিও ছিলেন একজন 'ওস্তাদ আলাপী। কিন্তু অমন উদার বা বহুপ্রসারী ছিল না তাঁর প্রভাবের মধ্যমণির জ্যোতি। আলো দিত সে-ও বটেই তো। কিন্তু তাতে কাটত না বিষাদ। দুঃখ শোকের গভীর অতলে যে একটা করুণ সুষমার মায়া আছে তার তত্ত্ব হয়ত শরৎচন্দ্র কবির চেয়ে বেশি নিপুণভাবেই ফুটিয়েছেন কিন্তু যে আনন্দ দম্‌কা হাওয়ার মতন বহুনিশাসঞ্চিত জমাট আঁধার দূর করে তার শক্তি ছিল না তাঁর আয়ত্তাধীন। অনেক বিষয়ে কবির চেয়ে তিনি বেশি নিপুণ তুলি দিয়ে আঁকতে পারতেন—মানুষের চরিত্রের নানা অসঙ্গতি, স্বতোবিরোধ কত কী। কিন্তু সুখের প্লাবন বইয়ে দিতে পারতেন না একটি অট্টহাস্যে বা উজ্জ্বল রসিকতায়।

তাঁর এই আনন্দদায়িনী শক্তির একটি আশ্চর্য বিকাশ হচ্ছিল ব্যাপকতার দিকে যে-শক্তি প্রায় শিখরে উঠেছিল তাঁর "পূর্ণিমা মিলন" রসোৎসবে। সে-আনন্দের মধ্যে যে কী আশ্চর্য্য জাদু ছিল সে তাঁরা কল্পনা করতেও পারবেন না যাঁরা এ মধুর স্নিগ্ধ আসরটির সঙ্গে সংস্পর্শে আসেন নি। সাহিত্যিকদের নিয়ে প্রতি পূর্ণিমায় কোথাও না কোথাও একত্র হওয়া এই ছিল কবির বাসনা। শুধু খোসগল্পের আড্ডা নয়। সে তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—সবাই তো এক একটা আড্ডা গ'ড়ে তোলে। সে-আড্ডার চারদিকে আনন্দের ফুলফল লতাবিতান রচবে বঙ্গবাণীর আশিসধারা—এই-ই ছিল কবির স্বপ্ন। কিন্তু এধরণের সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হ'ল কোনো বড় প্রাণশক্তি। তাই কবি বিনা পূর্ণিমায় সাহিত্যিকদের যে মিলনোৎসব পরে দেখেছি—এখানে ওখানে সেখানে—সে সব উৎসবে আসল জিনিসটি বাদ প'ড়ে গেছে : সেই প্রাণশক্তির ডাক যা নানা সাহিত্যিকের প্রাণশক্তি নিয়ে আনন্দ-উৎসবের মালা গেঁথে তোলে। মনে পড়ে পূর্ণিমা-মিলনের উদ্বোধন সঙ্গীত যা কবি প্রথম পূর্ণিমা মিলনের রাতে গেয়েছিলেন আমরা ছিলাম তার দোয়ার—সবাই—গিরিশ মেশো ছিলেন এ সংকীর্ত্তনের আর একটি প্রায় মূল গায়েন বললেই হয়। গানটির সবটিই উদ্ধৃত ক'রে দিই কারণ এ থেকে তাঁর নিবিড় প্রাণানন্দের আদর্শটি এমন ছবি হ'য়ে ফুটেছে হাসিতে দরদে সৌভ্রাত্র্যে!—

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ

(হেথায়) আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন॥
(হেথায়) সাহিত্যিক সব ছোট বড় এইখানেতে হ'য়ে জড়ো
(সবাই) আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কালহরণ,
(হোকনা) ধনী, গরিব, বড়, ছোট—সবার হেথায় একাসন।
(নয়) ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ॥

(হেথায়) হবে না কো ঐতিহাসিক গবেষণার কোনো ক্লেশ।
(হেথায়) হবে না কো বক্তৃতা—কি যুক্তিশূন্য উপদেশ।
(আমরা) আসিনিক জারিজুরি করতে কোন বাহাদুরি,
(আমরা) আসিনিক করতে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন,
(হেথায়) নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্মনিবেদন।
(নয়) ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ ॥
(যাঁদের) আছে কিছু ভায়ের প্রতি মাতৃভাষার প্রতি টান,
(তাঁদের) করতে হবে পরস্পরে প্রীতিদান ও প্রতিদান।
(হেথা) অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা করতে হবে,
(শুনুন) এটা হচ্চে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
(দোহাই) ধরবেন না কেউ—হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।
(নয়) ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।

এ গানটি যখন গাওয়া হ'ত—প্রায় প্রতি সম্মিলনীতেই এটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল পূর্ণিমা সম্মিলনীর 'বন্দেমাতরম্'—তখন সে যে কী আনন্দের হিল্লোল বইত সে সত্যি ভাষায় বর্ণনীয় নয়। কারণ তার মূল ছিল কবির ব্যাপক চরিত্রপ্রভাব। এ-প্রভাব যখন ধীরে ধীরে বাড়ছিল তখনই কাল তাঁকে আমাদের সাহিত্যসমাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—যার ক্ষতিপূরণ মেলে নি, মিলতে পারে না, কেন না এমনধারা অফুরন্ত প্রাণশক্তি বোধ হয় প্রতিভার চেয়েও বিরল।

এ প্রভাব সবচেয়ে বেড়ে উঠেছিল যখন শেষ বয়সে তিনি "সুরধাম"-এ এসে বাস করেন। তখন তাঁর গানে একটা ব্যাপক সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল শুধু কলকাতায় নয়—সারা বাংলায়। গ্রামে গ্রামে তাঁর "ধনধান্য পুষ্পভরা" গাওয়া হ'ত—নানা সভায় তাঁর স্বদেশী গান—নানা উৎসবে তাঁর আবৃত্তি নাটক প্রহসন—সে সত্যি একটা আশ্চর্য জাগরণের মতন। এ ছাড়া কত অধ্যাপক ছাত্ররা আসত তাঁর কাছে গান শিখতে, তাঁর নাটকের নানা ভূমিকায় অভিনয়ে নির্দেশ নিতে। শিশির ভাদুড়ি মহাশয়কে সেই সময়ে আমি প্রথম দেখি—যখন তিনি আসতেন চাণক্য ভূমিকার মহলা দিতে কবির সামনে। কবি একজন বড় অভিনেতাও ছিলেন কি না, তাই তাঁর নানা নাটকের ভূমিকা তিনি আবৃত্তি ক'রে দেখিয়ে দিতেন কোন্ অংশ কী ভাবে অভিনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। থিয়েটারের খ্যাতনামা অভিনেতারা যেমন দানি বাবু অমর দত্ত অমৃত মিত্র প্রভৃতিও আসতেন পার্ট বুঝতে। এছাড়া রঙ্গমঞ্চের স্বরলিপিকারেরা তো থাকতেনই

তাঁর গানগুলির স্বরলিপি ক'রে নিতে। তাঁদের চোখে মুখে সে কী সম্ভ্রম! কবিকে তাঁরা সবাই মনে করতেন যেন একটা উচ্চতর গ্রহের নায়ক।

এর পরে সে আর-এক তুমুলকাণ্ড—গ্রামোফোনে তাঁর প্রথম গান দেওয়া। আমার দুঃখ রইল কবি তাঁর স্বদেশী গান বা প্রেমের গান না দিয়ে দিলেন শুধুই হাসির গান। কিন্তু তাইতেই ওরা মুগ্ধ। একটি সবচেয়ে দামী গ্রামোফোন ও একহাজার রেকর্ড ওরা কবিকে যেচে উপহার দিল কারণ কবি গানের বদলে টাকা নিতে রাজি হন নি। থিয়েটারেও প্রথম দিকে তিনি দক্ষিণা নিতেন না। কিন্তু রাণা প্রতাপ ও দুর্গাদাস নাটকে এমন সাড়া প'ড়ে গেল যে থিয়েটারওয়ালাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হ'ল। তারা মোটা মোটা দক্ষিণা হাঁকল। কবি বললেন তিনি নাটক লিখে বই বিক্রি থেকেই যথেষ্ট টাকা পান আর টাকা কী করবেন? (অর্থে তার আসক্তি তো ছিল না একেবারেই) কিন্তু তারা ছাড়ল না। বলল: আপনি নানা সংকার্যে দিতে পারেন। কবি শেষটায় রাজি হলেন দক্ষিণা নিতে। যতদূর মনে পড়ে মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী মনোমোহন পাঁড়ে ও ম্যানেজার মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় দুজনে মিলে তাঁকে দক্ষিণা নিতে রাজি করেন।

সে সময়ে চিঠিই পেতেন কত। সময়ে সময়ে বিব্রতও হ'তে হ'ত বৈকি। একটি পরমাসুন্দরী মহিলার কথা ভুলতে পারব না। তিনি কবিকে দেখে তাঁর গান শুনে একেবারে আত্মহারা। যাকে বলে over head and ears ইত্যাদি। মস্ত ঘরের মেয়ে তিনি বহুধনশালিনী—বিধবা। মহামুস্কিল—সম্ভ্রান্ত মহিলা—যখন তখন এসে হাজির সুরধামে। আমাকে কত কি চকলেট মিষ্টান্ন দিতেন—কী যে আদর করতেন। আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম। তিনি আমার মা হ'লে একটুও আপত্তি করতাম না—তাঁর সৌন্দর্যে আমি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু (পরে মেশোর কাছেই শুনলাম) কবি তাঁকে "না" ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহিলাটি আমাদের অযত্ন হবে না কথা দিয়েছিলেন কিন্তু দুবার বিবাহ? অসম্ভব। চরিত্রস্খলন কবি ক্ষমার্হ মনে করতেন কিন্তু দুবার বিবাহ - প্রেম কি বস্তু তা জেনে? কবি ভাবতেই পারতেন না।

এসব কথা এত ক'রে উল্লেখ করছি একটু আভাস দিতে তাঁর চরিত্রবলের, আর দেখাতে যে তিনি মুখে যা বলতেন কাজেও তা করতেন অক্ষরে অক্ষরে।

একথা তখন পড়তাম নীতিপাঠে প্রায়ই—যে example is better than precept—কিন্তু "মন মুখ এক করা" যে কত দুরূহ বস্তু সেটা পরবর্তী জীবনে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি ক'রে তবে আরো শিখেছি তাঁর সত্যনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করতে। তরুণ যৌবনে

বেপরোয়া হ'য়ে কত অসার কথাই যে বলেছি আজ ভাবলে হাসি আসে। যেন সংযমের অভাব একটা মস্ত কিছু! যেন চরিত্রের দৃঢ়তা একটা ফেল্‌না জিনিষ! যেন নিষ্ঠা মানে গতানুগতিকতা! যেন দেহশুদ্ধি একটা কুসংস্কার! আজ সুদূরের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ঠাকুর্দার চরিত্রবল সংযম ও সত্যনিষ্ঠার ছবি দেখি তখন শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হ'য়ে যায়। বুঝতে পারি—অজ্ঞাতে কত পাই আমরা এ ধরণের চরিত্রবল ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত থেকে।

মনে আছে প্রথমবার যখন বিলেতে যাই তখন সংযম নিষ্ঠা ব্রহ্মচর্য, জাতীয় চরিত্র শক্তিকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখা সত্ত্বেও মনে প্রশ্ন জাগত কবি কোত্থেকে পেলেন এ ধরনের মনের জোর যার বলে পূর্ণ স্বাস্থ্যেও তিনি শুধু যে শুদ্ধাচারী থাকতে পেরেছিলেন তাই নয় দ্বিতীয়বার বিবাহ পর্যন্ত করতে রাজি হন নি প্রলোভন প্রবল হওয়া সত্ত্বেও।

কেন এ-প্রশ্নটি আমার মনে উদয় হ'ত একটু বলা ভালো, কারণ কবিকে বুঝতে হ'লে তাঁর প্রেমের ঐকান্তিকতাকে তার স্বরূপে একটু চিনলে কাজ দেবে।

একটি ইংরাজি কবিতা আমি বার বার পড়িঃ চেস্টারটনের Great Minimum: তার পঞ্চম স্তবকটি এই:

In a time of sceptic moths and cynic rusts,
And fatted lives that of their sweetness tire,
In a world of flying loves and fading lusts,
It is something to be sure of a desire.

এই চরণ কটি যতবার পড়ি আমার স্মরণপটে দুটি মানুষ ফুটে ওঠেন বলিষ্ঠ ঐকান্তিকতার দুটি উজ্জ্বল ছবি হ'য়েঃ গিরিশমেশো ও কবি। আমার কোনোদিন মনে হয় নি যে মা বা মাসিমা নারীদের মধ্যে তেমন অসামান্যা ছিলেন যেমন ছিলেন পুরুষদের মধ্যে এঁরা দুজন। তবু এই দুটি গৌরবময়ী তাঁদের স্বামীর ঐকান্তিক প্রেম তো পেয়েছিলেন আমরণ! কবির ক্ষেত্রে এই ঐকান্তিকতা আরো বিস্ময়কর ছিল, কেন না তাঁর সামনে প্রলোভন ছিল বেশি। তবু তিনি বিচলিত হন নি—কঠিন পরীক্ষায় একাধিক বার উত্তীর্ণ হয়েছেন অক্ষতদেহে, অক্ষতমানসে। এক সময়ে ভাবতাম—অবশ্য প্রথম যৌবনের উদ্দামতার সময়েই এ ধরনের ভ্রম আমার মনে স্থান পেয়েছিল যে, প্রণয়ে ঐকান্তিকতা মনের সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। পরে বুঝেছি কী ধরনের কাঁচামি তথা পাকামি এ-ধারণার প্রসূতি। সংসারে অবিশ্বাস সংশয় অশ্রদ্ধা ও অনুভূতির মর্চে পড়ার দৃষ্টান্ত এত বেশি দেখা যায়; বিলাসের মাঝে মানুষের চিত্তদৈন্যের ছবি এত

বেশি শোভাযাত্রা সুরু করে সার বেঁধে , প্রেম-প্রীতি-প্রণয়ের অস্থিরতার দৃশ্য এত বেশি চোখে পড়ে যে ইংরাজ কবির কথায় সায় দিতেই হয়, বলতেই হয় কোনো আদর্শের ক্ষেত্রে স্থিরমতি হওয়া বড় চারটিখানি কথা নয়।

এ-চিত্তস্থৈর্য আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে একটু বেশি সহজ ছিল একথা সত্য হ'লেও কবির ক্ষেত্রে খুব সহজ ছিল না—আরো এই কারণে যে লোকমত সুনীতি দুর্নীতির যে ছক কেটে আমাদের সামনে ধরে সে-ছকে তাঁর আচরণের বাধ্য ঘুঁটি চালিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ করবার মতন প্রবৃত্তি নিয়ে কবি জন্মান নি। তিনি ছিলেন স্বভাববিদ্রোহী—ধর্ম, আচার, দেশপ্রেম, সাহিত্য, কবিতা, নিষ্ঠা সব কিছুরই ব্যভিচারকে নিয়ে অকুণ্ঠে হাসাহাসি করেছেন—এমন কিছু ছিল না যাকে নিয়ে হাসতে তিনি ভয় পেতেন। এহেন মানুষকে যখন বলতে শুনি : সত্যিকার ভালোবাসা একবারই হয় তখন সে-মতের সার্বজনীনতায় সায় না দিতে পারি কিন্তু তবু তাঁর জীবনের এজেহারকে অবহেলা করতেও পারি না—যদি অবশ্য একনিষ্ঠার মধ্যে কতখানি সত্য আছে সে সম্বন্ধে আন্তরিক সন্ধানী হই। আমি নিজেকে আন্তরিক সত্যান্বেষী ব'লে চিনেছি তাই এ নিয়ে আমাকে আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত কিছু ভাবতে হয়েছে বৈ কি। অনেক ভেবে শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আধারভেদে প্রণয়ের ধারা আমাদের বহুমুখী হ'তে পারে একথা সত্য ব'লে মেনে নিয়েও একথা মানতে বাধা নেই যে আধারভেদে আবার প্রণয়সম্বন্ধে ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতাটিও হ'তেও পারে। অর্থাৎ একাধিক নারীকে বা পুরুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন এ-রকম দৃষ্টান্ত যদি শ্রদ্ধেয় প্রেমিকদের মধ্যে দেখা যায়ও তাহ'লেও যাঁরা একজনের বেশি প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে ভালোবাসতে পারেন নি তাঁদের সাক্ষ্যকে অক্ষমতা ব'লে সনাক্ত করা চলে না। জীবন বিচিত্র এ আমি জেনেছি বহু ঠেকে ও ঠ'কে। নানা অসঙ্গতিকে কোনোমতে মিলিয়ে নিয়ে আমাদের পথ চলতেই হয় এ সংসারে এবং অসঙ্গতির দল দিনে দিনে সংখ্যায় পুষ্টিলাভ করছে এও অপ্রতিবাদ্য সত্য। কিন্তু তবু সব মেনে নিয়েও বলা যায়—যে সংশয় আমাদের দিন দিন বেড়েছে ব'লেই আরো বলা চলে :

"It is something to be sure of a desire."

এর বেশি বলতে আমি পারি না। কারণ কবি আমার কাছে পরম শ্রদ্ধেয় হ'লেও আমি সত্যিই মনে করি না যে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে অন্যায় করতেন বা সুখী হ'তেই পারতেন না। মিথ্যা স্তুতি আমি সত্য নিন্দার চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় মনে করি। তাই তাঁর স্তবগান করব না ধন্য ধন্য ক'রে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অন্যায় ব'লে তিনি প্রথম কোনো সত্যকে দেখিয়েছেন যার অন্যথা হ'তেই পারে না।

তবে যে ঐকান্তিকতার আদর্শ তাঁকে সংযমের পথে চালিয়েছিল, যে অনুরাগ তাঁর চিত্তে আলো হয়ে জ্বলেছিল, যে পবিত্রতার প্রেরণায় তিনি একটিমাত্র প্রতিমার জন্যে আর কোনো প্রতিমার দিকে ফিরেও তাকান নি—তাকে প্রণাম করব অকুণ্ঠেই তাঁর মহৎপ্রাণের একটি গভীর উপলব্ধি ব'লে—যার আলোয় তাঁর উদাসী মন আরো উদাস হ'য়ে চিরন্তনের পথে চলবার পাথেয় পেয়েছিল। আমার আজো কানে বাজে এ পরম উদাসীর একটি অপরূপ গান :

জগত যা নিয়ে যায় একবার
ফিরায়ে দেয় না আর তায়।
নিয়ে যায় সব ভেঙে চুরে—শুধু
স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়॥
একবারই আসে বসন্তে তেমতি
স্নিগ্ধ মধুর মৃদু বায়।
একবারই হাসে তেমতি ধরণী
বিমল শারদ জোছনায়॥
যৌবন জীবনে একবারই আসে
ফিরে সে আর না আসে হায়।
বিবাহের নিশি তেমতি করিয়া
একবারই শুধু বাঁশি গায়॥

* * * * *

এ-উপলব্ধির মধ্যে যে উদাস বেদনা আছে তার মূলে কোনো গতানুগতিকতার সংস্কার নেই ব'লেই আমার নিজের আরো শ্রদ্ধা আসে কবির ঐকান্তিকতার এ-উপলব্ধির 'পরে।

একথা জোর ক'রে বলতে পারছি এই জন্যে যে কবির মন ছিল সববিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক বিচারের পক্ষপাতী। তাই বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁর বদ্ধমূল কোনো সংস্কার ছিল না, না কোনো শুচিবাই, জাতবিচার। এ-সাক্ষ্য দিতে পারি আরো এইজন্যে যে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করতেন—বন্ধুভাবেই—যখন বছর ষোল বয়সে আমি তাঁকে খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করতাম তাঁর বিলাত জীবনের কথা। সেই সময়ে একটা কথা তিনি বলেছিলেন যা আমাকে য়ুরোপে বাঁচিয়ে দিয়েছিল—পরে। কারণ সে সময়ে তাঁর কথা মনে হ'ত। কথাটা সংক্ষেপে বলি (আমারই ভাষায় অবশ্য) :

"মেম বিয়ে করা কি খারাপ বাবা ?"

কবি (চিন্তিত) : জোর ক'রে বলা যায় না। আমার জীবনে একটি ইংরেজ মেয়ে এসেছিলেন। তাকে বিয়ে করি নি অনেক ভেবেই।

"তাহ'লে তাকে ভালোবাসেন নি বলুন -"

"ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তা নয়— তবে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম বৈ কি। পরমা সুন্দরী। কিন্তু নিত্যগোপাল আমার খুব উপকার করেছিল। সে ছিল বিলেতে আমার পরম বন্ধু। বোঝা'ল আমাকে : অমন কর্ম কোরো না দ্বিজু, তেলে জলে মিশ খায় না। তাছাড়া ছেলেপিলে?"

কবি মেম বিবাহ সম্পর্কে এই কথাটার 'পরেই জোর দিতেন। বলতেন প্রায়ই মনে আছে যে হার্বার্ট স্পেন্সারকে নাকি জাপানীরা জিজ্ঞাসা করেছিল জাপানি-বিলিতি বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর কী মত? তাতে জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক বলেছিলেন অমন কাজটি কোরো না বাবা জাপানি! তোমাদের বৈশিষ্ট্য হারিযো না। দো-আঁশলায কখনো ফল ভালো হয না।

কবি ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য যে বিশ্বাস করতেন তা তাঁর প্রাযশ্চিত্ত প্রহসনটি পড়লেই বোঝা যায। তাতে শেষে মহিলাদের আধুনিকতার সম্বন্ধে বলেছেন তীব্র ব্যঙ্গ ক'রে কযেকটি স্বাধীনা মহিলার গানে :

আমরা ক'টি নবকুলকামিনী
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।
গৃহের কার্য করুক সকলে খুড়ি জ্যেঠি পিসি মাসিতে :
আমরা সবাই সভ্য প্রথায শিখেছি হাসিতে কাশিতে।
ব্যবসা করিযা চাকরি করিযা অর্থ আনুক পতিরা :
রাজি আছি তাহা খরচ করিযা বাধিত করিতে সতীরা।
বিলাতি চলন বিলাতি ধরণ
আমরা করিতেছি অনুকরণ,
যেমন সভ্য স্বামীরা তাহার চাই তো যোগ্য ভামিনী।

কিন্তু তবু তিনিই বারবার বলতেন যে তিনি মনে করেন না পিতার কাজ হচ্ছে তাঁর নিজের ধারণা পুত্রের মাথায় চাপানো। পিতা পুত্রকে বোঝাবেন কিন্তু জোর করবেন না।

আমি (তর্কের ভঙ্গিতে) : কিন্তু ধরুন যদি আমি মেম বিয়ে করতে চাই বিলেত গিয়ে তখন আপনি এত জেনেও যদি মানা করেন ?

কবি (দৃঢ়কণ্ঠে) : অসম্ভব। একথা তোমাকে বলব অবিশ্যি যে মেম বিয়ে না করাই ভালো—বিশেষত সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়া এক দায় হয় ব'লে—কিন্তু আমার মত অনুসারে তোমাকে চলতে বাধ্য করব না।

বড়মাসিমা বুঝি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "মেম বৌমাকে ঘরে তুলে নিতে পারবেন?"

কবি (অম্লানবদনে) : নিশ্চয়। যদিও দুঃখ পাব ঘরে তুলতে। বাঙালি বৌমাকে ঘরে তুলতাম আনন্দে। কিন্তু এ তো গেল আমার সুখ দুঃখ মতামতের কথা, মণ্টুর ওপর চাপাব কেন? (হেসে) After all—তার সঙ্গে ঘর করবে তো মণ্টু।

একথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে আজ। আর যতবারই মনে পড়ে ততবারই বুকের মধ্যে জেগে ওঠে অনাবিল শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করতে পারতেন তাঁর সহজ ঔদার্যে। এ সাক্ষ্য সবাই দেবে - এমন কি সেও যে তাঁকে মাত্র দু'একবার দেখেছে। কারণ ঔদার্যের একটা আশ্চর্য আকর্ষণী শক্তি আছে। মানুষ তাকে আঁকড়ে পায় না ব'লেই আরো আঁকড়ে ধরে। সব অনন্ত অসীমের প্রতিই আমরা আকৃষ্ট হই স্বভাবতই—কিন্তু আমার বার বার মনে হয়েছে যে একটা মানুষের চরিত্রের নানান প্রশংসনীয় দিক থাকলেও এবং প্রতি প্রশংসনীয় দিকের একটা চুম্বকশক্তি থাকলেও ঔদার্য যেমন কাছে ডাকে তেমন ডাকে খুব কম গুণ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মনীষা, দানশীলতা, সংযমশক্তি, সৌকুমার্য—এসবই মন টানে কিন্তু প্রাণ টানে ঔদার্য। শুধু তাই নয়, ঔদার্য যে ভাবে অভিভূত করে বোধহয় প্রতিভাও সে ভাবে অভিভূত করে না। এ বিষয়ে হয়ত আমার সঙ্গে অনেকের মতভেদ হ'তে পারে। তবে আমি একথা বলছি নিজের মত জাহির করতে নয়—এই কথার উপর জোর দিতে যে তাঁর মধ্যে যে ঔদার্য দেখেছি তা আজ পর্যন্ত আর কোনো প্রতিভার মধ্যে দেখি নি—এক গিরিশ মেশো ছাড়া। তাই এই দুটি মানুষকেই আমি মনে করি আজো আমার বাল্যজীবনের যুগল দীক্ষাগুরু।

* * *

দশম উল্লাস

এ ঔদার্যে তাঁর হৃদয়ের সায় থাকলেও তাঁকে এজন্যে যে দুঃখ পেতে হ'ত না এমন কথা বলব না। বলতে কি, কোনো বড় কিছুকে পেতে হ'লেই তো কিছু না কিছু বেদনার মূল্য নিতে হবেই। তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া যত সহজ ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া তত সহজ নয়। কবি যে ঔদার্যকে জীবনের মূল-মন্ত্র ব'লে গ্রহণ করেছিলেন কার্যক্ষেত্রে তাকে মেনে চলা তাঁর মতন স্পর্শকাতর মানুষের পক্ষে সহজ ছিল না। যেমন ধরুন যখন আমি আমার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতাম তাঁর গানের সম্বন্ধে। বেশ মনে আছে একদিন আচম্‌কা যেন বাহাদুরি করতেই ব'লে বসলাম: "আপনার গান কি আর গান? গান তো লালচাঁদের "এহো রাজা যাতি হয়।" কবি একদিন লালচাঁদের এ গানটি গ্রামোফোনে শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে একদিন প্রণাম করেছিলেন এ বৈদেহী গায়ককে—গ্রামোফোনের ঠিক সামনেই। প্রশংসা যখন তিনি করতেন এম্‌নি-উৎসাহের সঙ্গেই করতেন—হাতে রেখে বলতেন না। এও তাঁর ঔদার্যেরই সহজ প্রবর্তনায়।

কিন্তু লালচাঁদের "অনুগত জনে কেন এত কর প্রবঞ্চনা"—র পরেই উৎকট সা নি ধা পাম্‌ মা পাম্‌ গা মাম্‌ গা রে সা শুনে তিনি হো হো ক'রে হাসতেন, আমি তাতে ক্ষুণ্ণ হ'লে বলতেন: "কিন্তু না হেসে কী করি বল্‌ দেখি? বাংলা গানে যে ভাব ব'লে একটা জিনিস আছে রে। তাকে সার্গম-বাজি ক'রে টুঁটি টিপে ধরলে কি সে বাঁচতে পারে কখনো?"

তবু আমার নানা দীর্ঘ তান শুনে খুসি হ'য়ে বলতেন বন্ধুদের: "ছেলে আমার কালোয়াৎ সোজা নয়। কী সব শক্ত শক্ত তান নেয় দেখেছ?"

সাম্‌নে এ রকম প্রশংসা করতেন তিনি অকুণ্ঠে। ঔদার্য চায় না দমন করতে—না পরকে না নিজেকে। বন্ধুবান্ধবরা আপত্তি করলে বলতেন পুরুষ তো—এতটুকু প্রশংসায় হ'য়ে যাবে মাথা গরম! ছোঃ!

বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি। তাই তো ভারতচন্দ্রের আলমারির চাবি বারো বছরের পুত্রের হাতে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। প্যুরিটানিসম্‌ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। শিখুক জানুক, বুঝুক, মানুষ হোক। "আবার তোরা মানুষ হ" গাইতেন কী তেজের সঙ্গে। অমন তেজোময় কণ্ঠ কমই শুনেছি। (আর এই জন্যেই

তিনি পুত্রকন্যার মুখে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও তর্কাতর্কিতে শুধু যে রুষ্ট হ'তেন না তা নয়—সত্যিই তুষ্ট হ'তেন।

আজও মনে পড়ে তাঁর সেই গানের কথা। রক্তের চাপ বেশি ব'লেও বটে, বলিষ্ঠকায় ছিলেন ব'লেও বটে—গান গাইতে গাইতে তাঁর সুগৌর মুখখানি একেবারে টকটকে লাল হ'য়ে উঠত—চোখে জল উঠত চিক চিক ক'রে। ছেলেবেলায় লাঠিখেলা শিখেছিলেন—কী বিদ্যুদ্বেগে যে লাঠি ঘোরাতে পারতেন! আমাকে শিখিয়েছিলেন। আমি কিন্তু সে রকম ঘোরাতে পারতাম না। অগত্যা স্যাণ্ডোর ব্যায়াম সুরু করলাম। তারপর ফুটবল। আমাদের বাড়ির সাম্‌নে একটা মাঠ ছিল সেখানেই আমরা ফুটবল খেলতাম, তিনি দেখতেন। প্রথম প্রথম পাড়ার ডানপিটে ছেলেরা এসে খেলত, তখনো দেখতেন সানন্দে। বলতেন: "আহা খেলুক খেলুক—ওরা খেলার মাঠ কটাই বা পায় এ ঘিঞ্জি কলকতায়? অনেক সময়ে তাদের চেঁচামেচিতে দস্তুর মতন অসুবিধে হ'ত তবু তাদের বারণ করতেন না। অচেনা পাড়ার ছেলে। এও সেই ঔদার্যেরই ফল।

* * *

তাঁর গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি সুগায়ক ছিলেন, কিন্তু ওস্তাদ ছিলেন না যেমন ছিলেন ঠাকুর্দা। শিখলে ওস্তাদ হ'তে পারতেন কিন্তু আশৈশব তাঁকে পড়াশুনোই বেশি করতে হয়েছিল, ফিরে এসে চাকরির হাড়ভাঙা খাটুনি। কাজেই আমি নিজে গান শিখবার যেমন সুযোগ পেয়েছিলাম সে রকম সুযোগ তিনি পাবেন কোত্থেকে বলুন?

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের এমন উদাত্ত লাবণ্য ছিল যে তাঁর গান সত্যিই চিত্তহরণ করত। খোলা কণ্ঠে যত চড়াতেন ততই মিষ্ট হ'ত—আর চড়াতেন গলা না চেপে - মিউ মিউ ভঙ্গিতে নয়—যেমন আজকালকার বিখ্যাত রেডিও গায়কেরা চড়ান। তাই তাঁর গানে অত সহজে আগুন জ্ব'লে উঠত। শুধু স্বদেশী গানে বা যুদ্ধের গানে নয়, যখন হাসির গান গাইতেন তখনও। আজো মনে পড়ে কী তীব্র বেদনার জ্বালা ফুটে উঠত তাঁর জোরালো কণ্ঠে যখন তিনি সব্যঙ্গে গাইতেন:

আমি যদি পিঠে তোর ঐ লাথি একটা মারিই রাগে
তোর তো আস্পর্ধা বড় পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে।

অত্যধিক স্পর্শকাতর মানুষ: যেখানেই আত্মগ্লানির ছায়া দেখতেন সেখানেই তাঁর সমগ্র মনটি উঠত দুলে। শুধু গ্লানির ক্ষেত্রেই নয় তাই ব'লে - সমবেদনায়ও। যেমন যখন গাইতেন কোরাসে:

জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান ?

আনন্দের উচ্ছ্বাসেও যেমন যখন গাইতেন :

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে নূতন পাতায় নূতন ফুলে।

তবে বড় দুঃখ পেতেন তাঁকে চাকরি করতে হ'ত ব'লে। বলতেন আমাকে প্রায়ই : "ওরে কত কী যে আসে মাথায় লিখবার সময় পাইনে। যা খাটায় আমাকে—"

মাঝেমাঝেই প্রায় ঠিক ক'রে ফেলতেন চাকরিতে ইস্তফা দেবেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে আসত : "করেন কি দ্বিজদা! যা দিলদরিয়া আপনি, সামলাবেন কী ক'রে শুনি ?"

সত্যই সাম্‌লানো দায় হ'ত। কারণ যদিও বই টই থেকে বেশ মোটা টাকা আসত কিন্তু তাঁর পোষ্য ছিল তো কম নয়। শুধু পোষ্যই না—চাকর বাকরে যা চুরিটা করত—জানি তো। অথচ যে আসবে "স্বাগতম্"—খাবে দুধেভাতে। প্রায়ই এমন হ'ত ঠিক দুপুর বেলা হঠাৎ চার পাঁচটি আনকোরা অতিথি। ঠাকুরই হর্তা-কর্তা-বিধাতা। শুনেছি এক বছর চাকরি করেই সে দেশে পাকাবাড়ি তুলেছিল। মাঝে মাঝে তার চুরির বেপরোয়া বহর দেখে দিদিমা অঝোরে (যদিও গদ্যময় ঢঙে) অশ্রুবর্ষণ করতেন। তাঁর এক বিধবা বোন এসে কিছুদিন ক'রে থাকতেন শুধু ঠাকুরের চুরির প্রতাপ কমাতে। কখনো বা মেজমাসিমা এসে থাকতেন কিছুদিন ক'রে যেকথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু এসব তো আর রোগের চিকিৎসা নয় ক্ষণিক দমন। তাঁরা চ'লে গেলেই ঠাকুর ধরত ফের তার নিজমূর্ত্তি।

তবু তাকে রাখা হ'ত কেন ? না রেখে উপায়। লঙ্কায় যে আসবে সে-ই তো রাবণ হবে। যেখানে উদাসী কর্তার হাতে ভাঁড়ারের চাবি—বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু একটা কথা বলব। ঠাকুর বড় সমজদার ছিল—একেবারে পাকা লোক। চুরি করত বটে কিন্তু খাওয়াতো ভালো। আর বন্দোবস্ত রাখত। কী ভাবে, বলি।

এমন প্রায়ই হত ঠিক দুপুরে হঠাৎ চার পাঁচজন অতিথির অভ্যুদয়।

কবি (জলদগম্ভীর স্বরে) : ঠাকুর!

ঠাকুর (করজোড়ে তৎক্ষণাৎ সশরীরে) : হুজুর।

কবি : পাঁচঠো।

ঠাকুর : জো হুকুম। কুজ্ঝিঠো—বলতে না বলতে ঝনাৎ—চাবি পড়ল তার পায়ের কাছে। আধঘণ্টার মধ্যে ঠাকুর ডাকল "আইয়ে! খানা তৈয়ার।"

বুঝলেন তো কী হ'ত? সে চার পাঁচ জনকে চাল রোজই বেশি রাঁধত। অতিথি এলে সেই তৈরি ভাতই দেওয়া হ'ত এ চার পাঁচ জনকে চাল ঠাকুরের থলিতে ঢালা হ'ত। সবাই এ জানত। কিন্তু ঠাকুর গ্রাহ্যও করত না। কবি বলতেন নিরুপায় ভাবে হেসে : বিরহে কী লিখেছিলাম জানই তো বৌ! (মামিমাকেই প্রায় এসব দুঃখের কথা জানাতেন—শেষের দিকে)

"বিরহ জিনিষটা কী
নাইরে নাই আর বুঝিতে বাকি
যখন দাঁড়ায় আসি রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ করি দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুনিয়া লও
তখন কাতর স্বরে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরো তেল চাই
চুসের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন কাতর স্বরে তোমারে ডাকি।"

কিন্তু তবু যে ঠাকুরকে রাখতেন তার কারণ, সে আমাকে ও মায়াকে খাওয়াত যত্ন ক'রে। হয়ত আমাদের মুখের দিকে চাইলে তার বিবেকে বাধত একটু কিম্বা হয়ত জানত বেশি চাপ দিলে রবারের বলও ফেটে যায়। হেতু যা-ই হোক সে আমাদের দুই ভাই বোনকে সুখেই রেখেছিল—খাওয়াতো খুব ভালো রান্না, এ না বললে কৃতঘ্নতা হবে।

কবি তাকে ছাড়াতে চাইতেন না এইজন্যে। বলতেন : "ও মণ্টু-মায়াকে ভালোবাসে।"

এই ছিল তাঁর দুর্বলতম স্থান—"ওরে মাতৃহারা!" মনে পড়ে আলেখ্যের :

"সাঙ্গ হ'লে দিনের খেলা খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি
সন্ধ্যাটি না হ'তে হ'তে গাঢ় ঘুমের ঘোরে
ঘুমচ্ছিস রে মানিক আমার মাতৃহারা ওরে।
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই
ঘুমিয়ে গেছিস লেতিয়ে গেছিস

বাছা আমার আদুরে,
ওরে আমার যাদুরে !

মনে আছে মেজ মাসিমার সামনে মেশোর প্রায়ই সেই ধীরে ধীরে পড়া :

কী খেয়াল বাছা রে তোর ? গাছের তলে ভুঁয়ে
কেবল দুটো ঘাস বিছানো ধূলার উপর শুয়ে ?
মৌরুষি তোর মায়ের কোলে বাপের বুকে হেন
ছেড়ে এসে বাছা রে তুই ধুলায় শুয়ে কেন ?
আয়রে আমার ননীর পুতুল, আয় রে আমার পাখি
ধুলায় কেন ? আয় রে যাদু—বুকে ক'রে রাখি।

মেজ মাসিমার তো চোখে জল উপছে পড়তো। মেশোর অমন বলিষ্ঠ "মরদ" কণ্ঠও ভাব হ'য়ে আসত, বলতেন পড়ার মাঝেই থেমে : "কী মানুষ মণ্টু! এই বাপের সঙ্গে তুমি মুখোমুখি তর্ক কবো। ছি!" এ-ভং সনা তাঁকে প্রায়ই করতে হ'ত, কেন না প্রায়ই তিনি খবর পেতেন আমি কবির সঙ্গে তর্ক করেছি।

কথাটা আমাদের সুরধামে আসার পরে আরো উঠত এই জন্যে যে এই সময়েই হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে হয় আমার হাতে খড়ি! আমি দুচার দিন সা নি ধা পা করতে না করতে আঙুল ফুলে কলাগাছ - বললাম কবিকে "বাংলা গান কি আর গান ? গান তো হিন্দুস্থানি। গলা যেন পাখা মেলে।"

কবি হাসতেন কিন্তু বেশি প্রতিবাদ করতেন না ? কারণ আমার তান-বাজিতে সময়ে সময়ে থমকে উঠলেও পুত্রগর্বে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতেন।

কিন্তু হ'ল কি আমাকে তাঁর স্বরচিত গান শিখতে ডাকলে আমি আর তেমন গা করতাম না। তবে তিনি দুঃখিত হ'তেন খুবই কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না। কারণ, বলেছি সন্তানেরো স্বাধীন মত বা বিচারের পক্ষে তিনি চড়াও হ'তে চাইতেন না পিতৃত্বের পরোয়ানা নিয়ে। কেবল একদিন (মেশোর সামনেই বুঝি) বলেছিলেন : "ওরে, একদিন বুঝবি - যখন আমি থাকব না—যে কী সব গান বেঁধে গেলাম!"

মেশো কঠিন তিরস্কার করলেন আমাকে এই নিয়েই। ফলে আমার খানিকটা চৈতন্য হ'ল। কিন্তু তবু মনে হ'ত বাংলা গানে কই তেমন তান তো নেই ? তার উপর কবি প্রশংসা করতেন কীর্তনের! মনে ঘা খেতাম। বলতাম : "কীর্তন কি আবার গান ? তেলাপোকাও পাখি ?"

কবি বলতেন : ওরে জানিস, তোর ঠাকুরদাদা—যাঁর সমকক্ষ খেয়াল গাইয়ে নদীয়ায় ছিল না—শেষ বয়সে শান্তিপুরের এক গোঁসাইয়ের কীর্তন শুনে দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে বলেছিলেন: "বৃথাই সারা জীবন খেয়াল শিখে নষ্ট করলাম গোঁসাইজি! যদি কীর্তন শিখতাম!"

তবু আমি মানতাম না। কারণ কীর্তনের ভক্তি আমাকে স্পর্শ করত না। আর ভক্তি বাদ দিয়ে কীর্তনের রস গ্রহণ করতে যাওয়া কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে মহাভারত পড়ার মতন। তাই কবি বলতেন মনে আছে: "কীর্তনের রস অল্প বয়সে পাওয়া যায় না রে—আগে বড় হ তখন বুঝবি কীর্তন কী বস্তু!—যখন ভক্তির রস পাবি।"

কিন্তু সে সময়েই বুঝেছিলাম—কবির জীবনের শেষের দিকে বিশেষ যখন তিনি গাইতেন তাঁর নানা ভক্তির গান। পরে শরৎচন্দ্রের মুখেও শুনেছিলাম: "মণ্টু, যতরকম আবেগ মানুষের আছে ভক্তির পায়ের কড়ে আঙুলের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না।" তখন এসব গানের কথা আরো মনে হ'ত--কবির দেহরক্ষার পরে।

আজো মনে পড়ে কবির মুখে "ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায় পথে পথে ঐ নদীয়ায়।" সত্যি যখন তিনি গাইতেন আমার মনে হ'ত বুঝি তাঁর গৌরাঙ্গ দেহে যেন শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবাবেশ হ'ত। এ সময়ে তাঁর কখনো কখনো এত ভাব হ'ত যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি চাপতে পারতেন না। মেশো এ গানটি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বললেন একদিন ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়িতে এক কলকণ্ঠ ভক্ত গোঁসাইজি এ গানটি গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

"গোঁসাইজি? হেমবাবুর ওখানে?"

"আহা শুনলে না তো সে গান মণ্টু! দ্বিজদা তো তাঁর নিজের গান গোঁসাইজির কণ্ঠে শুনে কেঁদেই ফেললেন।"

"বাবা? তিনিও ছিলেন?

"তাঁর জন্যেই তো গাইলেন গোঁসাইজি। বললেন 'দ্বিজেন্দ্রবাবু, ধন্য আপনি যে এমন গান বেঁধেছেন।' ব'লে দ্বিজদার পায়ের ধুলো নিতে যান আর কি!"

"বলেন কি মেশোমশায়?" ভক্ত গোঁসাইজি প্রণাম করলে আমার তার্কিক পিতাকে! পিতৃগৌরব ফেঁপে উঠবে না?

"আর বলি কি" বললেন মেশো আবার সেই মৃদু বিরক্তির মীড়ে—"বলি—এই বাপের অপূর্ব গান ছেড়ে শিখছ কি না তুমি যত রাজ্যের ম্যাও ম্যাও হিন্দুস্থানি গান!"

মেশোকে গভীর ভক্তি করতাম তাই চৈতন্য হ'ল। তখন থেকে ফের কবির গান শেখায় মন দিই নবোদ্দীপ্ত শ্রদ্ধা নিয়ে। কিন্তু একটা ক্ষতির আর পূরণ মিলল না: মাঝে কবি তাঁর অনেক গান শিখিয়েছিলেন একে ওকে তাকে—সে সুরগুলি গেল হারিয়ে। এ ছাড়া তাঁর আর্য্যগাথার অনেক অতি সুন্দর সুন্দর সুরও আমার শেখা

হয়নি। তবে সৌভাগ্যক্রমে তাঁর শেষ বয়সের প্রায় সব গানই আমার শুনতে শুনতেই রপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। শুধু বাংলা নয়—শক্ত শক্ত হিন্দুস্থানি গানও আমার অনেক সময়েই শিখতে হ'ত না আলাদা করে শুনতে শুনতেই আয়ত্ত হয়ে যেত। এজন্যেও কবির সে কি কম আনন্দ! বলতেন বন্ধুদেরকে: "কী কাণ্ড যে করে ছেলেটা। শুনতে না শুনতে গান তুলে নেয়! আশ্চর্য নয়?"

কিন্তু হিন্দুস্থানি তান কসরতে পুত্রের কৃতিত্ব-গৌরবে তিনি যতই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠুন না, এ-ভুল তাঁর কোনোদিনই হয় নি যে সাঙ্গীতিক বিকাশে হিন্দুস্থানি গান বাংলা গানের সমকক্ষ। তিনি জানতেন বাংলা গানকে আরো সুরসমৃদ্ধ করতে হবে—বাংলা গানের কাব্যসঙ্গীতে হিন্দুস্থানি সুরসম্পদ মূর্ছনাসম্পদের আমদানি করলে সে গান আরো উজ্জ্বল হ'যে উঠতে পারে—কিন্তু বাংলা গানে কাব্য ও সুরের শুভপরিণয়ে যে নবজাতক জন্মগ্রহণ করেছে সে যে শুক্লপক্ষের শশিকলার মতন উত্তরোত্তর পূর্ণায়তি লাভ করবে ও জগতে এক নব সঙ্গীতের আবির্ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলবে এ বিষয়ে তাঁর অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া নিজের গান ও সুরসৃষ্টির অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন বরাবরই। নিজের শক্তিমত্তায় যার আস্থা নেই সে স্রষ্টাপদবাচ্য নয়। কবি ছিলেন স্বভাবস্রষ্টা—শুধু গানেই নয় গদ্যে পদ্যে ব্যঙ্গে নাট্যে। প্রতিপদেই বাইরের প্রভাবকে তিনি অভিনন্দন করেছেন বটে কিন্তু নিজের সৃষ্টির স্বকীয়তা হারাতে নয়, তাকে আরো উজ্জ্বলতা ও কাম্যকান্তি দান করতে। তাছাড়া ভারতের বিশেষ করে বাঙালির সংস্কৃতিতে অটল গভীর শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন যে উত্তরাধিকারসূত্রে! তাই বিদেশী ভাবধারা ও বলিষ্ঠতা এ-সংস্কৃতিকে নবশক্তি দান করুক এ তিনি মনে প্রাণেই চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের স্বকীয়তায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'যে তবে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে তাঁর প্রথম কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়—Lyrics of Ind—তাতেও এই উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাসের কথা রয়েছে ভূমিকায়:

"My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful; but whilst the one is visionary and sensuous, the other is vigorous and chaste; whilst the one dreams the other soars, whereas the one makes a poetry of Religion, the other makes a religion of Poetry. If it has pleased God to unite England and India in the strong and indissoluble bond of mutual love and gratitude, it is the aim of the author

to establish a marriage and an intellectual commerce between their poetries as well ·····London, September 1883."

তাঁর প্রথম যৌবনের উজ্জ্বল আশাশীল মনে এ-উৎফুল্ল প্রত্যয় ঠাঁই পেয়েছিল যে ইংরাজ ভারতকে শ্রদ্ধা ক'রে চাইবে "ভাববাণিজ্য।" কিন্তু দেশে ফিরতে না ফিরতে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। তিনি দেখতে পেলেন যে ইংরাজ ভারতের সংস্কৃতিকে ভাবধারাকে শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক রীতিমত অবজ্ঞা করে। এহেন আবহাওয়ায় ভাববাণিজ্যের আশা দুরাশা। ইংরাজ বড় গলা করে বলে: সে ভারতকে এসেছে দান করতে। এ মনোভাবের আবহে দান সত্য হয় না—কবির নিজের ভাষায়: "সমানে সমানে হয় প্রণয় বিনিময়"। প্রদান সত্য নয় আদান থাকলে তবেই—নৈলে যে সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে সে হ'ল প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ, দাতা ও ভিক্ষুকের সম্বন্ধ প্রেমী ও প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ নয়। তাঁর তিরোধানের পরে এ-মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে—অন্তত ভারতকে নিয়ে ওরা ততটা হাসাহাসি করতে পারে না অকুতোভয়ে, তবু খতিয়ে ওদের সংস্কৃতিই যে বিধাতার সুয়োরাণী এ-ধারণার মূলোচ্ছেদ হ'তে এখনো দেরি আছে। একথা সেদিন বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ফরেস্টারও কবুল করেছেন সদুঃখে, বলেছেন যে আজ পর্যন্ত ইংলণ্ড ভারতে পাঠিয়েছে তাদের বণিকদেরকেই, কারণ ভারতের কাঁচা মালে তার ঔৎসুক্য আছে—কিন্তু পাঠায় নি গবেষকদের কেন না ভারতের ভাবধারার প্রতি সে আজো উদাসীন। শ্রীঅরবিন্দের কাছেও শুনেছি যে ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকের ইংরাজি কবিতা উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে সে কবিতা বিলেতে তেমন আদর পায় নি তার একটা প্রধান কারণ ভারতের পরাধীনতা: হাজার উদার হ'তে চেষ্টা করলেও স্বাধীন জাতির মানুষ পরাধীন জাতির মানুষকে, তার বিশ্বভারতীকে কিছুতেই শ্রদ্ধা করতে পারে না—পারে বড় জোর একটু পৃষ্ঠপোষকতা করতে, দিলাশা দিতে। এক আধজন মহাপ্রতিভাকে ওরা শ্রদ্ধা করেছে এতে করে একথা অপ্রমাণ হয় না। One swallow does not make a summer এ হ'ল ওদেরই কথা।

সুতরাং ওদের মনের গভীরে, মগ্নচৈতন্যে, যদি আমাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব এখনো বদ্ধমূল থাকে যখন ভারতের মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ নবজাগরণের চাঞ্চল্য পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে—তাহ'লে সে যুগে এ-অবজ্ঞা আরো কত বেশি দৃপ্তভঙ্গি ছিল একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। আমরাই তো ছেলেবেলায় দেখেছি মাঠে ঘাটে সাহেবরা কি রকম উচ্ছৃঙ্খল অভদ্র ব্যবহার করত। দেশে ফিরতে না ফিরতে এসব কবির চোখে পড়েছিল। তাঁর সুগৌর মুখ চোখ রাগে টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠত আমাদের জাতীয় ভীরুতার কথা বলতে। একবার এক মেলায় কয়েকটি গোরা একটি বাঙালি

মেয়েকে ঠাট্টা ক'রে ডাকে তাতে কবি একা গিয়ে মুষ্ট্যাঘাতে তাদের সোনার অঙ্গ সিঁদুর করতে ক্রটি করেন নি—একথা নিয়ে সে সময়ে আমরা কী গৌরবই বোধ করতাম আজও মনে পড়ে। ভ্যাংচাতে আমাতে বলাবলি হ'ত: "অ্যাঁ গোরাকে মারা!" ভ্যাংচা বিজ্ঞভাবে বলত: "তা দ্বিজদাও তো কম ষণ্ডা নন্।" আমি বলতাম: "তবু—গোরা—যারা বীফ্ খায়—ভ্যা!" কিন্তু যা বলছিলাম:

বলছিলাম, দেশে ফিরে তাঁর স্পর্শকাতর মনে এই গভীর দুঃখ বরাবরই ছিল যে আমরা জাতি হিসেবে আজও জাগিনি। গয়ায় লোকেন কাকা তাঁকে প্রায়ই বলতেন পরিষ্কার মনে আছে আমার: "দ্বিজু, সাহেবদের তুমি অত দোষ দাও কেন? তোমাকে যারা রোজ হুজুর হুজুর করে তাদের সঙ্গে তুমিই কি মিশতে পারো?" একথা কবি পরে বুঝেছিলেন যখন দেখেছিলেন যে শ্রদ্ধা ওরাও করতে পারে যদি আমাদের মধ্যে আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে। কবি কোনোদিন কোনো উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে যেচে দেখা করেন নি। তিনি যে কাজে ছিলেন তাতে শহরে উপরওয়ালা অফিসার এলে দেখা করা দস্তুর। কবি এ-দস্তুর মানতেন না। এতেও তাঁকে কম বিপদে পড়তে হয় নি—চাকরি তো তাঁর যে কোনো দিনই যেতে পারত—প্রমোশন কিছুতে হ'ল না। কিন্তু তবু—কবির কাছে শুনেছি বারবার—তাঁর সামনে কোনো সাহেব কখনো চড়া গলায় কথা কয় নি। তাঁর তেজস্বী গুম্ফদর্শনে চিনেছিল ওরা শিকারী বিড়ালকে। তাছাড়া ওঁর সাহেব-মারার খ্যাতিও রটেছিল কি না।

কিন্তু তবু একথা মানতেই হবে যে এরকম তেজস্বী মানুষের পক্ষে রাজসরকারে চাকরি করা বিড়ম্বনা। জলে নেমে কাঁহাতক কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে? তাঁর গা রি রি করত যখন তিনি দেখতেন ভারতীয়দের সাহেবকে সেলাম করতে। এ-ভক্তিকে ব্যঙ্গ ক'রে লিখেছিলেন বহু দুঃখেই যে:

আমাদের ভক্তি যা এ সে যে গো পেটের দায়ে
দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পলায়
সাধে কি 'বাবা' বলি গুঁতোর চোটে 'বাবা' বলায়।

কিন্তু তাঁর Lyrics of Ind এ যে ভূমিকা লিখেছিলেন তখন তিনি জাতীয় মনের খবর রাখতেন না। কারণ মনে রাখবেন তখন তিনি মাত্র বাইশ তেইশ বৎসরের যুবক—বিলেতে গিয়ে বলিষ্ঠ ইংরাজ জাতির বলিষ্ঠ সভ্যতার নানা গুণে মুগ্ধ! কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই ভারতের সনাতন সংস্কৃতি তাঁর মনের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। একথা এত ক'রে বলছি এই জন্যে যে তিনি প্রথম জীবনে সাহেব হ'য়ে গিয়েছিলেন এই রটনাই রটেছে দুটি প্রকাশিত জীবনীতেই। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। ওদের

বহির্জীবনের পরিচ্ছন্নতা তাঁর ভালো লাগত। বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি প্রকৃতিতে কাজেই বলিষ্ঠ জাতির বলিষ্ঠ ছন্দ তাঁর মন টানবে এতে আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু তাই ব'লে বিলেতে ব'সে—যখন তিনি বিলাতি মেয়ে বিবাহ করবেন কিনা ভাবছেন তখনো - তিনি ভারতকেই পূজা করেছেন কী ভাবে শুনুন। তাঁর Lyrics of Ind-এর The Land of the Sun কবিতায় কবি লিখেছেন:

O my land, can I cease to adore thee,
Though to gloom and to misery hurled?
O dear Bharat, my beautiful maiden,
O sweet Ind, once the queen of the world.

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name;
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And gleams through the mist of thy shame.

এর সঙ্গে তুলনা করুন তাঁর স্বদেশী যুগে লেখা একটি অপূর্ব গান—(এ গানটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গান যদিও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা।
তুমি তো মা আছ তেমতি উচ্চ
আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম—জানি না কী পাপে এ তাপ সহি মা!
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে
এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্রে;
এখনো ভেদি, হিমাদ্রি জংঘা
উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি' মা।
তুমি তো মা সেই সুজলা সুফলা এখনো হরষে ভাসায়ে নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে।
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব
আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব

তুমি কী করিবে তুমি তো মা সেই মহিমা-গরিমা পুণ্যময়ী মা !

লক্ষ্য করবেন এ-জাতীয় গানের মধ্যে নেই কোনো সস্তা উত্তেজনা, আছে এক গভীর দেশাত্মবোধ—মর্মবেদনা। আর সেই সঙ্গে উহ্য হ'য়ে আছে এই বাণী যে এ হেন দেশের সন্তানের সাজে না ক্লৈব্য। এ হেন মায়ের সন্তানকে হ'তে হবে বীর হ'তে হবে স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠ।

কিন্তু দেশে ফিরে তিনি সে সময়ে কী দেখেছিলেন সে কথা ফের তুলি। তখনো দেশ জাগে নি। সভাসমিতি তো একটা প্রহসন—খালি রেজলুশন আর বক্তৃতা। এ হেন আন্দোলনের অসারতা যে কী হসনীয় তার ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর "আষাঢ়ে"-র "কলিযজ্ঞ" কবিতায়—অনুষ্টুপ ছন্দে:

ব্যারিস্টার উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মন্দ্রাজী উড়িয়া শিখ বঙালী চ দলে॥...

এদের বর্ণনা

এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে।
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করতে ফতে॥
তন্মধ্যে মুখসর্বস্ব বঙালী হি পুরোহিত।
রেজলুশন নির্মাণে বক্তৃতায় মহারথী॥
ইংরাজীতে কথাবার্তা ইংরাজীতে চ বক্তৃতা।
প্যাণ্ডেলের তলে আজি ইংরাজীতে খদী ফুটে॥
বাহবা বাহবা শব্দ সমুত্থিত সভাস্থলে।
বাহবা বাহবা শব্দে করতালি চটাপট॥
এরূপ শুদ্ধ ইংরাজী এরূপ উপমা ছটা।
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা॥
সিসিরো, পিট, বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়।
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে॥

দেশে আজ তবু খানিকটা স্থষ্টির চাঞ্চল্য এসেছে কিন্তু তখন ছিল শুধুই নিষ্কর্মা বক্তৃতা। কবি বুঝেছিলেন যে এ পথে মুক্তি হ'তে পারে না। চাই সমাজের সংস্কার, আত্মশোধন, তাই তিনি দেশের সর্ববিধ অসারতাকে সুরু করলেন ব্যঙ্গ। কিন্তু জহর-লালের ভাষায় it was a brothers curse নিজেকে দূরে রেখে দেশবাসীকে তিনি

গালমন্দ করেন নি—নিজেও তাদের সঙ্গে এক পুক্তিতেই বসেছেন বরাবর। একথা এত করে বলছি আজ কারণ অনেক সমালোচক দেখি ভুলে যান যে খাঁটি দেশাত্মবোধ খুব সুলভ নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দুদিনও মিশত সেই মুগ্ধ হ'তে দেখে তিনি গভীর বেদনা বোধ করতেন দেশবাসীর মনে প্রাণে অসাড়তায়—স্বাধীন চিন্তার দৈন্যে—সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। তার উপর এ বেদনা ছিল কবির বেদনা - বিদ্রূপীর বেদনা নয়। তাই তিনি বিদ্রূপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক ও দেশাত্মবোধের গান গিয়েছিলেন "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা" - চেয়েছিলেন "আবার" আমরা "মানুষ" হই। আর এ সুরে কবির কবিপ্রাণে স্পন্দন জেগেছিল বলেই সে যুগে দেশে এমন ব্যাপক সাড়া পড়েছিল তাঁর গানে ও নাটকে—তিনি শুধু বিদ্রূপীই হলে কখনই এ ধরণের সাড়া পড়তে পারত না। আমাদের দেশে বিদ্রূপীই আরও জন্মেছেন ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো প্রভৃতি। কিন্তু তাঁদের বেদনা দেশকে বিশেষ জাগাতে পারেনি এইজন্যই যে তাঁরা কবি ছিলেন না। অনুভব করার শক্তি আর সে অনুভব অপরের মনে সংক্রামিত করার শক্তি এ দুই আলাদা প্রতিভা। অনুভবের শক্তি অনেকরই আছে কিন্তু তাকে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় করবার শক্তির নামই আর্ট। সাহিত্যের আর্ট এ-শক্তি সবচেয়ে সক্রিয় ও দীর্ঘজীবী হয় কবিত্বে। বিদ্রূপের শক্তিও একটা মস্ত শক্তি একথা অপ্রতিবাদ্য কিন্তু কাব্যশক্তির কৌলীন্য তার নেই থাকতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বিদ্রূপী বলে শিরোপা দিলে তাঁর শ্রেষ্ঠ রূপটিকেই নামঞ্জুর করা হয়—কারণ তাঁর প্রতিভার শক্তি শিখরে উঠেছিল তাঁর কবিত্বে, বিদ্রূপে নয়। শুধু তাই নয় বিদ্রূপেও তাঁর সেই সব হাসির গান বা ব্যঙ্গচিত্রই সব চেয়ে রসোত্তীর্ণ হয়েছে যে সব গান বা ছবিতে নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁর কবি-হৃদয়ের গভীর ব্যথা- দেশাত্মবোধ—আত্মধিক্কার।

আত্মধিক্কার বলছি এইজন্যে যে দেশবাসীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন তাই তাদের সর্ববিধ অপমান, হীনতা, চিত্তদৈন্যকে তিনি গায়ে পেতে নিয়েছিলেন নিজের গ্লানি বলে। তাই না তাঁর শ্রেষ্ঠ হাসির গানের হাসি হতে পেরেছিল

"Laughter veiled in tears."

আর সত্যিকার অশ্রু সে—কতবার দেখেছি তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠতে যখন তিনি গাইতেন :—

আজি এ শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দি জয়ধ্বজায়!
উপাধি পেয়েছি যা রাখতে তাতো হবে বজায়।

আমাদের ভক্তি যা এ এ যে গো মানের দায়ে,
নিয়ে আয় চেরাগ বাতি নিয়ে আয় দিয়েশলাই।
সাধে কি "বাবা" বলি গুঁতোর চোটে "বাবা" বলায়।

কিম্বা যখন গাইতেন "গীতার আবিষ্কার"-এ :

সকাল বেলায় আপিস গিয়ে গাধার মতন খাটি।
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পাদুখানি চাটি।
বাড়ী ফিরে বন্ধুবর্গ জড়ো হ'লে খালি,
যাঁদের অন্নে ভরণ পোষণ তাঁদের পাড়ি গালি।
একা হ'লে হায় রে, গলায় জোটেও না কো দড়ি ?
বুঝি বা সে নাই বুঝি গীতাখানি পড়ি।
আমার গীতাখানি পড়ি।

তিনি এমন গভীর বেদনার সঙ্গে মিড় লাগাতেন এই "হায়রে গলায় জোটেও না কো দড়ি" চরণাটিতে যে আমার বালক হৃদয়েও শঙ্কা ও ব্যথা জেগে উঠত সাক্ষাৎ দেবতুল্য পিতার কণ্ঠে রজ্জু কল্পনা ক'রে। সেই জন্যে শেষের দিকে আমি খুসিই হ'তাম তিনি এ ধরণের হাসির গান না গাইলে, কারণ দেখতাম এসব গাইতে তিনি আনন্দ পান না - দুঃখই পান। তাঁর দুঃখ আমি সইতে পারতাম না ব'লেই এটুকু বুঝেছিলাম বুদ্ধি দিয়ে নয় অবশ্য।

আমার আরো ভয় হ'ত যখন দেখতাম তাঁর রক্তের চাপ বাড়ার পরেও তিনি এই সব গান গাইতেন। কারণ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ক্যালভার্ট এসে ব'লে গিয়েছিলেন খুব সাবধানে থাকা দরকার—রক্তের চাপ এত বেশি হয়েছে যে সবরকম আবেগ উচ্ছ্বাসেই বিপদ সমূহ।

একদিনের কথা ভুলব না। মনস্বী বিচারপতি ও কবি শ্রীবরদাচরণ মিত্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অকৃত্রিম বন্ধু ও ভক্ত। তিনি একদিন এসে কবিকে ধরলেন হাসির গান অনেকদিন শোনেন নি - শোনাতেই হবে। কবি সে সময়ে হাসির গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন—তবু তাঁর অনুরোধে ধরলেন (বঙ্গভঙ্গের উপলক্ষে লেখা) বিখ্যাত :

পাঁচশো বছর এম্‌নি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়।
এইটে কি আর সইবে না কো দু ঘা বেশি জুতোর ঘায় !
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা দিবি দু ঘা দে না বাবা,
দু ঘা বেশি দু ঘা কমে এমনি কী আসে যায় !

তবে কিনা জুতোর গুঁতো হ'য়ে গেছে অনেক বার।
একটা কিছু নতুন রকম করলে হ'ত উপকার।
ধরুনা যেমন 'বেটা' ব'লে দিলি না হয় কানটা ম'লে,
জুতোর খোঁটা খেয়ে ঘাটা প'ড়ে গেছে সকল গায়।
প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল,
সইবে সবই, নই তো মানুষ—মোরা সবাই ভেড়ার পাল।
যে যা করিস দেখিস চাচা! মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাচা
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস রে দুটো দুবেলায়।

গানটি শুনে বরদাবাবু একটু চুপ ক'রে রইলেন, পরে বললেন: "আমি হাসির গান শুনতে চেয়েছিলাম দ্বিজুবাবু, কান্নার গান শুনতে চাই নি।"

* * * *

এই কান্না তাঁর শেষ বয়সে রূপ নেয় বা- র-- যখন তিনি আত্মধিক্কার ভুলে দেশকে শোনাতে চেয়েছিলেন নব জাগরণের গান:

কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।

কারণ সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে কথা বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "ধর্ম ধর্ম ক'রে আমাদের সর্বনাশ হয় নি-- ধর্ম নেই ব'লেই আমরা ডুবেছি।" তাই কবি গেয়েছিলেন, এ গানটির অন্তিম স্তবকে:

ধর্ম যেথা সেদিকে থাক,
ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক—আবার তোরা মানুষ হ।

* * * *

এ দৃশ্য দেখতে বড় আনন্দ যে কোনো মহাপ্রাণ মানুষ এক অনুভব থেকে উচ্চতর অনুভবের ভূমিকায় উঠছেন। কবির বালক হৃদয়েই জেগেছিল দেশপ্রেম। তাই কৈশোরেই তিনি লিখেছিলেন:

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন

কী মাধুর্য কিম্বা জন্মভূমি, জননী তোমার! •
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আমার ?

সেই সঙ্গে মনে উন্মেষিত হয়েছিল সুন্দরের প্রতি আসক্তি যা প্রাকৃতিক শোভা-চিত্রণে প্রকাশ পেয়েছিল আর্যগাথায়। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম যে তাঁর একদিন চাঁদ দেখে ভাব জেগেছিল বার বছর বয়সে, যার প্রেরণায় তিনি একটি সুন্দর সহজ সরল গান বেঁধেছিলেন ও মুখে মুখেই সুর দিয়ে গেয়েছিলেন। এ গানটি আমি পরে গ্রামোফোনে দিয়েছিলাম যথা :

গগন ভূষণ তুমি জনগণ-মনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ, হে নীল নভোবিহারী ?
হেসে হেসে ভেসে ভেসে চ'লে যাও কোন্ দেশে ?
চারি ধারে তারাহারে রহে ঘিরে সারি সারি।
হেলে দুলে কুতূহলে পড়িছ গগন তলে
কি মধুর মনোহর শশধর বলিহারি !

এ গানটি যাঁরাই তাঁর মুখে শুনতেন তাঁরাই মুগ্ধ হ'তেন—এত সরল সুন্দর এত সাবলীল সুরটি। অথচ কোনো সুরের নকল নয়। তাঁর বাল্যকালেই যে এ প্রাতিভ শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল সে কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন তাঁর আর্যগাথা প্রথমভাগের ভূমিকায় :

"বঙ্গভাষায় গীতের অভাব পূরণার্থে আর্যগাথা রচিত হয় নাই। শৈশব হইতেই গীতিরচনায় আমার আসক্তি ছিল. যে সব গীত তখন কোনো শাস্ত্রত সুরে গীত হইত না। যখন যে সুর ভালো লাগিত তখন সেই সুরেই গাহিতাম।"

এই যে গানের সঙ্গে রকমারি সুর তাঁর বাল্যচিত্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত এই-ই হ'ল সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে তিনি স্বধর্মে ছিলেন সুরকার, কবি, গীতিকার। তাঁর এ বালপ্রতিভা তাঁর পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল পুত্রের শৈশবেই। তাঁর মুখেই আমরা ক'বার শুনেছি যে একদিন এইভাবে নিজের মনে ব'সে গানের পর গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গেয়ে চ'লেছেন—হঠাৎ কি একটা খশ খশ শব্দে চেয়ে দেখেন—পিছনে দাঁড়িয়ে ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা তাঁকে উৎসাহ দিলেন গান "সুন্দর হচ্ছে" ব'লে—কিন্তু তিনি লজ্জায় আর গাইতে পারলেন না।

তাঁকে কাছ থেকে দেখলে—তাঁর সুরেলা কণ্ঠের সুর শুনলে—তাঁর অতি সহজে গানের পর গান বাঁধার শক্তি প্রত্যক্ষ করলে কারুরই সংশয় থাকত না যে তিনি

সব আগে ছিলেন স্বভাব-কবি ও স্বভাব-সুরকার। অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর এই দুটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তাঁর হাসির গানের।

কেন হয়েছে কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। সরল শুদ্ধ হাসির প্রবর্তন জাতীয় জীবনে ক্ষালকের কাজ করে এ-ও কে না মানবে? কিন্তু সব মেনেও তবু একথা মানা যায় না যে কোনো কবির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা দিয়ে তার প্রতিভার যাচাই না-হওয়াটা শোচনায় নয়। তাই তাঁর বহু স্মৃতিসভাতে যখন ক্রমাগতই একের পর এক বক্তা উঠে বলতেন সব আগে তাঁর হাসির গানের কথা তখন আমার মনে বিষাদ ছেয়ে আসত। কারণ জীবনে হাসির স্থান খুব উচুতে হ'লেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হাসিও নয় গদ্যও নয় – সে কবিতা ও গান। নাটকের কথা এখানে স্বতই মনে হ'তে পারে। কিন্তু নাটকও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রাজ্যে ছাড়পত্র পায় তার কাব্যের গুণে—ছন্দের গুণে। শেক্ষপীয়র যদি গদ্যে হ্যামলেট লিখতেন তাহ'লে আকাশচারী হ্যামলেট যে আজ মর্ত্যচারীর রূপেই আমাদের মনের তর্পণ পেত- স্বপ্নের শিহরণ জাগাত না--এ বিষয়ে রসজ্ঞমহলে মতদ্বৈধ থাকতেই পারে না। তবু ভাষালোকে কাব্যের স্থান প্রকাশের শিখরে এ অতিপুরাতন কথাটিও এত ক'রে বলতে হল কেননা হাল আমলে উপন্যাসের চাহিদা অত্যন্ত বেশি হবার দরুণ অনেকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আমল পেতে সুরু করেছে যে শ্রেষ্ঠ গদ্য শ্রেষ্ঠ কাব্যের সমান হ'তেও পারে। কিন্তু এ-ধারণা যদি দুদিন বাদে আরো ফেঁপে ওঠে তাহ'লেও শেষ পর্যন্ত টিকবে না টিকতে পারে না। হাতি যতদিন বাঁচে খরগোস ততদিন বাঁচে না ·বাঁচতে পারে না। শ্রেষ্ঠ কাব্য যে দীর্ঘায়ু ও আনন্দের গভীরতা নিয়ে জন্মেছে তার সঙ্গে অ-কাব্য প্রতিযোগিতা করতে কোনোদিনই পারে নি, কোনোদিনই পারবে না—যেমন আবৃত্তি বা বক্তৃতা হাজার ওজস্বিনী হোক না রসসৃষ্টিতে গানের তুল্য রস পরিবেশন করতে পারে নি, পারবে না। ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, টলস্টয় ডস্টয়েভস্কির বার্ণার্ড-শর প্রতিভা কোনোদিনই ব্যাস বাল্মীকি হোমর শেক্ষপীয়র দান্তের কাছাকাছি বলেও গণ্য হবে না, কেন না শ্রেষ্ঠ গদ্য সে-আনন্দ সঞ্চার করতে অপারগ যে-আনন্দ শ্রেষ্ঠ কাব্যের ইঙ্গিতাধীন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry তে এই কথাই দেখিয়েছেন সুন্দর করে-কেন ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান, কার্পেণ্টার প্রমুখ নিপুণ গদ্যকবিরা প্রতিভা হিসেবে শ্রেষ্ঠ কবিদের পাশে আসন দাবি করতে পারেন না। "গদ্য ছন্দ" কথাটা হল সোনার পাথরবাটির মতনই একটা অর্থহীন কথা। একথা ফ্যাশনের ফকিররা স্বীকার না করতে পারেন কিন্তু কবিচিত্তের কাছে স্বীকৃত হবেই কেননা গদ্য ছন্দের মর্ত্যচারণে সে সে-গভীর আনন্দ পেতেই পারে না যে-আনন্দ সে পায়

শ্রেষ্ঠ কাব্যের অমর্ত্যবিহারে। কণ্ঠস্বরের গভীরতম মাধুর্য্য যেমন কেবল সঙ্গীতেই পরিস্ফুট হতে পারে আর কোথাও না—কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা তেম্‌নি ছন্দোবদ্ধ রূপেই মূর্ত হ'য়ে উঠতে পারে—অন্য কোনো কাঠামোয় না।

এই শাশ্বত মাপকাটি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্তির পরিমাপ করতে গেলেই দেখা যাবে যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর গদ্য নয় হাসিও নয়; তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর কাব্য ও গান এবং নাটকের মধ্যেও তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সীতা, পাষাণী, ভীষ্ম: তাঁর গদ্য নাটকগুলির কোনো রসমূল্য নেই এমন কথা কেউই বলবে না, কিন্তু চিরন্তনের সভায় তারা সে-মর্যাদা পাবে না যে মর্যাদা পাবে তাঁর ছন্দোবদ্ধ নাট্যকাব্যগুলি।

একাদশ উল্লাস

বহু গান বেঁধে ও সুরযোজনা করতে করতে আমার ক্রমাগতই মনে হয়েছে দুএকটি কথা—যেগুলি বলা দরকার দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে।

প্রথম, তার অনন্যতন্ত্র প্রতিভার নির্দেশে গানে তিনি যে নূতন পথ কেটে নিয়েছিলেন সেই পথটি গানের শ্রেষ্ঠ রাজপথ। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে গানকে বড় হ'তে হ'লে তার মধ্যে সুরবিহারের (improvisation) পাখা মেলবার আকাশ রাখতে হবে—কথার চাপে তার টুঁটি টিপে ধরলে সে সর্বোত্তম গানের পর্যায়ে পড়বে না। বাংলা গানে সুরকে লীলায়িত করবার অবকাশ দিয়ে তবে সুররচনা করতে হবে, একথা বাংলা গীতিকারদের মধ্যে তাঁর মতন প্রবুদ্ধভাবে আর কেউ বোঝে নি আজ পর্যন্ত।

একথার মানে নয় যে সব রকম গানই এই সব ছাঁচে ঢালাই হবে। তা হ'তেই পারে না। সহজ সরল সুরের সাদামাটা গানেও সৌন্দর্য যথেষ্ট থাকতে পারে—বাউল ভাটিয়ালি সারি রামপ্রসাদী এসব সুরও আদরণীয় বটেই তো।

এ ছাড়া, কোরাস সঙ্গীতেরও যথেষ্ট বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক মূল্য আছে একথা অনস্বীকার্য। কবির

যদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব সে কী মা ভক্তি সে কী মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি!
বন্দিল সবে—"জয় মা জননী জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী!"

শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা!
কণ্ঠে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা!
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে:
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

বা তাঁর

আর্য ঋষির অনাদি গভীর উদিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র?

শ্রেণীর কোরাস সঙ্গীতে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি সম্পদ সুরেছন্দে কাব্যে চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে একথা সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু এ শ্রেণীর গান

প্রথম শ্রেণীর গান একথা মেনে নিয়েও বলা যায় "আগে কহ, আর"। অর্থাৎ এরও পরে আছে : শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "More is possible"

আর সেইখানেই গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যেখানে গানের কাব্য সুরকে পাখা মেলতে দিয়েছে, যেমন তাঁর

আমরা এম্‌নিই এসে ভেসে যাই।
আলোর মতন হাসির মতন
কুসুম গন্ধ রাশির মতন
হাওয়ার মতন নেশার মতন ঢেউয়ের মতন এসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী,
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে
জ্যোৎস্নার ম'ত অলস চরণে
চপলার ম'ত চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, কান্ত, সুপ্তি শান্তিভরা,
আমরা আসি বটে, তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে শিশিরে গগনের নীলে,
গানে সুগন্ধে কিরণে নিখিলে
স্বপ্নরাজ্য হ'তে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

এ গানের মধ্যে সুর কী আশ্চর্য ছাড়া পেয়েছে! কাব্যের ভাবরূপের সঙ্গে সুরের লীলায়িত আনন্দ বিহার এ ধরণের গানের যেন স্বধর্ম। ভক্তির গানেও তিনি এভাবে সুরকে ছাড়া দিতে জানতেন যেমন তাঁর ব্রজবালকের গানে (৺কুমারী উমা বসুর মুখে বহু তানের সঙ্গে এ গানটি শুনলে একথা আরো উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা যেত) :

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালোবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাইতো কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখো বঁধু আমরা কেমন ভালোবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধরো গলে দেখবো তোমার মধুর হাসি।
তুমি কভু দয়া ক'রে বাজিও তোমার মোহন বাঁশি
শুনতে তোমার বাঁশির ধ্বনি (বঁধু আমরা বড়ই ভালোবাসি॥

তুমি মোদের হোয়ো প্রভু আমরা তোমার হব দাসী,
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু (আর) আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাসো নাহি বাসো নইকো তার অভিলাষী
আমরা শুধু ভালোবাসি—ভালোবাসি—ভালোবাসি ॥

এ-গানটি অহৈতুকী ভক্তির—গোপীপ্রেমের—একটি আশ্চর্য ভাবরূপ। শুধু গানে নয়—কথায় ও সুরে। তবু শুধু এ গানটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ মুগ্ধ হ'য়ে লিখেছিলেন আমাকে: Beautiful and it puts the Vaishnava *bhava* into modern speech with a successful simplicity which is unique·"

এবার গানে তাঁর পরম ও চরম পরিণতির প্রসঙ্গে আসবার সময় হ'ল—অর্থাৎ তাঁর ভক্তির গান।

তবে তার আগে তাঁর প্রেমসঙ্গীত সম্বন্ধে দু একটি কথা ব'লে নেওয়া দরকার।

বলেছি, কবি প্রথম জীবনে ছিলেন নিসর্গ প্রেমের চিত্রী—আর্যগাথার ভূমিকায় তিনি নিজেই একথা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন যে তাঁর এই সব গানগুলির ইষ্টদেবী—প্রবৃত্তি।

আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে তাঁর জীবনে একটি নূতন সুর বেজে ওঠে: প্রেম। এরই আবাহন গেয়েছেন তিনি অনেকদিন ধ'রে তাঁর প্রেমের কবিতায়। তাই ভূমিকায় কবি বলছেন: (আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে)

"দশবৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দুঃস্থ পরিদর্শক বিস্মিত বালক নই।

আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।"

এ-বইটিতে কবির অনেকগুলি সুন্দর প্রেমের গান বাংলাদেশে সে সময়ে আদর পেয়েছিল। আজ হয়ত সে সব গান তত স্মরণে নেই জনসাধারণের—তবে আবার কেউ গানগুলি গাওয়ার মতন ক'রে গাইলে আদর পাবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গানগুলি সুর ও কাব্যের মিলনে অপরূপ "গান" হ'য়ে ঝলমল ক'রে উঠেছে। এদের মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করি:

১। ছিল বসি সে কুসুম কাননে। ২। চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ। ৩। মোর হৃদয়ের আলো তুইরে সতত থাকিস হৃদয়ে ভাসি। ৪। কী দিয়ে সাজাব মধুর মূরতি কী সাজ মিলিবে উহারি সাথ রে (এটি অপরূপ সুরে ও তালে, খাঁটি ধ্রুপদ—ভৈরবী আশাবরী—তিনি যে কী সুন্দর গাইতেন এ গানটি!) ৫। তোর কী

মোহ কুহক এ খেলাস পলকে নয়নে বিজলি হাসি। ৬। সে কে ? এ জগতে কেহ আছে অতি উচ্চ মোর কাছে যার প্রতি তুল্য অভিলাষ। ৭। আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে (এ গানটি পরে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে দেওয়া হয়। সুরটির আশ্চর্য নবভঙ্গি)। ৮। আর একবার ভালোবাসো বাসতে যেমন আগের দিনে (এ গানটি পরে পাষাণীতে দেওয়া হয়): ৯। এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি (এ গানটি পরে সাজাহানে দেওয়া হয় - এত অপূর্ব ভৈরবী খুব কমই শোনা যায় বাংলা ভাষায়)। এছাড়া একটি অপরূপ ঘুমপাড়ানি গান আছে: "আয় রে আমার সুধায় কণা আয়রে ননীর ছবি।" (এই সুরটি নিয়েই আমি আমার "শ্রীচরণে নিবেদনে" গানটি রচেছি—নতুন ভঙ্গিতে তালফের করে যেটি গ্রামোফোনে গেয়ে ৺উমা বহু প্রিয় করে তুলেছে।)

এর পরে কবির প্রেমের গানের গানের আরো বিকাশ হয়েছিল—কিন্তু প্রথম দিকে সেই সময়েই তিনি একের পর এক প্রেমের গান বেঁধেছিলেন যাদের মধ্যে বিশেষ আদর পেয়েছিল :

১। তোমারেই ভালোবেসেছি আমি তোমারেই ভালোবাসিব
২। আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি
৩। এ কী শ্যামল সুষমা মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে
৪। এস প্রাণসখা এস প্রাণে
৫। এসো এসো বঁধু বাঁধি বাহুডোরে।
৫। তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি হে আমার প্রাণ।
৬। সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই তুমি হও সব সুখের ভাগী।
৮। যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই—ইত্যাদি।

গানের কিন্তু এক মহামুস্কিল এই যে সে সুরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারে না। অর্থাৎ কাব্যের মতন "আত্মবশ" নয়। তাই সে স্বভাবে দুঃখী—"পরবশ" বলে। বাংলা গানের বেলায় এ কথা আরো বেশি করে খাটে। কেননা বাংলা গানের রূপ ফুটে ওঠে শুধু সুরে নয় সুর ও ভাবের মিলনে। এ কথার অর্থ এই যে শুধু গায়ক হলেই বাংলা গান গাওয়া যায় না—যিনি গাইবেন তাঁকে হতে হবে গায়ক তথা ভাবুক একাধারে কবি এবং সুরেলা। এ যোগাযোগ বিরল, কিন্তু বিরল বলেই এ যোগাযোগ যখন হয় তখন দেখি গানে যে আনন্দ পাই শ্রেষ্ঠ কাব্যেও তাকে পাই না। গানের এই রূপটির কথা তাঁর শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল গভীরভাবে উপলব্ধি করেন তাই শেষ

জীবনেই তাঁর গান পরিণতির চরমে পৌঁছেছিল। গান সম্বন্ধে শেষ জীবনে তিনি একটি গান গাইতেন : গানের সুরবালাদের আকুতি :

(আমরা) মলয় বাতাসে ভেসে যাবো শুধু কুসুমের মধু করিব পান।
ঘুমাব কেতকী সুবাস শয়নে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান।
কবিতা করিবে আমারে বীজন, প্রেম করিবে স্বপ্ন সৃজন,
স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান।
সন্ধ্যার মেঘে করিব দুকূল, ইন্দ্রধনুরে চন্দ্রহার।
তারায় করিব কর্ণের দুল জড়াবো গায়েতে অন্ধকার।
বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান।

গানে তিনি তন্ময় হতে পারতেন বলেই এ-গানটিতে বর্ণিত বিচিত্র আনন্দ বেদনা, স্বপ্ন ধ্যান, আশা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর নানা গানে—কবিতার বীজনে, প্রেমের বরণে, স্বর্গের সাহচর্যে, দেবতার আশীর্বাদে, সন্ধ্যার মেঘবসনে, ইন্দ্রধনুর অঙ্গরাগে, তারার দোলনে, আকাশের অন্ধকারে, বাষ্পের ঊর্ধ্বচারণে, বৃষ্টির নিম্নগতিতে, সিন্ধুর উধাও নৃত্যে, ঝঞ্ঝার প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে। আপনি কাছে থাকলে আমি তাঁর গানের নানামুখিতাকে দেখাতাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—গেয়ে শুনিয়ে। কিন্তু লেখনীর মাধ্যমে এ হয় না। লিখে আর যারই গুণগান করা যাক না কেন, গানের মহিমা দেখানো যায় না : গান গেয়ে শোনাবার জিনিস লেকচার দিয়ে বোঝাবার জিনিস নয়। তাই যেন আর থামাই ভালো।

কিন্তু তার আগে লেখনীর অপারগতা সত্ত্বেও -বলি তাঁর গানের শেষের দিকের ভাব-পরিণতির সম্বন্ধে দুচারটে তথ্য বা ব্যাখ্যা।

প্রথম কথা এই যে, গানে তিনি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে ঝুঁকছিলেন। প্রথম জীবনে নিসর্গচিত্রে, তারপর প্রণয়োচ্ছ্বাসে, তারপর স্বদেশসঙ্গীতে, তারপর প্রেমের তর্পণে, সব শেষে ভক্তির অর্ঘ নিবেদনে। প্রণয় তাঁর প্রেমে পরিণত হয় তাঁর স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই, যখন চাইলেন তিনি তাঁর প্রেমকে ঊর্ধ্বমুখী করতে, ব্যাপ্তি দিতে—যে আধারে তাঁর প্রেম নিবেদিত হত সেই মানুষটির অবর্ত্তমানে প্রেম তাঁর খুঁজতে লাগল এক নব বিগ্রহ। দেশই হয়ে উঠল সে বিগ্রহ - প্রথম দিকে।

কিন্তু যা আমাদের অন্তর চায় একান্তভাবে তাকে ফুটিয়ে তোলা একটা জীবন সাধনা। শুধু তাই নয়—চাইতে চাইতে চাওয়ারও ঊর্ধ্বগতি হয়। তাই স্বদেশসঙ্গীতেও

তাঁর আকুতির ছন্দবদল হল। ছিল যা প্রথম দিকে বলিষ্ঠ প্রাণের উদ্দাম আবেগ, যে বলেছিল :

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।

সে এ-বলায় তৃপ্তি পেল না। বলল :

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

তাঁর আবেগময়ী প্রীতি প্রথমে শুধু আবেশ গুঞ্জন করেছিল :

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে
(তারা) ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

সুন্দর ছবি। কিন্তু কবির হৃদয় এতে পুর্ণ তৃপ্তি পেল না। দেশ-মাতৃকার এর চেয়ে বড় ধ্যানছবি ফুটে উঠল তাঁর চোখে যখন তিনি গেয়ে উঠলেন :

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি তোমার চরণপ্রান্ত।
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র কবিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি
চরণে তোমার কুঞ্জকানন কুসুম গন্ধ করিছে সৃষ্টি।

আগে যে-বেদনা ছিল শুধু মায়ের দুঃখে সন্তানের বেদনা, যে বলেছিল (এ কবি-দৃষ্টি) :

তুমি তো মা আছ তেমতি উচ্চ আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ।

পরে সে শুনল সন্তানের দুঃখে মায়ের আনন্দ বেদনা (এ ঋষি দৃষ্টি) :

জননী, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমাব বিতর অন্ন চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননী তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ,
জগৎপালিনী, জগত্তারিণী, জগন্মোহিনী ভারতবর্ষ।

এইই হল গানের রূপাবেশ থেকে ভাবাবেশে উত্তরণ, ভবালুতা থেকে ভাবগভীরতায় সঞ্চরণ। এই শ্রেণীর গানকে বলা যায় (শ্রীঅরবিন্দের পরিভাষায়) psycic, যেখানে পূর্বোক্ত শ্রেণীর গানকে বলব vital : জীবনের মতন কাব্যের বা গানেরও ক্রমপরিণতি বাইরে থেকে গভীরের দিকে, নিচে থেকে ঊর্ধ্বের পানে।

এখানে একটা কথা বলি। আমার কাছে এ আলোচনা অপ্রীতিকর তবু বলতেই হবে।

আজকাল একটা কথা প্রায়ই বলা হয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে তিনি ছিলেন "চারণ কবি"। কথাটায় আমার প্রবল আপত্তি আছে, কারণ এতে ক'রে অনেকগুলি ভুল ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কবিরা নানা বিষয়ে তাঁদের হৃদয়কে আবিষ্ট ক'রে তার মধ্যে যে-সৌন্দর্য দেখেন তাকে নিজের নিজের ছন্দে ও ভঙ্গিমায় কাব্যে উদ্‌ঘাটিত করেন। কিন্তু "চারণ কবি" কী বস্তু? যদি বলি—স্বদেশ-সঙ্গীতের একজন প্রবর্তক, তাহ'লে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভাকে খর্ব করা হয়। তিনি খুব ভালো স্বদেশ-সঙ্গীত লিখেছেন কিন্তু সেগুলি সঙ্গীত ব'লেই ভালো—স্বদেশ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে ব'লে ভালো এ ধরণের চিন্তাই গোলমেলে—ঝাপসা।

যদি বলা যায় তিনি রণসঙ্গীত লিখেছেন অতি চমৎকার—যথা "ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে," "সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে", "মেবার পাহাড়" ইত্যাদি—তাহ'লেও একটু কিন্তু কবাব থাকে। এ গানগুলি রণসঙ্গীত হিসেবে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক যে-কারণে গদ্য কাব্যের রস পরিবেষণ করতে অক্ষম ঠিক সেই কারণেই বলতে হবেই হবে যে রণসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিক আনন্দ পরিবেষণ করা অসম্ভব। কারণ রণসঙ্গীতের স্বধর্মই হ'ল ঘাতকতা--তার প্রথম ও শেষ কথা রক্তোচ্ছ্বাস—সে vital হিংসাবৃত্তি নিয়ে উদ্দীপক গান হ'তে পারে কিন্তু অপরূপ গান হয় না—মার্ক্স-লেনিনের Third International এর সমর্থনেও এ অসম্ভব সম্ভব হয় নি হ'তে পারে না কারণ জীবনের শ্রেষ্ঠ আকুতি হনন নয় বরণ। রণসঙ্গীতের উদ্দীপনা মূলত vital থাকতে বাধ্য, কেন না প্রাণশক্তিই তার একমাত্র উপজীব্য।

এ শ্রেণীর গানের মূল্য নেই বলি না। কিন্তু এ শ্রেণীর গানে শ্রেষ্ঠ কবিত্বের প্রকাশ হ'তে পারে না : ছন্দ প্রাণশক্তির ভূর্ব লোকেই থাকে— আনন্দের ভক্তির বাশরী-লোকে ছাড়পত্র পায় না।

কিন্তু সুর সম্বন্ধে একথা খাটে না। তাদের প্রাণশক্তি নিয়ে নব নব গান বাঁধা সম্ভব। কথাটা একটু নূতন শোনালেও এ আমার কাছে একটি পরীক্ষিত সত্য। তাই বলতে পারছি এমন স্বচ্ছন্দে, অকুতোভয়ে। আমার বলার উদ্দেশ্য -কবির স্বদেশী গানের মধ্যে যারা vital স্তরের গান তাদেরও সুর অতি আশ্চর্য। তাই আমার মনে হয় যে তাঁর এসব সুর শুধু যে অনেক নব সুরের প্রেরণা দেবে তাই নয়—অনেক নব গানে এসব সুর নবজন্ম নেবে। রাগসঙ্গীতে যেমন একটা রাগের নানা বিন্যাস থেকে নানা ভাবের সঞ্চার সম্ভব তেমনি কাব্য সঙ্গীতে একটা গানের সুরভঙ্গি নানা নতুন

গানের অঙ্গরাগ হ'তে পারে। যেমন ধরুন আমরা লিখি অমুক হিন্দি গান বা বাংলা গান—সুর ভৈরবী। তেমনি ওদেশে এক একটা গান এমন প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে থাকে সেই সুরে অন্য গানও রচিত হয়। তখন লেখা হয়—অমুক গান Home sweet home" গানটির সুরে গেয়, অমুক গান "Land of the Leal" সুরে গেয় —এই রকম।

আমাদের দেশেও এ-পদ্ধতি আসবে—আসতে বাধ্য। কিন্তু আসবে তখনই যখন এক একটা গানের সুর এমন রূপ নেবে যা লোকের কাছে হ'য়ে উঠবে অবিস্মরণীয়। অথচ একই সুরে সেই একই গানে ক্রমাগত না গেয়ে নানা গানের কাঠামোয় সেই সুরটি বসালে সুর তথা গীতিচিত্রশালার সমৃদ্ধি বাড়ে।

এই আইডিয়া আমি প্রথম পাই কবিরই আষগাথা থেকে যখন তিনি নানা ইংরাজি গানের বাংলা অনুবাদ করেন সুরে তথা কথায়। সে গানগুলি যে সবই উৎরেছিল এমন কথা বলছি না, কিন্তু আইডিয়াটা ছিল গভীর—যাকে ইংরাজিতে বলে suggestive.

যখন আশ্রমে এসে সুর নিয়ে রীতিমত গবেষণা সুরু করি ও কবি নিশিকান্তের সহযোগিতায় প্রায় চারপাঁচশো গান ও সুর রচনা করি তখন টের পাই যে কবিত্ব শক্তি থাকলে ও সুর দিতে জানলে এ ধরণের গান থেকে গানান্তরে সুর-সংক্রমণে গভীর আনন্দ ও সুরেরসের স্বাদ পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

পিতৃদেবের একটি গান আছে অতি আশ্চর্য সুরে রচিত—ভূপালী ভঙ্গিম কিন্তু একেবারে তাঁর স্বকীয় সুর। এরকম উদ্দীপনা পূর্ণ যুদ্ধের সুর আর শুনি নি কখনো। এ গানটি বিদেশে গেয়ে বহু লোককে মাতিয়েছি। গানটি রণসঙ্গীত—pur excellence —সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত:

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া—যখন বিপন্না জননী জায়া
সাজ সাজ সকলে রণ সাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয়মা ভারত জয়মা কালী!

সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে—শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী
বিধর্মি-চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?

কোষ-নিবদ্ধ রবে তরবারি
যখন বিলাঞ্ছিত ভারতনারী !
সাজ সাজ সকলে রণসাজে

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে, শত্রু করে কভু হব না বন্দী।
ডরি না থাকে যাই অদৃষ্টে - অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রবনা হব না শত্রুর ভৃত্য,
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিব বিভিন্ন।
পুণ্য সনাতন আর্যাবর্তে, রাখিব না কভু রিপুপদচিহ্ন।
বিধর্মি রক্তে করিব স্নান
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে

কবি নিশিকান্তকে তাই বলি এই ছন্দে একটি আধ্যাত্মিক গান রচনা করতে যাতে অবিকল এই সুরে গাওয়া যায়। সে গানটি তাঁর অসামান্য প্রতিভারই যোগ্য ব'লে আদ্যন্ত উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না :

আনো আনো অনল প্রাণে—আনো চিত্তে জ্যোতির্বাণী
মর্তে কর উদ্দীপিত আজি হে প্রলয়ঙ্কর হে রুদ্রাণী !
এ পৃথিবীতে আনো আলো
আনো মর্ত বিপর্যয় কালো :
আনো রক্ত অশনি উদ্ভাসে—লক লক লেহন ললক বিকাশে,
অসুর নিধন কর বহ্নির তালে রাখো যুগান্তর বসুধা ভালে।
যারা শয়ন-বিলগ্ন বিলাসে পঙ্ক-নিমজ্জিত জীবন-যাত্রী,
অন্তর জর্জর গরল অধর্মে—মর্ম অজাগর তামস রাত্রি,
তাণ্ডব-পাবক ছন্দ বিভাসি'
ছিন্ন করো সে—কুজ্ঝটি রাশি।
আনো রক্ত অশনি উদ্ভাসে······
ধ্বক ধ্বক ত্রিনয়ন হান সরোষে, নাচ ত্রিশূলি, হে রণচণ্ডি,
শঙ্খধ্বনিতে সঙ্গ মিলায়ে বাজুক ডম্বরু অম্বর খণ্ডি'।

দেব-অরাতির সংঘ বিনাশো,
ভয়াল অধরে অট অট হাসো।
আনো রক্ত অশনি উদ্ভাসে ···
লটপট পিঙ্গল জটার সাথে কুণ্ডল দলমল দলমল দোলে।
স্বয়ম্ভূ আসে আসে কালী কালভুজঙ্গী রঙ্গে ভোলে।
ভৈরব ভক্ত পুলক লভি জাগে,
কল্প প্রভাতিল শোণিত রাগে।
আনো রক্ত অশনি উদ্ভাসে···

পরমহংসদেব একেই বলতেন রিপুদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। "গণয়সি যদিদং বন্ধনমাত্রং—পশ্চাদ্রক্ষ্যসি মোচনদাত্রম্"। আজ যে তোমার পথের বাধা কাল সে-ই হবে তোমার পথের পাথেয়। ভাগবতে বড় সুন্দর ক'রে বলেছে এই কথাটি। পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—গোপীরা কামভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেও কেমন ক'রে লাভ করল প্রেম-বর? তাতে শুকদেব বলছেন:

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

অর্থাৎ ভগবানকে কাম ক্রোধ ভয় স্নেহ বন্ধুত্ব যে কোনো প্রবৃত্তি দিয়ে ভজনা করো না কেন ভজনা যথার্থ হ'লেই তন্ময়তা লাভ ক'রে মুক্তি।

কাম? কামনা করো ভগবানকে—তাঁর চেয়ে কাম্য বস্তু কে আছে এ জগতে? ক্রোধ? ক্রুদ্ধ হও, হও আধ্যাত্মিক পথের বাধাদের 'পরে। আমাদের নানা যোগে রিপুদের এভাবে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া একটি গুহ্য সাধনা ব'লে অঙ্গীকৃত। সন্তান-মমতা? তাকে মনে করো—গোপাল, কন্যাকে গৌরী, স্বামীকে শিব বা ব্রজেশ্বর ইত্যাদি।

গানের বেলায়ও এই কথা। যুদ্ধবিগ্রহের গানকে যদি আধ্যাত্মিক রণসঙ্গীতে রূপান্তরিত করি তবে এ সঙ্গীতের সমস্ত প্রাণশক্তির প্রবলতা আমাদের আধ্যাত্মিক পথের সহায় হয়—যা করেছিল আমাদের বহির্মুখী তা-ই দেয় অন্তর্মুখিতার শক্তি অতি সহজে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানুষের জীবন একটা চিরকালের যুদ্ধক্ষেত্র। কবি একথাটি বলেছেন তাঁর ওজস্বী কবিত্বে "পাষাণী"তে। পাষাণী অহল্যাকে ইন্দ্র ছেড়ে গেছে ভোগশেষের উচ্ছিষ্ট পাত্রের ম'ত। অহল্যা বলছে বিশ্বামিত্রকে যে পুরুষ জাতির 'পরে আর তার বিশ্বাস নেই, কারণ

সব পারে সে-পুরুষ
ঘুমন্ত পত্নীর গলে বসাইতে ছুরি ;
কলঙ্কিতে পাতিব্রত্য পাশব বিক্রমে
নম্র নবোঢ়ার ; ছুঁড়ে দিতে বালিকার
প্রস্ফুটিত প্রেমপুষ্প লোকাচার পদে ;
বলি দিতে স্নেহ ভক্তি ; ক্ষুধার্তের মুখে
দিতে ভস্ম ; তৃষ্ণার্তের মুখে বিষ দিতে ;
বিনাশিতে অনুকম্পা ; বধিতে বিশ্বাস।

তাতে রাম এগিয়ে এলেন, বললেন কোমল কঠিন ভৎর্সনায় :

মুগ্ধা হতভাগিনী তাপসী !
হারায়েছ মনুষ্যে বিশ্বাস এতদূর ?
এতদূর পতিতা কি ? কিম্বা যন্ত্রণায়
হারায়েছ জ্ঞান ? মূর্খ দোষে অন্যজনে
যবে সে বিবেকশূন্য, কর্তব্য স্খলিত
পড়ে গর্তে। মনুষ্যের জন্ম এ-জগতে
নহে ফুলখেলা দেবি। সতীত্ব, জীবন
ব্রহ্মাণ্ডের আক্রমণ হইতে নিয়ত
করিতে হইবে রক্ষা। শত প্রলোভনে
করিবেই আকর্ষণ তোমারে সবলে :
তোমারে রক্ষিতে হবে আপনারে বাঁধি,
বাধা ও বিপত্তি আসি' করিবে দুর্গম
জীবনের বর্ত্ম সদা। তোমায় তাহারে
লঙ্ঘন করিতে হবে আপনার বলে।
জীবন—সংগ্রাম। যদি নিঠুর জগৎ,
তুমিও কঠিন হও।

অহল্যা তাতে বলল : "হায় শক্তি নাই—" তামসিকতার সেই চিরন্তন ওজর।

রাম তাতে বললেন, যে কথা আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বহুলব্ধ অভিজ্ঞতা এই যে, প্রতি 'পারিনা'-র নিচে লুকিয়ে আছে 'চাই না'– চাইলে পারা যায়—when there is a will there is a way—যে সত্যি চায় ভগবান তাকে শক্তিও দেন – চিরদিন অশক্ত থাকে সে-ই যে শক্তির সাধনা করতেই অনিচ্ছুক। বললেন রাম :

শক্তি নাই ? মূঢ় ! শক্তি আছে, ইচ্ছা নাই।
বিবেক উদ্যম নাই। প্রলোভনে নিজে
চরণ বাড়ায়ে দাও—পরে রুষ্ট হও
বন্দী হও যবে সে শৃঙ্খলে। সন্ধি করো
পাতকের সনে—পরে দেখ রুদ্ধ যবে
স্বর্গদ্বার—ক্রুদ্ধ হও। স্বহস্তে রোপণ
করো নিজে বিষবৃক্ষ—পরে দ্বন্দ্ব করো
বিধাতার সনে যদি না ফলে অমৃত।

আমাদের পৌরাণিক দেবাসুরের যুদ্ধবিগ্রহ এই ভাবে গ্রহণীয়। আমাদের প্রতি সত্তাই দেবাসুরের রণক্ষেত্র। সংগ্রাম না করে উপায় কি ? শক্তি নেই বললে চলবে কেন ? জীবনের তীর্থযাত্রা "তমসার থেকে জ্যোতির্লোকে"- "মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে"—সাধনা এই যাত্রার দামও বটে পাথেয়ও বটে। চাইতেই হবে এ শক্তিকে। "ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য"কে পদে পদে ত্যাগ করে উঠতে হবে। মমতায় নয়—হ'তে হবে নির্মম। কার প্রতি ! আমাদের আত্মসাক্ষাৎকারের পথের অন্তরায়দের প্রতি। তাই পরমহংসদেব বারবার বলতেন "রোখ চাই ম্যাদামারা হ'লে সাধনা হয় না।"

এইই যদি হয় সত্য তাহ'লে জীবনে শুধু প্রেমকে সম্বল ক'রে চললে চলবে না। শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণী আছে যে প্রেমের ইমারৎ জগতে খাড়া রাখা যেতে পারে শুধু শক্তির স্তম্ভের উপরে। তাই যুগে যুগে ভাগবত প্রেম এসে ব্যাহত হ'য়ে ফিরে গেছে। বলতে কি, আসুরিক শক্তির সঙ্গে রণ এ হ'ল প্রেমেরই উল্টো পিঠ। এই জন্যেই হিন্দুধর্মের একটি অতি গভীর উপাসনা দেবীকে রৌদ্রা রূপে বরণ করা। চণ্ডীতে তাই প্রণাম রয়েছে : "রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ"—যিনি নিত্যা তিনিই রৌদ্রা—উভয়কেই প্রণাম। কেন প্রণাম ? কারণ যাকে প্রণাম করি শ্রদ্ধার সঙ্গে তার সত্তা পাই শক্তিরূপিণীকে যখন বলি "যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" তখন হৃদয়ের বাতায়ন খুলি তাঁর শান্তিচন্দ্রকিরণের পানে। কিন্তু তা ব'লে শুধু শান্তি তো জীবন নয়, তাই তাঁর "অতিসৌম্যার্তে রৌদ্রায়ৈঃ"—অতিসৌম্যা ও অতিরৌদ্রা দুই রূপকেই যুগপৎ বলা হয়েছে "নমোনমঃ"। এ হ'ল হিন্দু সাধনার একটি গুহ্য কথা—"তাঁকে ভয় করলে আর কোনো ভয় থাকে না।"

এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর কালীস্তবে যে মহাকালীর চামুণ্ডা মূর্তি আসলে নিষ্ঠুর নয়, বরং সেই তো করুণাময়ী -কেন না মহাকালীর প্রচণ্ড আবির্ভাব বিনা মানুষের উর্ধ্ববিকাশের পথের বাধা দূর হ'তে যুগ যুগান্তর কেটে যেত।

কিন্তু হাল আমলে আমরা বাঙালি একটু বেশি ক'রে অতিলালিত ধ্বনিসুখচর্চায় ব্রতী হয়ে পড়েছি। তাই মঞ্জুল ঝংকারে আমরা উচ্ছ্বসিত হ'তে ভয় পাই না ভয় পাই ওজস্বী কাব্যের মধ্যে গভীর কাব্যরস আছে একথা স্বীকার করতে। এই কারণেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের জীমূতমন্দ্রের বাণীটি আমাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করলেও এখন পর্যন্ত মরমে পশে নি তেমন ক'রে। আমি বলছি না মধুসূদনের মধ্যে দোষ কটি ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিচার হবে তাঁর ওজস্বিতার দানে। ইংরাজি কাব্যে austerity বলতে যা বোঝায় তা বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আগে কেউ আনে নি। এ ওজস্বিতার আরো বিকাশ হ'তে পারত, কিন্তু তাঁর পরে এক দ্বিজেন্দ্রলাল ও ও মোহিতলাল ছাড়া আর কেউ তাঁর ওজস্বিতার উত্তরাধিকারী হবার প্রেরণা বা প্রয়াস পান নি। আর বোধহয় সেই জন্যেই এই তুচ্ছন কবি বঙ্গসাহিত্যে আজো সে স্বীকৃতি পান নি যে-স্বীকৃতি তাঁদের প্রাপ্য। এবং ঠিক এই কারণেই আজ এ কথা নানামুখে ধ্বনিত হচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাও তেমন কিছু না। কিন্তু আদরণীয়ের অনাদরে লজ্জাটা তো আসলে অনাদৃতের নয় পূজ্যপূজাব্যতিক্রম যে জাতীয় অবনতির —decadence-এর অগ্রদূত এতো মনগড়া কথা নয় ইতিহাসের সাক্ষ্য।

আমি বলছি না কাব্যে শ্রুতিমাধুর্যের দাম কম। কিন্তু ওজস্বিতার মধ্যে যে ধ্বনি সম্পদ আছে তার সৌন্দর্যও একটা গভীর সৌন্দর্য।

ভীষ্মকে যখন অম্বা প্রলুব্ধ করতে এল কবির ভীষ্ম নাটকে বলল :

"এসো প্রিয়তম! এই দুঃখের সংসার
দুদিন বই তো নয়। ভোগ ক'রে লও।"

তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভীষ্ম বলল :

"রমণী! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই অটল অচল।
নহে ইহা ভীরুর ভঙ্গুর অঙ্গীকার
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ
গ্রহ যদি কক্ষচ্যুত হয়, চন্দ্র যদি
অগ্নিবৃষ্টি করে · নক্ষত্র নিভিয়া যায়,
পর্বত ভাঙিয়া পড়ে বালুস্তূপ সম,
শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোষ্পদের মত
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না কদাপি :
ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মাঝে, বিক্ষোভিত

সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের
মিথ্যাবাদ মাঝে, এই প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের
অটল উজ্জ্বল—সব নক্ষত্রের মাঝে
যেমতি ভাস্বর স্থির ঐ ধ্রুবতারা।"

তবে বড়র জন্যে ছোটকে ছাড়বার তপস্যা না করলে, শুধু ঝংকারবৃত্তির অনুশীলনের পথে চললে--কেবল "আবেশে ভরল তনু হরল গেয়ান" অবস্থার গদগদমন্ত্রে দীক্ষা নিলে কোনো গভীর মেঘমন্দ্রই কানে প্রবেশ করে না। তাই সেদিন একজন মস্ত সাহিত্যরথী আমাকে পত্রে অম্লানবদনে একথা লিখতে সাহস করলেন যে, মধুসূদনকে তিনি কোনোদিন কবিই মনে করেন নি। তাকে দোষ দেবার জন্যে একথার উল্লেখ করছি না কারণ এক্ষেত্রে দোষ দেওয়া নিষ্ফল। তার কানে মধুসূদনের কাব্য ভালো লাগে না এর উপায় কি? কেবল এই কথাটা সবিনয়ে নিবেদন করা চলে যে ভালো যা সবই প্রথম থেকেই ভালো লাগে না। শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা করতে করতে তবে অন্তঃশ্রুতি খোলে।

কিন্তু যা বলছিলাম। জীবনে কোনো বড সাধনা যাঁরা করেছেন তাদের ছোট অনেক কিছুকেই ছাড়তে হয়েছে ঈপ্সিতের জন্যে। এ ছাড়া কঠিন। বাধাকে বাধা জেনেও তাকে সরিয়ে দিতে মনপ্রাণ টনটন করে ওঠে। "জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে" এ হল সাধনার একটি গোড়াকার অভিজ্ঞতা। এরই নাম সংগ্রাম। মঞ্জু গুঞ্জরণ সুন্দর জিনিস, শান্তিও জীবনের একটি পরম সম্পদ কিন্তু ভগবানের বিভূতি শুধু শান্তি বা মঞ্জুলতা নয়। তার একটা বিরাট ঐশ্বর্যের দিক আছে শক্তি। শুধু বীর্যেই এর প্রকাশ নয়—তপস্যার দৃঢ়সংকল্পী নিষ্ঠায়ও এই শক্তিরই অভিব্যক্তি। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে এই শক্তির প্রধান প্রকাশ হয়েছে -পৌরুষে, ওজসে, দার্ঢ্যে। ভীষ্ম বলছে গুরু পরশুরামকে:

জানো কি হে ভগবান কেন ভীষ্ম নাম
আমার জগতে? পাই নাই এই নাম
সম্ভোগ বাসনা তৃপ্ত করিয়া আমার।
এই ব্রহ্মচর্যব্রত, এ কঠোর ব্রত
কুসুমস্তবক শয্যা নহে গুরুদেব।
বঞ্চিত সম্ভোগ-সুখে সমস্ত জীবন
বঞ্চিত নারীর প্রেমে সমস্ত জীবন
বঞ্চিত সন্তান সুখে সমস্ত জীবন।

তবে কৃচ্ছ্র—asceticism—নাম দিয়ে হেসে উড়িয়ে দিলে জীবনের একটি মস্ত রহস্য বোঝাই যাবে না—শক্তি রহস্য। কেন মানুষ যুগ যুগ ধরে চেয়েছে—অসাধ্য সাধন করতে কেন সে "কুসুমস্তবকশয্যা" ছেড়ে ছুটেছে দলে দলে "শরশয্যা" বরণ করতে এটুকু না বুঝলে অন্তরাত্মার একটি গভীর দৈববাণীই অশ্রুত থেকে যাবে। এই দৈববাণীর কথা শ্রীঅরবিন্দ বড় সুন্দর করে লিখেছেন তাঁর Life divine-এ Refusal of the Ascetic-অধ্যায়ে। বলছেন যে উদাসী কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন আছেই "It corresponds to a truth of existence, a state of the conscious realisation which stands at the summit of our possibility."

উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ জীবনে আরো গভীরভাবে বুঝেছিলেন যে বঙ্গভাষাকে অতিলালিত্যের সহজ সংস্কার থেকে মুক্তি না দিলে ভাষার নিরাভরণ মূর্তির রূপবাণী তার কানে ঝংকৃত হবে না। বুঝেছিলেন ব'লেই তিনি তাঁর আলেখ্যে স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তন করেন * যাতে তিনি ইচ্ছা ক'রেই ঝুঁকেছিলেন ভাষার সরলতার দিকে—হইতেছি করিতেছি ক্রিয়াপদ বর্জন ক'রে হচ্ছি করছি-র নিত্যপ্রয়োগের দিকে। বহু অলংকৃত ভাষায় তিনি অনেক কবিতা গানই লিখেছেন

একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর।

বা

আমি চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে ধীরে দিবা হয় অবসান
আমি নিশীথে নয়ন নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ উপাধান।

তাঁর নানা গদ্যেও অতি অপূর্ব শব্দসম্পদ ও ঝংকার মেলে (যথা চন্দ্রগুপ্তে)

"প্রাবৃটে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীরগর্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের ম'ত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের ম'ত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।"

বাংলাভাষার মধ্যে তিনি যে একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সে কবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভাষাসৃষ্টিতে অনন্যতন্ত্র : একমাত্র তিনিই রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য ভাষাভঙ্গির প্রভাবের কেন্দ্রের মধ্যে থেকেও একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে চলতে পেরেছিলেন আমরণ। সর্ববিষেই তাঁর একটা স্বাধীন মত ও

* এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম সম্বন্ধে আমার "ছান্দসিকী" পুস্তকে লিখেছি বিশদ ক'রে।

প্রকাশভঙ্গি ছিল—সে মত ও ভঙ্গি নানা সময়ে বদ্‌লেছে। (না-বদলানো জীবন্ত মানুষের লক্ষণ নয়।) কিন্তু বদ্‌লেছে তাঁর নিজের প্রেরণা ও প্রতিভারই ইঙ্গিতপথে। নিজের কাছে তিনি খাঁটি থাকতে চাইতেন—কি সাহিত্যে কি জীবনে। তাই শেষ জীবনে তিনি যেই অনুভব করলেন যে "যেখানে বাংলা শব্দ বা বচন আসল বাংলা ভাবটি বেশি জোরে প্রকাশ করে নিজের জোরে দাঁড়াতে পারে সেখানে সেই বাংলা শব্দ ও বচনই ব্যবহার করা কর্তব্য," (আলেখ্য—ভূমিকা) সেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ছেড়ে একেবারে স্বরবৃত্ত ছন্দে নেমে এলেন। এ অবতরণের ফলে তাঁর হাতে হ'ল একটি আশ্চর্য নবছন্দের আবিষ্কার যে ছন্দ তাঁর আগে কেউ লেখেনি সাবলীল ভঙ্গিতে। সেই ছন্দই হ'ল স্বরাক্ষরিত ছন্দ যাতে প্রাকৃত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কখনো মিশ্রিত হ'ল সাধুভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য--কখনো যোগ দিল ঘরোয়া বাক্যভঙ্গির নিরাভরণ সরলতা--কখনো ওয়র্ডসওয়র্থ ও ব্রাউনিং-ভঙ্গিম ruggedness বা অলংকৃত জোরালো ইডিয়ম। এই নব ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের চোখে পড়েছে কিন্তু এ ছন্দ নিয়ে আর যে বেশি আলোচনা হয় নি তার মূল কারণ আমরা, বাঙালি জাতি, এখনো অনলংকৃত সারল্যের মধ্যে কবিত্বের ধ্বনি শুনতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠিনি। আমি বলছি না স্বরাক্ষরিক ছন্দের নবভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সর্বত্রই কাব্যোত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রেরণার মুহূর্তে এ ছন্দে তিনি যে স্বরবৃত্তের চিরসুন্দর সারল্যের সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের ওজস্ তথা গাম্ভীর্য মিশিয়ে বঙ্গবাণীর উদ্যানে একটি নববীথিকা রোপণ করেছেন একথা মাত্র সম্প্রতি স্বীকৃত হ'তে আরম্ভ হয়েছে।* স্মৃতিকথায় সাহিত্য বিচারের উগ্র আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয় ব'লে এসম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হব: "আলেখ্য" থেকে কবির "সত্যযুগ" কবিতাটির শেষ স্তবকটি উদ্ধৃত ক'রে:

> আমি দেখেছি যেন দূরে, দূরস্বপ্নে অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান:
> যেখানে সৌন্দর্য-উৎস উঠছে ও ঝংকৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
> গড়ছি মনে মনে একটি উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যতে ব'সে আমরা কবি,
> (যেমন মাতা মনে মনে গর্ভস্থ সন্তানের একটি গড়ে মুখচ্ছবি)
> যেখানে এই পৃথিবীর এ-দুঃখ জ্বালা বিষাদ বিরাগ র'বে না এভাবে;
> যেখানে এই বর্তমানের অভাব, ত্রুটি, অপূর্ণতা পূর্ণ হ'য়ে যাবে;
> বন্ধুর হবে মসৃণ, ও ঢেকে যাবে গিরিগুহা আলোকিত হ্রদে;

* শ্রীসজনীকান্ত দাসের "কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়" নিবন্ধ— ভৈরব পত্রিকা—শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫০

কর্কশ যাহা—হবে মধুর ; শূন্য হবে পরিপূর্ণ সৌন্দয সম্পদে ;
যেখানে অদৃশ্য হবে দৃশ্যমান : অশ্রুত যাহা হবে পরিশ্রুত :
যেখানে অব্যক্ত হবে ব্যক্ত ; ও অননুভূত হবে অনুভূত ;
চিন্তা হবে বর্ণময়ী ; বৃত্তি হবে মূর্তিময়ী ; লীলাময়ী এত ;
অবোধ্য যা বোধ্য হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; অজ্ঞাত যা জ্ঞাত ;
দুরন্ত অতীত হবে ; জটিল যাহা সহজ হবে ; দুঃখ হবে দূর ;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে ; ইচ্ছা হবে ফলবতী, কায সুমধুর ,
আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, যে গগনে গগনে ব্যাপ্ত মহা ভবিষ্যৎ।

এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম দেখাতে তিনটি জিনিস :

(১) দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরাত্মা ছিল কবির স্বধর্মে তিনি ছিলেন প্রেমিক এবং স্বপনী।

(২) তিনি ছিলেন স্বভাবে অনন্যতন্ত্র, এ কেবল বড় প্রতিভাই পারে।

(৩) তাঁর ভঙ্গি ছিল পুরোপুরি পুরুষালি।

এই ভঙ্গি সম্প্রতি আমাদের—বাঙালির কানে তেমন শ্রুতিমধুর মনে হয়নি, কিন্তু সে দোষ ভঙ্গির নয়। সে দোষ কর্ণের। পৌরুষে রস পেতে জাতীয় জীবনে পৌরুষে আনন্দলাভ করতে শেখা চাই। সহজ শ্রুতিবিলাপের কোঠা পেরিয়ে ওজনের কঠিন ছন্দবিলাসের এলাকায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। এক কথায় ওজস্বিতার আনন্দলোকে জেগে উঠবার অভীপ্সা চাই। নৈলে হৃদয় দুয়ার বন্ধ করে রাখা হয়—নবারুণের নবদীপ্তি প্রবেশ করবে কোন্ পথ দিয়ে? শ্রীঅরবিন্দের চরণছায়ায় এসে গভীর ক'রে উপলব্ধি ক'রেছি একটা কথা : যে, আলো-কে চাইতে হয় তবে সে নামে আমাদের আঁধার আধারে—না চাইলে সে আসে না—কারণ আলোক-অধিপ পথ দেখান কিন্তু ধাক্কা দিয়ে চালান না—"The divine can lead but He dose not drive" লিখেছিলেন তিনি আমাকে একটি পত্রে।

শিল্পকলার বেলায়ও এই কথা, কেননা শিল্পকলা ভগবানের একটি শ্রেষ্ঠ বিভূতি তার প্রকাশ মূর্তির রূপের সর্বাঙ্গসুন্দরতায়—perfection of form-এ : কিন্তু রূপেরও নানা ছাঁচ, নানা ধাঁচ, নানা মেজাজ, ছন্দ, ধারা। কাব্যে ও গানে ওজস একটি মস্ত ধারা। কিন্তু ওজসের মধ্যে রস পেতে হ'লে খানিকটা ওজস্বী হ'তে হ'বে। বলিষ্ঠতার দুর্দম উচ্ছ্বাসে মানুষ সংকটপথে অগ্রসর হয় বহুদুঃখ বরণ ক'রে—সে দুঃখে গভীর আনন্দ পায় মানুষ—কিন্তু কারা পায়? যারা বলিষ্ঠ তারাই—যারা ক্লীব তারা না।

এইজন্যেই উপনিষদ বলেছে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। কিন্তু একথা তাঁদের কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে কী ক'রে যাঁরা (ঐ মধুসূদনের ক্রিটিকের ম'ত) জীবনে ওজসকে কাব্য ব'লে চিনতেই শিখলেন না—যিনি রস বলতে বুঝলেন শুধু অতি সস্তা রসাল ইয়ার্কি, কবির ভাষায় বলতে হয় :

মণির আদর রত্নবণিক বিনা কি
বুঝে শাখামৃগ ?

তেজস্বিতাকে জীবনের একটি পরম ঈপ্সিত বর ব'লে না চিনলে তেজস্বিতার সমারোহে অল্পবিলাসী মন পারে না সাড়া দিতে—বলে : "এতে রস কোথায় ?" এইজন্যে মিলটনের আবির্ভাবে সাড়া পড়তে দেরি হয়েছিল কিন্তু টেনিসনের মঞ্জু শিহরণে ইংলণ্ডে সবাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল প্রথম দিকে।

এর কারণ, মানুষ সাধারণত অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়বিলাসী। কান যাতে সহজেই খুসি হয় তাতে সে সহজেই জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে – কিনা অতি লালিত ঝংকার পেলে। এর খুবই মূল্য আছে—সবাই মান্‌বে। কিন্তু সব মেনেও বলতেই হবে নিরাভরণ তেজস্বিতার মধ্যেও আছে এমন এক অপূর্ব প্রবল যা বহু অলংকারের মিলিত নিক্বণের মধ্যেও নেই। কিন্তু এ প্রস্বনকে চিনতে হ'লে কান ও প্রাণকে সব আগে দীক্ষা নিতে হবে শক্তিমন্ত্রের।

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ছিল সেই ধরণের স্বতোবিরোধ যা বড় প্রতিভা বড় মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব তথা প্রকাশ্য শাক্ত। তাই চিরজীবন শক্তির সাধক তিনি শেষ-জীবনের কোঠায় এসে বুঝেছিলেন প্রেমের কাছে আত্মদানের চেয়ে মহত্তর শক্তি আর নেই। তাই তাঁর শেষ জীবনের গভীরায়মান শক্তি নিরন্তরই নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে ভক্তিতে :

ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম শিল্প ধর্ম শিক্ষা।

অথচ সে ভক্তি ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে শক্তির অঙ্গীকারে :

আর্যঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র
নহকি মা তুমি সে ভারতভূমি নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র।
তাঁদের গরিমা স্মৃতির বর্মে চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ
যাদের গরিমাময় এ অতীত তারা কখনই নহেক তুচ্ছ।

এর মধ্যে যে আত্মার ঝংকার সে চিরন্তন। তাই এ শ্রেণীর গানকে ডিশমিশ বলা যায় না 'পেটিয়টিক' বলে, এর মূল বাণী হল আত্মার উদ্বোধন। একথা আরো উজ্জ্বল ভাবে বুঝতে পারি এ গানটির শ্রীঅরবিন্দ কৃত অনুবাদে :

India, my India, where first human eyes awoke to
heavenly light,
All Asia's holy place of pilgrimage, great Motherland
of might !
World mother, first giver to humankind of philosophy
and sacred lore,
Knowledge thou gav'st to man, God love, works, art,
religion's open door.

Art thou not she, that India, where the Aryan Rishis
chanted high
The Veda's deep and dateless hymns and are we not
their progeny ?
Armed with that great tradition we shall walk the earth
with heads unbowed :
O Mother, those who bear that glorious past may well be
brave and proud.

ইংরাজিতে এ-উদ্ধৃতিটুকু দিলাম আরো দেখাতে কোন্‌খানে কবি বিদেশের প্রাণশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—বাংলা "ভারতবর্ষে"র মধ্যে আছে ইংরাজির সহজ প্রচুর ওজস্‌। এ অনুপ্রাণনায় শুধু যে দোষের কিছুই নেই তাই নয়—জীবন্ত মানুষের কাছে আমরা তো প্রত্যাশা করব এই সাড়া—নির্ভীকতায়, ভক্তিতে, বীর্যে।

তবে এ-ও মনে রাখা চাই যে এ নির্ভীকতা ছিল কবির রক্তে সুপ্ত হয়ে তাই বিলেত যেতে না যেতে সে জেগে উঠেছিল যথা (LYRICS OF IND) :

No, tell us not, thou dark-browed prophet,
There is a hell beyond the grave,
Where icy Torments glare and torture,
And fiery Furies hiss and rave.

Then crouch no more with fawning faces,
Come with your shivering fears away ;
This world with woes is still a garden,
Make life itself a holiday.'

No mighty despot frowns and threatens
To hurl us to eternal fire ;
Fair Nature rules and not a tyrant.
She burns with love and not with ire.

বলে তাঁর সর্বোত্তম মন্ত্রের পাঠ দিচ্ছেন কবি :

No "deluge", "plague," no "snake", no "famine",
No frowns, no lurid glares above
Can win our love, though they may threaten ;
Love only can command our love.

(PSALM OF LIFE-- কবিতা)

এই মন্ত্রই তাঁর উত্তর জীবনে রূপ নিয়েছিল ধ্যানদৃষ্টিতে। এ ধ্যানের বীজ তাঁর মধ্যে ছিল প্রথম থেকেই কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন তিনি একটু বেশি র‍্যাশনালিস্ট, তার্কিক। এখানেও তাঁর উপর য়ুরোপের ছাপ না পড়েই উপায় ছিল না কারণ যুক্তিতর্ক—Reason-এর একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি এইখানেই যে সে স্বভাববলিষ্ঠ। পরমুখাপেক্ষী হতে যে চায় না বলেই সে স্বতই যুক্তিতর্কের আত্মম্ভরিতাকে বলিষ্ঠতা ভেবে বসে। উদাহরণতঃ, তিনি বাইশ বৎসর বয়সে বিলেতের আবহাওয়ায় দৃপ্তস্বরে বলেছিলেন যে অতীতের ভগবানকে পূজা করা আর চলবে না--অতীতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমাদের এখন করতে হবে নবপূজা এক নব দেবের, যাঁর নাম হল 'সত্য' আর উপচার হল 'যুক্তি' :

Those years are o'er, our faith shall no more
Be built on love or hope fear ;
Reasons our worship, Truth our God
He grows diviner year by year. *

* Lyrics of Ind—The Prophet কবিতা দ্রষ্টব্য।

একে নাস্তিকতা বলতে চান বলতে পারেন। কারণ বুদ্ধির চেয়ে বড় কিছু নেই একথা বলা এক ধরণের নাস্তিকতা বৈ কি। কিন্তু সত্য আস্তিকতায় পৌঁছতে হয় নাস্তিকতার মধ্যে দিয়েই "আদিত্যবর্ণ পুরুষ" থাকেন যে "তমসার পারেই।"

তাই বিলেত থেকে ফিরে তিনি ক্রমাগত সত্যকে যাচাই করতে চাইতেন যুক্তিতর্কের নিকষে। আমরা আবাল্য তাঁর তার্কিক রূপ দেখেছি যে কতভাবে। মনে পড়ে গয়ায় লোকেন কাকার সঙ্গে সে কী তুমুল তর্ক দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তাঁর সমকক্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তিনি খুব বেশি পেতেন না তো—তাই লোকেন কাকাকে দুদিনেই বরণ করে নিয়েছিলেন যেন কত কালের বন্ধু। আমার সে সময়ে বয়স খুবই কম সাত আটের কোঠায়, কাজেই সে সব জ্ঞানগর্ভ উদ্দীপক আলোচনার খুব কমই বুঝতে পারতাম। কিন্তু পরে যখন বুঝবার কিনারায় এসেছিলাম তখন মনে হত কবি তর্ক করতেন সত্যিই জানতে চেয়ে—ভাবতেন বুদ্ধি বিচারের মধ্যে দিয়ে আলোর আবাহন সম্ভব। এ-ধারণায় তিনি জোর পেয়েছিলেন য়ুরোপের বুদ্ধিবাদ থেকে। কিন্তু য়ুরোপের শিক্ষার বহির্বাস তাঁর উদাসী চিত্তে আর তেমন উজ্জ্বল মনে হত না যখন তিনি ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলেন :

সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমির রাশি
স্ফুলিঙ্গ সম এ আঁধারে মোরা কোথা হতে ছুটে আসি!
কতটুকু পথ আলোকিত করি কিছু দেখিতে না পাই
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।

এ-অপরূপ গানটির বেদনা তাঁর কণ্ঠস্বরের উদাস সুরে যেন আরো মূর্ত হয়ে উঠত। সে বেদনার মূলে ছিল এই চেতনা যে জীবন রহস্যের বিরাট অন্ধকার যেন ঠাট্টা করছে আমাদের বুদ্ধির দীপশিখাকে :

অস্ফুট ভাতি উপহাস করি প্রদীপ শিখার পাছে
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে।

তাই তিনি চেয়েছিলেন ফিরতে ভারতের সনাতন আদর্শে বুদ্ধি তাকে সমর্থন করুক বা না করুক :

পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা তাহাই শুধু চরম নয়,
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠ পরের জন্য ভীষ্মের প্রাণ,

ভগীরথের তপস্যা ও দধীচির সেই অস্থিদান,
গান্ধারীর সেই স্নেহের উপর স্বকীয় কর্তব্য জ্ঞান,
সীতার সে স্বর্গীয় ক্ষমার আলোকিত উপাখ্যান,
বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস,
প্রতাপসিংহের দারিদ্র্য ও দুর্গাদাসের ইতিহাস,
সেই রাজ্যে নিয়ে যারে, কাঁদার মত কাঁদিয়ে দে
জাগিয়ে দে, লাগিয়ে দে, নাচিয়ে দে, মাতিয়ে দে;
উঠুক বন্যা, যেন তাহা স্বর্গের রাজ্যে ছড়িয়ে যায়
শেষে প্রাণের উজান টানে মায়ের পায়ে গড়িয়ে যায়।

তিনি ছিলেন স্বভাবে স্বধর্মে কবি—কাজেই সুন্দরের প্রতি মহত্ত্বের প্রতি তাঁর এ-টানও ছিল তাঁর স্বধর্ম। এতে আশ্চয কিছু নেই। আশ্চর্য যদি কিছু থাকে তবে তা এই যে এই মানুষ যখন তর্ক করত তখন সে হয়ে দাঁড়াত অপরাজেয় যুক্তিবীর। অবশ্য তর্কে তিনি হারতেনও—গিরিশ মেশোই তো সময় সময় তাঁকে হারিয়ে দিতেন—তখন তিনি অট্টহাস্য করে বলতেন "আজ তোর মেশো হারিয়ে দিল রে মণ্টু—ও দারুণ তার্কিক— উঃ!" কিন্তু মেশোই হারতেন বেশি।

তর্কের কথা বলতে মনে পড়ল--তিনি অনেক সময় তর্ক করতেন যেমন আমরা তাস খেলি। মানে, আমোদ পেতেই। বলতেন: "আমার তর্ক পেয়েছে এসো তর্ক করা যাক।" সময়ে সময়ে বাড়ি ব'য়ে যেতেন কোনো তার্কিক বন্ধুর ওখানে। "কী দ্বিজুবাবু? এসময়ে?"

দ্বিজু বাবু (করুণ হেসে): তর্ক পেয়েছে—

বন্ধু (হেসে): আসুন আসুন।

সুরু হত তর্ক। চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। *

আমি এই ভাবে আশৈশব তর্ক শুনতে শুনতেই তার্কিক হয়ে উঠেছিলাম। মনে আছে আমার বালক মনে শিহরণ জাগত তর্করণের কল্লোলে। অনেক সময় এ রকমও দেখেছি. ধরুন বিধবাবিবাহ। কবি বললেন হয়ত এসো হরিদাস † আজ আমি বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তুমি স্বপক্ষে। হরিদাস বাবু খুব তর্ক সুরু করলেন। কিন্তু শেষটা মানতে হল হার। কবি হো হো করে হেসে বললেন আচ্ছা এবার তর্ক করা যাক

* সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে কবির এই রকমের তর্ক প্রায়ই হত।

† হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী। এ গল্প তিনি আজো করেন।

আমি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে, তুমি বিপক্ষে। ফের তর্ক হল—ও ফের হরিদাস বাবু হার মানলেন।

এই করে করে তাঁর দারুণ খ্যাতি হয়ে উঠেছিল তার্কিক বলে। এ তর্কের খুব উজ্জ্বল প্রমাণ আছে আলেখ্যে তাঁর "মদ্যপ" কবিতায়। সে বিতণ্ডার রীতি হচ্ছে এক একটা যুক্তি নিয়ে বুদ্ধির লকড়ি খেলা। যেমন ধরুন সুরা পানের বিরোধী প্রতিপক্ষ যদি বললেন এ অপব্যয়, অমনি উত্তর:

"পয়সা বেশি খরচ হয়? তা হয় না আতর গোলাপ মেখে?
লাণ্ডো ফেটিন হাঁকিয়ে? কি চৌরঙ্গিতে বাড়ি রেখে?
তাকে তুমি নিন্দা করো? বরং বলো 'দরাজ বটে!'
একটা গেলাস ব্রাণ্ডি খেলেই বিশ্বশুদ্ধ কেন চটে?

বদ্ধিলোপের যুক্তির উত্তরটি আরো চমকে দেয়:

"আমি বলি: মানুষের এ-বুদ্ধিবৃত্তির তীব্রজ্বালায়
মাঝে মাঝে এমনি হয় যে ইচ্ছা হয় যে ছুটে পালাই।
রোগে শোকে অপমানে মানুষ যখন তীব্র ক্ষত
তখন এ বিস্মৃতি আসে যেন একটা সুখের মত।
বুদ্ধিবৃত্তির রাজ্যে সে তো পড়েই আমি নিত্য কাজে
মন্দ কি এ নেশার রাজ্যে ছুটি নেওয়া মাঝে মাঝে?···
আর সে বলো দেখি দাদা, সুরার মত নেশা আছে?

কিন্তু আরো তো যুক্তি আছে সুরাপানের বিরুদ্ধে তাদেরও জবাব চাই, তাই কবি বলছেন:

"আছে বিপদ সুরাপানে, সেটা আমি বিশেষ জানি
তবে কেন বিপদটাকে ঘরের মধ্যে টেনে আনি?...
জানো না কি বিপদ এবং আমোদেই ঘেঁষাঘেষি?
যেইখানে বিপদ অধিক সেইখানে আমোদ বেশি।
দৃষ্টান্ত যথা, মানুষ-ঠেলা গাড়ি করেও যাওয়া যায় না কোনো গতিক?
তাহার চেয়ে তেজী ঘোড়া চড়ায় নয় কি আমোদ অধিক?
তাকে দমন করতে পারায় তাকে নিজের বশে আনায়
যদিও তা করতে গিয়ে কেহ গিয়ে পড়ে খানায়।
তবুও তাতে স্ফুর্তি একটা বিশেষ রকম আছে যেন
বিপদ আছে বলেই স্ফূর্তি, নৈলে লোকে চড়ে কেন?

লাঠির চেয়ে তরোয়ালের খেলাই কেন করতে আসে !
শশক শিকার চেয়ে কেন ব্যাঘ্র শিকার ভালোবাসে ?
বিপদ আছে সুরাপানে বলেই তাতে এমন মজা
বিপদটাকে পেড়ে ফেলে উড়ায়ে দি জয়ধ্বজা।"

এই রকম আরো নানা যুক্তি তর্ক আছে এ কবিতাটিতে। সেগুলির সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে তর্ক হিসেবে সেগুলি অতি উপভোগ্য—কেবল এ উপভোগের রস পেতে হলে একটু দিলদরিয়া হতে হয় শুচিব্রতী বা সংস্কার-ভীরু হলে "শক্" লাগবেই।

কিন্তু তবু কবি জানতেন যে এরই নাম তর্কের জন্যে তর্ক ক্রমে ক্রমে টেরও পাচ্ছিলেন যে যুক্তির উপচারে সত্যের আরাধনা সুনির্বাহিত হয় না—সে পূজায় আরো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আছে। তাই এ কবিতাটির শেষে কবি বলছেন যে সুরাপানের উকিল এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধু চলে গেলেন ও ধীরে ধীরে হল তাঁর অধঃপতন। তারপর

"বারো বছর পরে দেখা বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতায়
একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন গৃহে, বৌবাজারে মোড়ের মাথায়।
"একী বন্ধু ? এ অবস্থা ? হেন স্থানে ? হেন বেশে ?
ওহে বন্ধু ! বলেইছিলাম ইহাই হবে পরিশেষে !
সেদিন তর্ক করে ইহাই বুঝিয়ে তোমায় দিতেছিলাম।
বললেন বন্ধু করুণ হেসে "তর্কে কিন্তু জিতেছিলাম।"

এ কবিতাটি থেকে এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি করলাম ইচ্ছে করেই। কবিকে বুঝতে হলে তাঁর মধ্যে বলিষ্ঠ তার্কিকের রূপটি বুঝতে হবে। নৈলে তাঁর চরিত্রের তথা সাহিত্যের একটি প্রধান প্রবণতাকেই বুঝতে পারা যাবে না। এইটে বুঝতে হবে যে তিনি সত্যের সন্ধান চাইলেও সত্যিই বহুদিন পরে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছিলেন যে বুদ্ধির এক-রোখা পথেই পরম সত্যের দেখা মিলবে। ক্রমশ যখন উপলব্ধি করলেন ধীরে ধীরে যে আমাদের সত্তার মাত্র একটা প্রকাশ বুদ্ধিতে তখন বুঝলেন যে খণ্ড শক্তি দিয়ে বোঝা যায় না অখণ্ডকে। কিন্তু তবু তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ছিল বহুদিন। কী ভাবে বলি—কারণ ঘটনাটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট মনে আছে।

সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের কথা বলেছি প্রথমেই, হয়ত মনে থাকতে পারে! তিনি ছিলেন শুধু মহাপণ্ডিত নয়, মহাতার্কিকও। কিন্তু তাঁর কিছু গভীর বোধও ছিল। তাই তিনি সেদিন কবিকে বলছিলেন (বলি আমার নিজের ভাষায়):

"দ্বিজুবাবু, আপনি শুনলাম দারুণ তার্কিক। কিন্তু তর্কে মেলে না সত্যকে নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।'

কবি (বিনীত কিন্তু দৃঢ় স্বরে) : কিন্তু কোন্ পথে মেলে তাহ'লে ?

সামশ্রমী : সে প'থ আছে—শাস্ত্রে—

কবি : শাস্ত্রের নজির দেবেন না। কেন না শাস্ত্রকে স্বীকার করি আমরা তখনই যখন তার বিধানে আমাদের মন সাড়া দেয় ! কিন্তু যখন সাড়া না দেয়—

সামশ্রমী : শ্রদ্ধা—নিষ্ঠা—

কবি : বিশ্বাস এনে তবে তো শ্রদ্ধা নিষ্ঠা। কিন্তু বিশ্বাসই যখন আসেনি ?

সামশ্রমী মহাশয় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন, বেশ মনে আছে. বললেন : "দ্বিজুবাবু কেন এমন ক'রে তর্ক করছেন বলুন দেখি ? দেখুন যুক্তির পথে যে সত্যকে মেলে না তার একটা চরম প্রমাণ দিই যে কথা আমাদের শাস্ত্রেও আছে। ধরুন আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন কোনো প্রতিজ্ঞার সত্য সত্য নিয়ে। এখন, আমি হারলাম কেন ? না, আপনার বুদ্ধি, পড়াশোনা, অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি, কিন্তু এই যে গিরিশবাবু রয়েছেন এঁর যদি আপনার চেয়ে বেশি বুদ্ধি থাকে তবে তিনি আপনাকে হারিয়ে দেবেন। অর্থাৎ আমার কাছে যাকে আপনি সত্য প্রমাণ করেছিলেন তাকে ইনি প্রমাণ ক'রে দেবেন অসত্য ব'লে। আবার ধরুন আপনাদের শ্বশুর মহাশয় ঐ যে ব'সে মৃদু হাসছেন তিনি যদি গিরিশবাবুব চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হন তাহ'লে ? তাহ'লে গিরিশবাবু আপনার কাছে যাকে সত্য ব'লে প্রতিষ্ঠিত করলেন সেটাকে উনি খণ্ডন ক'রে প্রমাণ করে দেবেন অসত্য। কাজেই যুক্তির পথে যে সত্য মেলে না এতো প্রমাণ হ'ল ?

কবি (আদ্যন্ত শুনে টুপ ক'রে) : কেবল মনে রাখবেন যুক্তির অক্ষমতা প্রমাণ করতেও আপনাকে ঐ যুক্তিরই কাছে হাত পাততে হ'ল। সুতরাং যুক্তিকে বাতিল ক'রে যুক্তির অক্ষমতাও প্রমাণ করতে পারছেন না। হাঃ হাঃ হাঃ

সামশ্রমী মহাশয়ও হেসে উঠে বললেন : "সাবাস দ্বিজুবাবু। আমাকে বিপন্ন করেছেন বৈকি। কিন্তু—"

তারপর হ'ল নানা তর্ক আমার মনে নেই। কিন্তু এটুকু মনে আছে কারণ কবি বলতেন পরে প্রায়ই আমাদের কাছে : দেখলি ? কেমন কাবু করলাম একটি অস্তর-টিপুনিতে ? ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।"

সত্যিই তিনি এ বিষয়ে ছিলেন ওস্তাদ। পরে যখন সক্রেটিসের ডায়ালগ পড়ি তখন ক্রমাগতই তাঁর কথা মনে পড়ত। কারণ সক্রেটিসের ডায়ালগ ছিল তাঁর অতি প্রিয়।

অথচ তবু এই মানুষকেও শুধু যে মানতে হ'ল "আমি বলি মানুষের এ-বুদ্ধিবৃত্তির

তীব্র জ্বালায়, মাঝে মাঝে এমনি হয় যে ইচ্ছা হয় যে ছুটে পালাই" তা-ই নয়, এ-ও বুঝতে পারলেন ধীরে ধীরে যে পরম সত্যকে জানতে হ'লে হতে হবে অনুদ্ধত শ্রদ্ধালু।

কী ভাবে দেখাই! তাঁর মন্দ্রে "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় আছে যাকে বলে insouciance, একটা ব্যঙ্গের ভাব। শ্রদ্ধার কথা এতেও আছে তবু এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় কবির মূল দৃষ্টিটি বহির্মুখী। তাছাড়া ব্যঙ্গও আছে যথেষ্ট যেমন যখন কবি বলছেন মানুষকে ঠেশ দিয়ে:

সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু!
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তি শ্রদ্ধা নাই একবিন্দু।

সমুদ্র যে সমুদ্র তাকেও বাদ দিচ্ছেন না:

অগাধ অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহো বক্ষে চাপিতে তাহাবে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে।
বুঝ না সে ক্ষীণ দেহে অত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিন্তু এই মানুষই সাত বৎসর বাদে "সমুদ্র" বলে আর একটি কবিতা লেখেন। এ দুটি কবিতা পাশাপাশি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় বহির্মুখিতা থেকে কবির দৃষ্টি ধীরে ধীরে কী ভাবে অন্তর্মুখিতার দিকে পরিণতি নিয়েছে:

"সেই সে সাক্ষাৎ হতে আজি হে সমুদ্র!
সপ্তবর্ষ গেছে কেটে—আমার এ ক্ষুদ্র
জীবনের। ছিলাম সেদিন শ্লেষ স্মিত,
উচ্চকণ্ঠ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইযাছি চিন্তানত
জীবনের গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে;—কম্প্র বীর
ম্লান ব্যথাপ্লুত অশ্রুগদ্গদ গম্ভীর।

বোঝা যায় কেন কবি গেয়েছিলেন: হাস্য শুধু আমার সখা অশ্রু আমার কেহই নয়? তবু একটা জিনিষ এখানেও লক্ষ্য করবার বিষয়: সেটা এই যে, এ অশ্রু পুরুষের—এ বেদনার মধ্যে ক্লৈব্য নেই, নেই কোনো হাহুতাশ, চঞ্চল আকুলতা। তাই তার পরেই কবি বলছেন যে যা দেখছি সেইখানেই সব রহস্যের সমাধান নেই, খুঁজতে হবে যবনিকার ওপারেও:

উপরে নির্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটি কোটি নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চিৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পা ভরে।
দেখে পিতা তেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণানীরব
গাঢ় স্নেহে, মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।
কী গাঢ় ও-নীলাকাশ। কী উজ্জ্বল, স্থির !
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব সত্য, যাহা নিত্য ও অমর
তাহা বুঝি এইরূপই স্থির ও ভাস্বর।
তবু ভাবি ঐ খানে আলোকের নয়
শেষ, ঐ ঘননীল, ঐ জ্যোতির্ময়
যবনিকা অন্তরালে আছে লুক্কায়িত
এক মহালোক, ঐ যবনিকাঙ্কিত
কোটি কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি
শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
তুলে লও যবনিকা যাদুকর ! তবে
কী আছে পশ্চাতে তার দেখাও মানবে।

পড়তে পড়তে স্পষ্ট বোঝা যায় কবি উপনিষদের প্রভাবপরিধির মধ্যে আসছিলেন। বেদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তাঁকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসছিল উপনিষদের ভাবগাঢ়তার দিকে, চেতনার দিকে, অভীপ্সার দিকে। শেষ কয়টি চরণ মনে করিয়ে দেয় ঈশোপনিষদের উদাত্ত প্রার্থনা :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

সত্যের মুখ জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত। হে সূর্য, সেই আবরণটি—(কবির ভাষায় "যবনিকা")—অপসারিত করো যাতে সত্যধর্মের দর্শন আমার হয়।

খুব গৌরব হবার কথা যে কোনো "সত্যধর্মীর"। কারণ সত্যকে জানতে হ'লে সে ধর্মার্থী হওয়া চাই, চাই বিনত হওয়া,—শুধু বিশ্লেষণের অণুবীক্ষণ বা ব্যবচ্ছেদের দৃষ্টি

নিয়ে যে তার মর্মকোষে প্রবেশ করা যায় না - এইই হ'ল ভারতের বাণী। এ বাণীর বাদীসুর হ'ল এই উদাসী বিশ্বাস যে যা দেখছি শুধু তার আলোর জোরে এমন কি দৃশ্যমানকেও বোঝা যায় না, অদৃশ্য রহস্যকে বোঝা তো দূরের কথা। মনে রাখবেন কবি তাঁর যৌবনে য়ুরোপের বুদ্ধিবাদ ও ঐহিকতাকেই (thisworldliness) একান্ত ক'রে ধ'রেছিলেন। তাঁর Lyrics of Ind-এ River of Toy কবিতায় কবি একথা বড় গলা ক'রেই বলছেন :

The river is of happiness
The ripples are its laughter
That think not of the worldly cares
And not of the hereafter.

অথচ এই মানুষই শেষ জীবনে লিখলেন যশের জয়ডঙ্কার মাঝখানে (শান্তি-ত্রিবেণী)

একে একে চোখের সাম্‌নে কুসুমগুলি প'ড়ে যাচ্ছে ঝ'রে
ধীরে ধীরে পশ্চিমের ঐ পীতাকাশে নিভে আসছে আলো।
ঝাপসা হ'য়ে আসছে জগৎ, সোনার বরণ হ'য়ে আসছে কালো
চক্ষু দুটি মুদে ক্রমে ক্রমে যেন নেশার ঘোরে
বাজছে শুধু বিজয়ডঙ্কা—শুনতে পাচ্ছি লাগছে না তো ভালো
ইচ্ছা শুধু, পক্ষ দুটি গুটিয়ে এখন নীড়ে আসি ফিরে।
কে তুমি হে পরিচিত প্রিয় বন্ধু কে আছ কুটীরে ?
এইছি আমি তোমার কাছে, এখন তোমার সন্ধ্যা দীপটি জ্বালো,
শ্রান্ত আমি ভ্রান্ত আমি, চিনেছি আজ নিজ জন্মভূমি
দেখাও কোথায় শান্তিশয্যা পেতে আমার রেখেছ গো তুমি।

একেই বলে : "comming into his own—" কবি নিজের গভীরতম ব্যক্তি-স্বরূপের মর্মলোকে ধীরে ধীরে আসছিলেন। না এসে উপায় ছিল না। আমাদের অন্তরাত্মা চায় বিকাশ। প্রথমে সে চায় এই বিকাশের স্বাদ স্বপরিবারে, তারপরে স্বগোষ্ঠীতে তারপরে নিজের সমাজে তারপরে দেশাত্মবোধে। কিন্তু এখানেই সে থামতে পারে না—কারণ নাল্পে সুখশান্তি। আমাদের প্রতি বিকাশই একটা স্তর—পান্থশালা। পরমতীর্থ এরা কেউ নয়। তবে এগিয়ে চলা ব'লে একটা কথা আছে। তাই কবিকে স্বদেশী সঙ্গীতেও এগিয়ে চলতে হ'ল বহির্মুখী পূজা থেকে অন্তর্মুখী পূজাতে—vital থেকে psychic স্তরে আরোহণ ক'রে।

কিন্তু psychic এর গোড়াকার কথা আত্মদান। স্বদেশসঙ্গীতে এ আত্মদান

পূর্ণায়তি পায় না।. তাই কবি পৌছলেন দেশোচ্ছ্বাস থেকে প্রেমোচ্ছ্বাসে। গাইলেন অপূর্ব কবিত্বে ও সুরে:

তোমারেই ভালো বেসেছি আমি তোমারেই ভালোবাসিব।
তোমারই দুঃখে কাঁদিব সখে তোমারই সুখে হাসিব।
তব হাস্যোজ্জ্বল-বিকশিত শতদল,
বিতরিব তোমারই গৌরব-পরিমল,
সজল জলদ জাল ম্লান গগন তলে
তোমারি নয়ন জলে ভাসিব।
মিলনে করিব তব চিত্ত বিনোদন তোমারি মিলন গীতি গাহিয়া
বিরহে মলিন মুখে শূন্য নয়নে দুখে রহিব তোমার পথ চাহিয়া
মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নার জাগরণে
মুদিব নয়ন তব, সুপ্ত নয়ন সনে
জীবনে মরণে আমি তোমারি তোমারি কাছে জনমে জনমে ফিরে আসিব।

এ শ্রেণীর গান সব জড়িয়ে তাঁর দেশাত্মবোধের গানের চেয়েও উচ্চাঙ্গের গান বলব কেন না মানবাত্মার যে চেতনা থেকে এ গান লেখা তার প্রেরণা আসে দেশগৌরবী চেতনার চেয়েও উচ্চতর লোক থেকে। গভীরতর আনন্দ, শুভ্রতর স্বপ্ন, উজ্জ্বলতর উদ্ভাস এই শ্রেণীর প্রেমের গানের পিছনে আলো ধরেছে। তাই মন আবেশে ছেয়ে যায় যখন গাই (শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে রাধার উক্তি ধরা যেতে পারে):

(কেন) এত সুন্দর শশধর? ওসে তারি মুখ অনুকারি'
(কেন) এত সুবর্ণ শতদল? ওসে তাহারি বর্ণ হারি।'
(কেন) এত সুললিত পিক সঙ্গীত?
তারি কলবাণী করে ঝংকৃত
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয় — পরশ বাহিয়া তারি।
আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহারি রূপের আলো
তারি পদযুগ ধরে হৃদে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি
নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও দুটি আঁখের কিরণের তরে সকলি ভুলিতে পারি।

এ প্রেম আরো উচ্চসঞ্চারী হয়েছে তাঁর প্রেম তন্ময়তার গানে:

তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি হে আমার প্রাণ

কী দিব তোমায় কী আছে আমার সকলি তোমারি দান ?
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতি কণ্ঠের মৃদু গান
সকলি তোমারি দান সে যে বধু সকলি তোমারি দান।

সমস্ত গানটি বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করলাম না, কারণ এই কয়টি চরণ থেকেই বোঝা যাবে কোন্ তন্ময়তার চেতনা থেকে এ গানের প্রেরণার ঢল নেমেছে। মনে পড়ে নারদ ভক্তিসূত্রের "তৎসুখসুখিত্বম্" কথাটি। বঁধু, তুমি, তুমি, তুমি আমি নই—শুধু তুমি। তোমাতে সব লয় হ'য়ে গেছে আমার আমিত্ব। তাই শেষে কবি গাইছেন :

ফুরায়ে গিয়াছে যা ছিল আমার, আর কেন বঁধু, চেয়ে নাকো আর
আর কিছু নাই তোমায় দিবার হ'ল দিবা অবসান
লহ লহ বঁধু চরণে তোমার এ জীবন বলিদান।

আমার মনে হয় এসব শুধু প্রণয়ী নয়—সাধকের মুখেও সাজে। কারণ এর মূল প্রেরণাটি আধ্যাত্মিক। মানবিক প্রেমের শিখর মুহূর্ত অধ্যাত্মিক আকাশকে ছোঁয় যদিও পারে না সেখানে স্থায়ী হ'তে : মাটির পিছুটানে তৃষ্ণার বাণ আকাশ ছুঁয়েই ফের নেমে আসে মাটিতে। তখন দেখা দেয় ফের আত্মপরতার হাজারো দাবি, প্রত্যাশা, অধিকার-বোধের মালিন্য। তখন তৎসুখসুখিত্ব নেমে আসে মৎসুখলালসার মোহলোকে প্রেম তার নক্ষত্রলোক থেকে স্খলিত হ'য়ে লুটোয় কামের পঙ্কলোকে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির" সাধনা চ্যুত হয় "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির" কামনায়।

আমি বৈষ্ণব পরিভাষা ধরলাম ইচ্ছে ক'রেই। কারণ আমাদের দেশে প্রেমের নামে কামের স্বরাজপ্রতিষ্ঠার ছলনা যে কী বস্তু সেটা বৈষ্ণবরাই সবচেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁদের প্রেমের ভূয়োদর্শী সাধনায়। কাম যে কত সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে এসে প্রেমের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ ক'রে তাকে ভ্রষ্ট করে—কত মনোহর রূপ নিয়ে যে সে প্রেমের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে তার নিঃস্বার্থ আনন্দকে ধরে স্বার্থের কাঁটাবনের প্রহরী হ'তে এ-রহস্য বৈষ্ণবের মতন বুঝি আর কেউ বোঝে নি—কোনো দেশেই। তাই না প্রেমের গানে তাঁদের স্থান এত উচ্চে।

কবির নানা প্রেমের গানেই আমরা পাই এ বৈষ্ণবভাব—কামনা ছেড়ে রাধনার অভীপ্সা। এ তিনি পেরেছিলেন কারণ তিনি স্বধর্মে ছিলেন ভক্ত, প্রেমী। শুধু ভাবেই নয়—তাঁর দেহে ছিল চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ ভক্তরাজ শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর রক্ত। শুনেছি তাঁর প্রপিতামহী ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর বংশের মেয়ে। সাধে কি

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল কীর্তন শুনলে বিহ্বল হ'তেন? কিন্তু যাক এ অবান্তর কথা।

আমার বলবার কথা ছিল এই যে বৈষ্ণবধর্মের একটা সহজ প্রবণতা তাঁর দেহে মনে ছিল বরাবরই। প্রথম বয়সে য়ুরোপের সংশয়বাদ ও বুদ্ধিবাদ এ প্রবণতাকে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু অন্তরাত্মা যখন জাগে, বাইরের সব চাপ, সব শৃঙ্খলই খ'সে পড়ে। তাই তাঁর গান শেষ বয়সে পৌঁছল পরম পরিণতিতে সব বাধা অতিক্রম ক'রে: তাঁর ভক্তিসঙ্গীতে।

গানের দিক দিয়ে এইই হ'ল মহত্তম সাঙ্গীতিক বিকাশ। তাই তাঁর ভক্তির গানে যে শ্রেণীর আশ্চর্য ভাবগাঢ়তা ও তৎসুখ সুখিত্বর ভাব ফুটে উঠল তার কাছে তাঁর মানবিক প্রেমের গানও নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। তাঁব

ওকে গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ওকে নেচে নেচে চলে মুখে হরি বলে
চ'লেচ'লে পাগলেরই প্রায়।

গানে গৌরাঙ্গের যে মূর্তি ফুটেছে সে মূর্তি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আর কারোর কোনো গানেই যে ফোটেনি একথা অকুতোভয়েই বলা চলে।

সেযে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে
সেযে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা,

একটি চতুষ্পদীতে গৌরাঙ্গের সমগ্রমূর্তি বিধৃত! এই-ই তো গৌরাঙ্গের অন্তরাত্মা। আর "দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে" এ চরণের কি তুলনা আছে?

কিম্বা যখন গাইছেন কবি শ্যামাসঙ্গীত:

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে এক বার চেয়ে দেখিস না মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপন ভাবে বিভোর বামা,
একি খেলা খেলিস ঘুরে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি চরণ ধ'রে ডাকে মা মা!

মনে পড়ে কালীর করাল মূর্তি। কিন্তু এমন সহজ সরল অথচ কবিত্বময় ভাষায় কে এঁকেছে এ মূর্তি এ যুগে! এ ছবির হাত ছিল আর কোন্ মাতৃভক্ত কবির? এযুগে কয়জন দেখাতে পেরেছে এমন উজ্জ্বল রঙে:

হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা।
মুখে "হা হা" অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা!
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা অভয়ে! অভয় দেমা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা কোলে তুলে নে মা শ্যামা।

সাধনার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন কেন বাসনা-কামনায় জর্জরিত হ'য়ে সন্তান দিশাহারা হ'য়ে মার শরণ নেয়। আর তখন কাতর হ'য়ে বলে:

আয় মা এখন তারারূপে স্মিত মুখে শুভ্রবাসে
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।
এতদিন তো কালী ভীমা তোরি পূজা করেছি মা
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল—এখন মা তোর অসি নামা।

শক্তিসাধক শক্তির অভিমান ছেড়ে আজ প্রার্থী একান্ত শরণাগতির। আমার কী শক্তি মা যে তোমার পূজা করি? শিশিরের বুকে সূর্য ধরে কি? তবু সে চায় সূর্যকে প্রতিবিম্বিত করতে—হবে সে শিশু-সূয। সূর্যও ধরা দেয় লক্ষ শিশিরের বুকে প্রভাতী মণিরাগে। উষার ধর্মই এই। অথচ তাকে আসতে হয় নিশার বুক চিরে। খৃষ্টান মিষ্টিকরা একে বলেছেন Dark night of the soul. তাই কবি দেখছেন সে আবির্ভাবের কল্পছবি: নিশার ঘন আঁধার দিয়ে মা আমার আসছেন নেমে উষার স্মিতরাগে।

তাঁর নানা শক্তির গানেই ছবি ফুটে উঠেছে প্রার্থনার কাঠামোয়। আজ আমার সবচেয়ে বেশি মনে হয় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা দুটি গানের কথা।

মনে পড়ে মেশোও বলতেন এ দুটি গানের কথা: আহা কী গানই আজকাল লিখছেন দ্বিজদা! তাঁর বন্ধুবান্ধব শেষ বয়সে তাঁকে চিনতেই পারত না। সেই ফ্যাশনেবল্ মানুষ, সাহেবি-ভাবাপন্ন রগচটা কলেক্টর, শেষ জীবনে বারান্দায় খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গান বাঁধতেন—আজও মনে পড়ে তাঁর সকালে উঠেই সেই গঙ্গাস্তোত্র:

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি, ধূসরতরঙ্গ ভঙ্গে।
কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মায়ি!
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি'!
বহিছ জননি এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি'
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে॥
নারদকীর্তন-পুলকিত-মাধব-বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া

ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটি জটিল জটা' পর ঝরিয়া
অম্বর হইতে সম শত ধারা জ্যোতিপ্রপাত তিমিরে।
নামি, ধরায় হিমাচলমূলে মিশিঙ্গে সাগর সঙ্গে ॥

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি, জাহ্নবি, সুরধুনি কলকল্লোলিনি গঙ্গে ॥

*   *   *   *

তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারি তাঁর মতন মানুষের কণ্ঠে এ শ্রেণীর পৌত্তলিক স্তব এমন মন্ত্রের ছন্দে উৎসারিত হওয়া কী আশ্চয অঘটন। এ কি সেই মানুষ যে প্রথম জীবনে গেয়েছিল বিলেতে (Lyrics of Ind) :

We, armed with love, in justice armoured
Defy the hell-fire, plague and dearth
Whilst Science triumphs, Beauty blazes
We all can make a heaven on earth.

কোথায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণোদ্ভূত জলকণা সমষ্টির প্রবাহ গঙ্গানদী (সায়েন্সের চোখে) আর কোথায় নারদ-কীর্তনে মাধবের করুণার পুলকোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট আকাশ-গঙ্গার অবতরণ শিবের জটায়! তবু আমরা বলি the age of miracle is past? একবার ভেবে দেখুন বিলেত থেকে ফিরে এসে যিনি প্রায় সাহেব ব'নে গিয়েছিলেন, হিন্দুধর্মকে কথায় কথায় ঠাট্টা না ক'রে যিনি জলগ্রহণ করতেন না, তিনি পরিণত বয়সে নবদ্বীপে গিয়ে বললেন কি? না,

মানব মাতিয়া ছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত একাকার
দুর্নিবার প্রেমে—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে
আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপ ধামে। (মন্দ্র—নবদ্বীপ)

তাই বলছেন শেষে যে যদিও এখন যা দেখছি সে বৈষ্ণবধর্মের কঙ্কাল মাত্র :

সে ধর্ম কোথায়
আজি প্রিয়তমে? তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি' ঘটনার স্রোতে।

তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছ না বৈষ্ণবের শূন্য কলরব ?···
জুড়ি' চৈতন্যেরি সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
অহো ধর্মের কী কঠোর পরিণাম !

তবু ভুললে চলবে না যে
এই সেই নবদ্বীপ, ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজো ভক্তিভরে
তার পদরজ। প্রিয়ে শিরে 'লও তুলি'
প্রেমে সুপবিত্র আজো তার স্বর্ণধূলি
হোক সে পঙ্কিল আজি বিলুপ্ত বিভব
বিহীনসৌন্দর্যজ্ঞানপ্রতিভাগৌরব।
তবু চিরপুণ্যময় তাহা স্বর্গ সম,
অবনত করো শির প্রেয়সী প্রণম।

* * * *

এই যে প্রণাম—এরই মধ্যে নিহিত গ্রহণের বীজ বরণের আকুতি। ধর্মজীবনের গোড়াকার কথা এই প্রণাম। কিন্তু ধর্মের কদাচার ব্যভিচারকে ভ্রষ্টাচার বলে না চিনে নির্বিকারে যে-প্রণাম, ধর্মের সুস্থ সুন্দর গগনচরণকে ছেড়ে কুসংস্কারের অন্ধকূপে বাস করার যে-তামসিক অঙ্গীকার সে-ভঙ্গি কবির নয়: কবি বরাবরই চেয়েছেন জীবনের মহত্ত্বকে প্রণাম করতে। কী বললেন? এ সবাই চায়? না চায় না। সবাই ধর্মকে যে-ভাবে গ্রহণ করতে চায় সে হ'ল এক ধরণের গতানুগতিকতা, গড্ডালিকা-প্রবাহ। তাকে বড় জোর স্বীকার বলা যায় - মৌখিক প্রাণহীন জপ — আত্মিক উদ্দীপন নয় —আগ্রহের শরণাগতি নয়।

কিন্তু তবু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যে শরণাগতি, এই-যে প্রণিপাত, এরও ভঙ্গি পুরুষালিই। পৌরুষ যার মজ্জাগত তার শ্রদ্ধাও হবে পৌরুষের। তার আত্মসমর্পণেও থাকে বলিষ্ঠ মুক্ত দৃষ্টি। আমার মনে আছে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরের একটি কথা যখন সে তার স্বামীকে লিখছে যে যতদিন গোবিন্দলাল শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল ততদিন সে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু তাই ব'লে গোবিন্দলাল যখন হীনাচারী হয়েছে তখন ভ্রমর তাকে আর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারে না। এইই ছিল কবির শ্রদ্ধার কথা। তাঁর শেষজীবনের "পরপারে" নাটকে সরযূর মুখে কবি এ কথা বলেছেন তাঁর সরল ভাষায় যখন তার স্বামী মহিম তাকে ব্যঙ্গ করছে। যে-স্বামীর

জন্যে পতিব্রতা সরযূ বহু দুঃখ সয়েছে, সে-স্বামী যখন গণিকাসক্ত মদ্যপ হয়ে তার সতীত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করল তখন সে তীব্র কণ্ঠেই বলে উঠল : "আমি সতী কি অসতী সে কথার বিচার একজন মাতালের মুখে, বেশ্যাসক্তের মুখে শুনতে চাই না। আমার সতীত্ব আমার ধর্ম– তোমার নয়।

মহিম : তোমার ধর্ম !

সরযূ : হ্যাঁ—আমার ধর্ম। সেই দেবতার পূজার তুমি তো বিল্বদল মাত্র। তবে তোমার পবিত্রতা কামনা করি এই কারণে যাতে সেই বিল্বদল আমার দেবতার চরণে দেবার উপযুক্ত হয়, যাতে সে আবর্জনায় পড়ে কলুষিত না হয়।

আমাদের অন্তরাত্মার একটি পরম অভীপ্সা যেমন দীনতা–"তৃণাদপি সুনীচেন" তেম্নি আর একটি পরম অভীপ্সা (গীতার ভাষায়) "বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধায়া যুক্ত" হওয়া বিবেকী হওয়া। এ হেন বিবেকী পুরুষ অপাত্রে দান করবেন না একথা গীতা খুব জোর করেই বলেছে :

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্।

(যেখানে দাতা দান করেন অপাত্রকে অবজ্ঞা ও অসৎকারের সঙ্গে সে-দানের নাম তামসদান)

কিন্তু তবু বিলেতি মনোভাবে এই বিচার-বুদ্ধির মধ্যে থাকে অনেকখানি অজ্ঞান আত্মম্ভরিতা। শুদ্ধ বিচার শান্ত, স্নিগ্ধ --উগ্র, মুখর নয়। তাই বিচারবুদ্ধিরও বিচার সম্ভব—কিন্তু সে বিচারের ভার মন নিতে পারে না--পারে মনের উপরতলায় বাস করেন যে চৈত্যপুরুষ (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় psychic being) সে-ই। কিন্তু এই কথাটাই সাধারণ বুদ্ধি বুঝতে পারে না—কেন না সে-বুদ্ধির শুদ্ধিলাভ হয় নি--প্রজ্ঞার গর্ভে নবজন্ম নিয়ে হয় নি সে দ্বিজ। বুদ্ধির এই উপনয়ন হয় কেবল আরাধনায় ভক্তিতে—এই স্বীকারে যে "আমি বুঝি না তুমি বুঝিয়ে দাও।"

এই ভাবটিই কবির প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাই থেকে থেকেই তিনি ঝাপসা দেখতেন—নাস্তিক্যের মেঘলোকে হারিয়ে ফেলতেন তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধির ধ্রুব দিশা। এই দিশা আসতে আরম্ভ করল যখন ভক্তিকে তিনি অকুণ্ঠে গ্রহণ করতে শিখলেন—যার শেষ পরিণতি হ'ল শরণাগতিতে। তাঁর মৃত্যুর বৎসর কয়েক পূর্বে এই শরণাগতি ভাষা পায় কয়েকটি অপূর্ব গানে। তার মধ্যে একটি গান ছিল ভাষায়, সুরে, সরলতায়, সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

আজও মনে পড়ে শেষ জীবনে তাঁর মুখে এই গানটি যখন শুনতাম হৃদয়ে আমার

জেগে উঠত কী বেদনার আন্দোলন অথচ সে-বেদনা ছিল ছদ্মবেশে গভীর আনন্দই বটে। যখন তিনি গাইতেন চাঁদের আলোয় একা একা—আমি শুনতাম হয়ত পাশের ঘর থেকে :

নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো?
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে,
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই—এমন রাত আর পাবো নালো!
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে।
থামা এখন বীণার ধ্বনি—চুপ্ ক'রে শোন বাইরে এসে।
বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালোবেসে,
এখন যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভালো।
সাঙ্গ আমার ধূলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচা কেনা,
এইছি ক'রে হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
এখন বড় শ্রান্ত আমি, ওমা! কোলে টেনে নে না
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে এই অসীম কালো।

জীবনের সব ধ্বনি সৌন্দর্যই এখন মনে হচ্ছে পেরুতে হবে—এমন কি "বীণার ধ্বনিও" হয়ে দাঁড়াল বাধা। দাঁড়াতে হবে মুখোমুখি হ'য়ে মা-র সামনে, "চুপ ক'রে শুন্‌তে হবে" শান্ত পাপিয়ার আকুলতান চাঁদের আলোর অসীম শান্তি-লোকে। কারণ মরণ ডাকছে—কিন্তু নেই তার আর সে রুদ্র রূপ, তার মধ্যেও স্পন্দন বেজে উঠল মাতৃহৃদয়ের অগাধ ভালোবাসার। আর সেই ভালোবাসার অতল আনন্দেই এল নির্বেদ—শরণাগতি, ধুলাখেলার পালা ফুরোলো—বেচাকেনার আর কী সার্থকতা? এখন শুধু শ্রান্তির পরে সুপ্তি—মায়ের অসীম কোলে, যেখানে জীবনের কালোছায়া মিশে একাকার হ'য়েছে মিলনের আলোকায়ার দিক্ চক্রবালে।

এ প্রার্থনা যুক্তিবাদীর নয় এ প্রার্থনা ভক্তের, আর কারুর মুখে এ-সুর এমন ক'রে বেজে ওঠে না, উঠতে পারে না।' ভক্তির দিকে প্রবণতা কবির বরাবরই ছিল, তাই পাষাণীর অতুলনীয় ব্রাহ্মণ চরিত্র গৌতমের সৃষ্টি—আর্য ব্রাহ্মণত্বের যে-ছবি আর কোনো আধুনিক নাটকে এমন কাব্য হ'য়ে ফোটে নি। প্রেম সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ও বেদনাও ছিল তাঁর অপর্যাপ্ত। তাই তাঁর সীতার সৃষ্টি। কিন্তু তাঁর শেষ কাব্যনাট্য ভীষ্মে তিনি অনুভবের যে গভীরতায় পৌছিয়েছিলেন—হিন্দুর শুধু ভক্তি নয় ত্যাগ, জীবনসংগ্রাম ও প্রণামের সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন তাতে আধ্যাত্মিক সাধক মাত্রেরই আনন্দ

হবার কথা। বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেবার স্থানাভাব তবু একটু দেখাই কী বলতে চাইছি। অবতারকল্প পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ দেখে গঙ্গা বলছে ব্যাসকে :

ব্যাস ! ভ্রান্তির সাগরে
পণ্ডিত মনুষ্য, তবু নিজ শক্তিবলে
নির্ভয়ে চলিয়া যায় তরঙ্গ-গর্জন
দলি' পদতলে, এ কি সামান্য ব্যাপার !
গাঢ় অন্ধকার হ'তে মার্তণ্ডের ম'ত
চলিয়াছে সভ্যতার আলোকিত পথে :
এ কি তুচ্ছ ? অভাবের গর্ভে জন্ম তার,
স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্রোড়ে লালিত মানব,
উঠিয়াছে শক্তিবলে ত্যাগের শিখরে
এ কি অতি সহজ গৌরব ঋষি ব্যাস ?
আর মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ আমার সন্তান—
যাহার চরণতলে মরণ আপনি
শান্তমূর্তি প'ড়ে আছে, ত্যাগের নির্মম
কশাঘাতে ভীত শির অবনত করি'।

ভীষ্ম নাটকে জীবনের সম্বন্ধে তাঁর হিন্দুর ধ্যান-দৃষ্টি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল—জ্ঞান ও ভক্তি যে দৃষ্টির সূর্য চন্দ্র হয়ে জ্বলে। জ্ঞানের সম্বন্ধে কথা বলার আমি অনধিকারী—কারণ আমি নিজে অজ্ঞান। তবে ভক্তি সম্বন্ধে সামান্য কিছু খবর রাখি ব'লে স্মৃতিকথার শেষ অধ্যায়ে দুচারটি কথা বলতে চাই—যদিও ভক্তির সম্বন্ধেই বা কতটুকু সত্যি জানি ? তবু—

দ্বাদশ উল্লাস

বলেছি ঠাকুরদাদা ছিলেন মস্ত গায়ক। রীতিমত শিখেছিলেন তিনি হিন্দুস্থানি গান মুসলমান ওস্তাদের কাছে। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল ভক্ত লুকিয়ে। তাই ওস্তাদি গানে তাঁর শেষ বয়সে আর তিনি তেমন তৃপ্তি পেতেন না। এই সময়ে তিনি কতকগুলি ভক্তির গান বেঁধেছিলেন হিন্দুস্থানি খেয়াল সুরের কাঠামোয়। গানগুলি গ্রথিত ক'রে ছাপিয়েছিলেন "গীতমঞ্জরী" নাম দিয়ে। সে সুরগুলি হারিয়ে গেছে গীতমঞ্জরীও আর পাওয়া যায় না। তবে যতদূর মনে পড়েছে কবি ঠাকুরদার একটি গান গাইতেন সিন্ধুড়া রাগে :

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যেরি ভয়
যাহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।

কবি এই সূত্রে পিতার কাছেই গান বাঁধার দীক্ষা নেন। আর এই সব ভক্তির গান শুনে ছেলেবেলায়ই তাঁর মনে ভক্তির দিকে কেমন একটা সহজ প্রবণতা জন্মেছিল। তাঁর স্বভাবও ছিল শ্রদ্ধালু, কাজেই ভক্তির সহায়। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ছিল এ-ভক্তি সাধনার পথে এক মস্ত অন্তরায়। যাঁরা ভক্তিসাধনার অন্দরমহলের কিছুও খবর রাখেন তাঁরা জানেন কেন ভক্তি এত দুর্লভ। ভক্তির ঢেউ থেকে থেকে নাস্তিকেরও হৃদয়ে লেগে অনেক সময়েই ভাঙন ধরায় এ একটি সবজানিত সত্য। এমন অসাড় হৃদয়—"a soul so dead"—আছে কি না সন্দেহ পূজায় যে কখনো কোনো আনন্দই পায় নি—বিশেষ হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু হ'লে হবে কি, পূজার-আনন্দ ওরফে ভক্তি আসেন "ক্ষণিকের অতিথি" হ'য়ে—"মাঝে মাঝে" তাঁর দেখা পাওয়া যায় কিন্তু "চিরদিন" পাওয়া যায় না।

"চিরদিন" পেতে হ'লে হ'তে হয় নিরভিমান—অর্থাৎ ছাড়্‌তে হয় বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ আত্মম্ভরিতা—বরণ করতে হয় শরণাগতিকে। আর তখনই দেখা যায় যে সব পায় সেই, যে সব হারাতে প্রস্তুত : "অপনা খো কর পিয়া মিলানা।"

কিন্তু সর্বহারা হ'তে পারার এ আকুতি সুলভ নয়। এ মন্ত্র দুর্বলতার—একথা বলেন তাঁরাই যাঁরা জানেন না ভক্তিসাধনা কী বস্তু। যারা অগভীরদর্শী তারাই মনে করে ক্রোধ বলের লক্ষণ। সবচেয়ে বলীয়ান সেই যে ক্রোধের বেগ ধারণ করতে
৮ পারে—জয় করতে পারে তাকে অক্রোধ দিয়ে। তেম্‌নি সব চেয়ে বলিষ্ঠ সেই যার মনের জোর আছে একথা বলবার—"আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও গো

দেখায়ে বুঝায়ে।" এটি বাংলার আর এক পরম ভক্ত কবির একটি অমূল্য সাধন-সঙ্গীত, তিনি রজনীকান্ত। মনে পড়ে কবির তাঁকে দেখতে যাওয়া যখন কান্তকবি গলক্ষতে হাঁসপাতালে মৃত্যুশয্যায়। কান্তকবি কবিকে ডাকতেন "গুরুদেব"। আমার মনে পড়ে স্বদেশী যুগে তাঁর কবির ওখানে এসে গাওয়া :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

খুব স্পষ্ট মনে পড়ে সুকিয়া স্ট্রীটে কবির বাড়ি থেকে এ দুই ভক্ত কবির সদলবলে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গাইতে গাইতে শহর-পরিক্রমা। কিন্তু যা বলছিলাম।

কবির মধ্যে ছিল এই ভক্তির সহজ প্রবণতা। পাষাণেতে তাঁর বিখ্যাত প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে গানটি অবিস্মরণীয়। এটি ছিল কান্ত কবিরও একটি অতি প্রিয় গান। মনে পড়ে তাঁদের মিলিত স্বরে এ গানটি গাওয়া :

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা।
মন্দির তোমার কী গড়িব মাগো মন্দির যাহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশি তারা রবি
সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী
নিকুঞ্জ ভবন বসন্ত পবন তরু-লতা-ফল-ফুল মধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু মা, শিশুর হাসিটি জননীর চুমা।
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা।
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি
শতরূপে মাগো বিরাজিত তুমি
বসন্তে কি শীতে দিবসে নিশীথে বিকশিত তব বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির প্রতিমা এ গড়ি' তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী
অমর কবির হৃদয় গভীর—ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা
দেখি না—আপনি দিয়েছ মা ধরা
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা!

কিন্তু বলেছি "করুণাময়ী মা"-র প্রতি ভক্তি আমাদের হৃদয়ে থাকলেও সচরাচর বুদ্ধিবাদ ও সংশয়বাদের পাষাণ চাপা হ'য়েই তাকে থাকতে হয়—বিশেষতঃ এ যুগে। "বিশেষত এ যুগে" বলছি এই জন্যে যে কোনো মনই তার যুগপ্রভাবকে সম্পূর্ণ কাটাতে পারে না। এ-যুগে নাস্তিক্য আশ্রয় পেয়েছে নানা কারণে। সে সব কারণ নিয়ে গবেষণার স্থান এ নয়—তবু যে আমি এ নাস্তিক্যের কথা তুললাম সে শুধু কবির ছবিটি

ফোটাতে। কবির হৃদয়ে শৈশবে আস্তিক্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বটে, কিন্তু বৈদেশিকী শিক্ষার আঁচে সে বীজ যৌবনে শুকিয়ে এসেছিল। তাই বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি লিখেছিলেন বিদ্রোহী ভঙ্গিতে :

কোথা তুমি কোথা তুমি বিশ্বপতি বৃথা বিশ্বময় খুঁজে বেড়াই
তারা বলে সবে দেখেছে তোমারে আমি কই নাহি দেখিতে পাই।
সিংহ শিশু করে মেষরক্ত পান বলী বলহীনে করে অপমান
তুমি সর্বশক্তি তুমি ন্যায়বান্--দূরে কি বসিয়া দেখিছ তাই ?
ধনীর আস্পর্ধা কপটের জয় ধর্মের পতন তবে কেন হয় ?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়—এ নিয়ম তরে তবে কে দায়ী ?
তার চেয়ে বলি শোক দুঃখ জরা পীড়ন পেষণ অবিচার ভরা
আপনি বলেছে অরাজক ধরা এ রাজ্যের রাজা কেহ তো নাই।

বিদ্রোহ যে আমাদের মজ্জাগত একথা অস্বীকার করার পথ থাকে না যদি যে-গুহার ধর্মের তত্ত্ব নিহিত তার মধ্যে প্রবেশ করতে কেউ চায়। যেসব বাধা থাকে অন্তরের গোলক-ধাঁধার লুকিয়ে তখন বেরিয়ে এসে ব্যূহ বাঁধে :

মাটির কত যে পিছুটান···হায় জন্মান্তর পুঞ্জ কত
ছায়া-সংস্কার···দেবদ্রোহিতা···গ্রন্থি···তুফান তিমিরাহত
প্রতিপদে যারে জেনেছি বলিয়া আত্মপ্রসাদে উঠি উছলি'
দেখি অলক্ষ্যে কবে সে-বিজিত ছলী পলে নাশে প্রেমের কলি।

সাধারণতঃ জীবনে আমরা ওই কথাটা বুঝবার মতন ক'রে বুঝি না যে সংসারে কোনো মানুষই যেমন ষোলো আনা নাস্তিক নয়, তেমনি কেউই ষোলো আনা আস্তিক নয়। সাধনার পথে এগিয়ে চলতে গেলে একথা আরো স্পষ্ট দেখা যায় যে দেবদ্রোহিতা প্রায় অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে মিশে থাকে দেবানুগত্যের সঙ্গে। এই জন্যেই বলেছে "হৃদয়গ্রন্থি" ভিন্ন ও "সর্বসংশয়" ছিন্ন হয় শুধু তার যে পরাবর ভগবানকে দর্শন করেছে। এ দর্শন যতদিন না হয়েছে—ততদিন "মাঝে মাঝে" তাঁর প্রতি বিশ্বাস জেগে উঠতে পারে কিন্তু "হৃদয়-আকাশে" মেঘও দেখা দেবেই সংশয়ের বিদ্রোহের ছদ্মবেশে। কবির "আলেখ্যে" বিধবা ব'লে একটি কবিতার শেষ স্তবকে পরিচয় পাবেন—কী ভাবে থেকে থেকে কবির চিত্তাকাশে বিদ্রোহের মেঘ উঠত ঘনিয়ে।

কবিতাটি সত্যিই অপরূপ। নারীর প্রতি তাঁর যে কী গভীর দরদ ও শ্রদ্ধা ছিল তার একটি গভীর পরিচয় মেলে এই কবিতাটিতে। বালবিধবা একদৃষ্টে চেয়ে আছে একটি উন্মুক্ত বাতায়নে বাইরের দিকে চেয়ে—করছে তার বিবাহিত জীবনের "স্মৃতিচারণ"—

"চর্মচক্ষু চেয়ে মাত্র আছে।" সে কী ভাবছে কবি বলছেন (কবিতাটি দীর্ঘ—সবটুকু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়—যদিও ইচ্ছা হয় করতে):

"কত কথা মনে আসে, কত লুপ্ত ইতিহাসে
গাঢ়ভাবে ছেয়ে আসে স্মৃতি !
কত ক্ষুদ্র সুখ ব্যথা বাল্যকালের কতকথা
কত হাস্য, কত গল্প গীতি !...
মনে পড়ে - শ্বশুর ঘরে কত ক্ষুদ্র ছলভরে
নিত্য পতির কাছে দিয়ে যাওয়া :
তাহার মুখটি অতুল সৃষ্টি তাহার স্বরটি সুধাবৃষ্টি
লুকিয়ে শোনা, লুকিয়ে তারে চাওয়া।
মনে পড়ে -পতির বধুর নিভৃতে সে মিলন মধুর.
সে চাহনি সেই রক্তপাণি
অন্তত একদিনের জন্য বুঝতে পারা ভাষার দৈন্য
অসংলগ্ন সে অস্ফুট বাণী!
অর্থশূন্য নানা উক্তি ভালোবাসা নিয়ে যুক্তি :
'তুমি ভালোবাসো না' তা জানি।
'বাসি, বাসি বাসি তারে বলতে হবে বারে বারে
অবিশ্বাস্য তথাপি সে বাণী।"

তারপরে সুদূরে স্বামীর মৃত্যুবাণী এল। মেয়েটি কী ভাবছে ?—

কিন্তু আজি শুভাশুভ জীবনের যা, জানো ধ্রুব,
দেখছ তুমি স্পষ্টাক্ষরে লেখা,
নিবিড়ভাবে কালো ছত্রে বিশ্বধাতার জীবনপত্রে
"তার সঙ্গে আর হবে নাকো দেখা।"
যত আছে নিগূঢ় তথ্য এর চেয়ে কিছু সত্য
যেটা আজি দেখছ ব'সে তুমি।...
যতখানি হেঁটে যাচ্ছ যতখানি দেখতে পাচ্ছ
ধূ ধূ করছে জীবন মরুভূমি।
রাত্রি গভীর হ'তে গভীর ! পটপ্রান্তে বিশ্বছবির
জ্যোৎস্নালেখা মুছে গেল ধীরে
অলস হ'য়ে এলে আঁখি গরাদেতেই মাথা রাখি'
ঘুমিয়ে পড়ল আমার জননী রে !

এ কবিতাটি কতবার তাঁকে পড়তে শুনেছি। সব রকম বেদনায়ই তাঁর হৃদয় সহজে আর্দ্র হ'য়ে উঠত,, কিন্তু নারীর বেদনায় তাঁর মতন বলিষ্ঠ মানুষের চোখেও জল চিক্ চিক্ করে উঠত এত সহজে! "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি" যে কবিকল্পনা নয় তাঁকে দেখেই জেনেছি। যাক যা বলছিলাম। এ কবিতাটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই শুধু দেখাতে কী ধরণের দুঃখে তিনি পরিণত বয়সেও চিত্তস্থৈর্য হারিয়ে বসতেন যার ফলে তাঁর আস্তিক মনেও জেগে উঠত নাস্তিক্যের সস্তা বিদ্রোহ। তাই তো তিনি এমন অপরূপ কবিতাটির শেষে নীতিপাঠ করলেন ক্রুদ্ধ ক্ষোভে:

হায়রে মানুষ বিধির কৃত্য চোখের সামনে দেখছি নিত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি।
খোসামোদের মন্দির খুলে মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল ব'লে ডাকি।

আমার কিন্তু এ-কয়টি লাইন পড়তে অত্যন্ত কষ্ট হ'ত তাই আমি এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করতাম। অবশ্য সে সময়ে জানতাম না সত্যিকার আস্তিকতা কাকে বলে ও কেন ভগবানের বিচার হ'ত পারে না মানুষের নৈতিকতার সীমাবদ্ধ মাপকাটি দিয়ে—কিন্তু তবু করতাম ছেলেমানুষি যুক্তি জাহির—যা মনে আসত। তিনি কখনো শুনতেন এসব ছেলেমানুষিয়ানা, কখনো তর্ক করতেন, কখনো শুধু আমাকে কাছে টেনে নিতেন।

* * * * *

মেশো যে এসব পছন্দ করতেন না সে কথা একাধিকবার বলেছি। "দ্বিজদার সঙ্গে ওভাবে তর্ক করা ছাড়ো মণ্টু" বলতেন বার বার যখনই দেখতেন আমার তর্কভঙ্গিমা।

সময়ে সময়ে আমি বলতাম আচ্ছা। কিন্তু সময়ে আবার রুখেও উঠতাম: "কিন্তু ভগবান তো বাপমার চেয়েও বড, মেশোমশায়?"

মেশোমশায় একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন আমার দিকে। নানা সময়ে নানা কথা বলতেন। কারণ তিনিও ছিলেন ঐ আস্তিক নাস্তিকের মাঝামাঝি জাতের মানুষ। কবির জীবদ্দশায় তাঁর আস্তিক্যের চেয়ে নাস্তিক্যের রূপটাই বেশি প্রকট হ'ত। কিন্তু তাঁর ও মাসিমার মৃত্যুর পরে তিনিও অনুদ্ধত ও জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। একদিনের কথা বলি। এ সময়ে, আমি পরমহংসদেবের কথামৃত নিয়ে খুব মশগুল। বললাম মেশোকে, কি কথায় মনে নেই, যে ভগবানকে চোখে দেখা যায় পরমহংসদেব বলেছেন।

মেশো ফের তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, পরে শুধু বললেন: "এ বিশ্বাস যদি তোমার রাখতে পারো মন্টু, শান্তি পাবে!"

*   *   *   *   *

কথাটা বুকে খট ক'রে বিঁধেছিল মনে আছে। কারণ এ ধরণের হ'তেও-পারে-সত্য গোছের স্বীকারোক্তি তাঁর কাছ থেকে একেবারেই আশা করি নি।

কিন্তু তাঁর জীবনেও পরিবর্তন আসছিল। একদিনকার কথা বলি। তখন মাসিমার খুব অসুখ। তাঁর কাছে এসেছিলেন শুনলাম বিখ্যাত দেশভক্ত ও সাধক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা যাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সেদিনও শ্রীঅরবিন্দ খুব উচ্চপ্রশংসা করছিলেন।

মনোরঞ্জন ছিলেন মস্ত সাধক। তাঁর নানা উপলব্ধি অনুভূতি দর্শনাদি হ'ত। যে সব কথা তিনি তাঁর "মনোরমার জীবনচিত্রে" লিখেছিলেন। মনোরমা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সমাধিস্থ হয়ে একদিন দুদিন এমন কি তিন দিন তিনি এক আসনে কাটাতেন। মনোরঞ্জন স্ত্রীকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর দৃষ্টান্তে ধর্মের দিকে অনেকখানি প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই মনোরঞ্জন মেশোকে বলেছিলেন কয়েকটি যোগলব্ধ শক্তির কথা। মেশো বললেন: মনোরঞ্জন বাবু বললেন আমাকে যে কে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগিকে তিনি দেখতে যান—মাঝে মাঝে তিনি যোগশক্তিতে এধরনের নানা সংকট ব্যাধি সারাতে পারতেন—রুগিকে দেখামাত্র তাঁর দেহে কী একটা স্রোত নামল তিনি বললেন তাকে: 'বাবা এই লাঠিটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলো তো।' অমনি সে চলল।"

"বলেন কি মেশোমশায়?"

"মনোরঞ্জন বাবু আজই বলে গেলেন।"

আমি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, পরে বললাম "আপনার এসব কথা বিশ্বাস হয়?"

মেশো খনিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন পরে বললেন—সে স্বরে একটু ব্যথা ছিল যেন: "হয়। আগে হ'ত না, কিন্তু আজকাল মনে হয় কি-হয়-না-হয় তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি!"

*   *   *   *

কিন্তু আমার বিশ্বাস হ'য়েও হ'ত না। মনটা আমার কি সহজ অবিশ্বাসী? সেদিন কবি নিশিকান্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন গ্রামে এক কাণ্ড। তামিল চাষীরা ব্রত নেয় এ অঞ্চলে। মাসখানেক ধরে খুব শুদ্ধাচারে থাকে তারপর একটা মাঠে সাত আট

হাত লম্বা চওড়া জমিতে কাঠকয়লার গন্‌গনে আগুন করে। সে আগুন এত গরম যে কাছে দাঁড়ান শক্ত। "যে সব চাষীরা আগুন করে দিলীপবাবু" বললেন নিশিকান্ত এই সেদিন "তারা গায়ে বালতি বালতি গরম জল ঢালে, নৈলে টিঁকতে পারে না। তারপর 'গোবিন্দ—গোবিন্দ—' বলে সেই গনগনে আগুন খালি পায়ে হেঁটে পার হ'য়ে যায়, এক আধজন নয় পঁচিশ ত্রিশ জন।"

তাঁর স্বরচিত সনেটেই লিখি তাঁর চাক্ষুষ-করা ঘটনাটি :

সেদিন সন্ধ্যায় তুমি দেখেছ বিস্মিত
আখি মেলি' : গ্রামবাসী তামিল চাষীরা
জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করিয়া বিস্তৃত
অগ্নির অঙ্গন রচে···পল্লীর পাখিরা
সে করাল রক্তবহ্নি দেখিয়া ডাকিল
আতঙ্কে আকুল কণ্ঠে···পশ্চিম আকাশে
শঙ্কায় মলিন মুখে সহসা নিভিল
সেদিনের অস্তরাগ···বিস্ময়ে সন্ত্রাসে
শিহরিল চন্দ্রতারা···তবু, শীর্ণকায
ব্রতচারী কৃষকেরা সেই ভয়ংকর
অগ্নির অঙ্গন দলি' গেল নগ্নপায
"গোবিন্দ গোবিন্দ" বলি'।
তেমন নির্ভর
তেমন বিশ্বাস তুমি রাখো চেতনায :
পার হবে সাধনার অগ্নিপরীক্ষায়।

ঘটনা বলছি কেন না এ দৃশ্য কবি নিশিকান্ত ও আরও চার পাঁচ জন সাধক সেদিন স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। তবু আমি মাস দুই বাদে যাব স্বচক্ষে দেখতে। তাই বলছি অতীন্দ্রিয় নানা শক্তির খেলায় বিশ্বাস যেন হ'য়েও হ'তে চায় না।

মেশোর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক সময়েই কথা হ'ত। বেশ মনে আছে প্রথম প্রথম তিনি কবির নাস্তিক্য সম্বন্ধে গানগুলি তাঁর জোরালো ভঙ্গিতে গাইতেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর মনে "বিশ্বাস" না হোক এই স্বীকারের শক্তি আসছিল যে জীবনে অনেক কিছু ঘটে যা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা যায় না।

কবিকেও এ নিয়ে প্রশ্ন করতাম। তিনি কিন্তু হ্যাঁ-ও বলতেন না, না-ও বলতেন না। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম : তিনি ক্রমশ আনন্দিত হ'য়ে উঠতে লাগলেন আমার

ভক্তিবিশ্বাস বাড়ছে দেখে। কারণ এই সময়ে আমি সাধু সন্ন্যাসীদের খোঁজে ছুটতাম প্রায়ই নির্মলদার সঙ্গে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন আপিসে শ্রীমা আরো কত বেলুড়ের সাধু। কখনো যেতাম হেঁটে বা নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে গিয়ে ঠাকুরের ঘরটিতে চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম আর চোখ দিয়ে আমার অঝোরে জল পড়ত।

এক এক সময়ে বাড়ি ফিরতে রাত হ'য়ে যেত। তখন কবি একটু ভাবিত হ'তেন কিন্তু তবু আমাকে বারণ করতেন না। কারণ বলেছি পুত্রের স্বাধীন চলাফেরায় তিনি হস্তক্ষেপ করবার পাত্র ছিলেন না। আমাকে স্পষ্টাস্পষ্টি উৎসাহ বলতে যা বোঝায় তা দিতেন না বটে, কিন্তু নিরুৎসাহও করতেন না। আমি তাঁকে বলতাম সোচ্ছ্বাসে বেলুড় মঠের কথা দক্ষিণেশ্বরের কথা সারদানন্দের কথা—তিনি শুনতেন খুব মন দিয়েই।

এমন সময়ে হঠাৎ মনে হ'ল যাই না কেন শ্রীম-র কাছে? নির্মলদাকে বললাম। তিনি খুব খুসি। বেশ তো চলো নিয়ে যাবো। তিনি এ সময়ে এণ্ট্রান্স পড়তেন আমি তখনো স্কুলে ভর্তি হই নি—কি সবে ভর্তি হয়েছি ঠিক মনে পড়ছে না।

শ্রী-ম দেখা করবেন—বললেন নির্মলদা খোঁজ নিয়ে এসে, সে কী আনন্দ! গেলাম উভয়ে!

কী সুন্দর ভক্তের মূর্তি। উদার স্নিগ্ধ ভাবে ভরা -যেন ঢল ঢল করছে! মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে।

শ্রী-ম আদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "তা আমার কাছে কেন এসেছ বাবা?"

আমি বললাম: "আজ্ঞে ঠাকুরের কথা শুনতে।"

শ্রীম-র সে উল্লাস ভুলব না কোনোদিন, চেঁচিয়ে ডাকলেন তাঁর এক ভাইপোকে বুঝি—"ওরে প্রভাস!—দেখে যারে দেখে যা। তের বছরের ছেলে আমার কাছে এসেছে কি না ঠাকুরের কথা শুনতে! দেখ বাবা দেখ—আমার গায়ে কিরকম কাঁটা দিয়ে উঠেছে!"

কবির কাছে এসে করলাম এ গল্প। কবি শুনে মুগ্ধ হ'লেন বুঝতে পারলাম কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। পরে বলেছিলেন আমার রাঙা জ্যেঠামশায়কে: I am proud of my son."

শুনে আমার কি উল্লাস। কবির হাতে তৎক্ষণাৎ গুঁজে দিলাম শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত "পড়তেই হবে বাবা!"

সে সময়ে আমি রোজ শুধু যে কথামৃত পড়তাম তাই নয় রামকৃষ্ণ দেবের এক মস্ত ছবি রঙ দিয়ে আঁকিয়ে টাঙিয়ে সুরু করেছিলাম সেই ছবির সামনে ধ্যান। ধ্যান হ'ত

না—(মন যা চঞ্চল, ধ্যান হ'বে কোত্থেকে ?)—কিন্তু প্রার্থনা হ'ত। করতাম তাঁরই প্রার্থনাঃ "অষ্টসিদ্ধি চাই না মা শতসিদ্ধি চাই না মা—তোমার পায়ে শুধু শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

কবি শুনলেন এ প্রার্থনার কথা। বইটা নিলেন। কয়েকদিন পরে বললেনঃ "মণ্টু, পরমহংসদেব যে মহাপুরুষ ছিলেন একথা তেমনি সত্য—যেম্নি সত্য"— ব'লে এদিক ওদিক চেয়ে —"ঐ ঐ দোরটা।" খুব স্পষ্ট মনে আছে একথা—যেন কাল বলছিলেন।

মহানন্দে গিয়ে বললাম শ্রীমকে। শুনে তিনি লাফিয়ে উঠলেন—চোখে বইল ধারা ! সে ছবি আজো ভাসছে তেম্নি উজ্জ্বল হ'য়ে আমার স্মৃতিপটেঃ "অ্যাঁ ! তোমার বাবা একথা বললেন ! দেখ দেখ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।—শোনো মণ্টু বাবা ! তোমার বাবা মহাপুণ্যবান্। তর্ক কোরো না তাঁর সঙ্গে আর, কেমন ?

ঠাকুর বারবার ব'লতেন তর্ক করা ভালো নয়। হ্যাঁ—আর রোজ তোমার বাবার পায়ের ধুলো নেবে সকাল সন্ধ্যা। আর এক কাজ কোরো বাবা। তাঁর যত কথা মনে থাকবে রোজ টুকে রাখবে—তোমাদের সঙ্গে কথা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা—সব।"

তাঁর কাছে দেখেছিলাম তাঁর ডায়ারি। চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা মোটা পুথি। প্রতিটিতে পরিষ্কার ক'রে দিন-ক্ষণ-তিথি লেখা পরমহংসদেবের কথার রিপোর্টের সঙ্গে।

"তীর্থংকরের" আদি কথা এইই। কিন্তু দুঃখ এই তখন বয়স আমার মোটে তের চোদ্দ—পারি নি কবির কথা লিখে রাখতে। তবু দুচার দিন লিখেছিলাম প্রথম দিকে একটা লাল মরক্কো বাঁধানো খাতায়—আজও মনে আছে। কিন্তু কী লিখেছিলাম তার একটি কথাও মনে নেই (ভালোই)। আমার একটা খুব অহঙ্কার আছে আমার স্মৃতিশক্তি নিয়ে সেটারও মূলোচ্ছেদ হওয়া চাই। ঠাকুর বলতেন "অহঙ্কারের লেশ থাকলেও ভগবানকে মেলে না যেমন সুতোয় একটু রেঁায়া থাকলেও ছুঁচের মধ্যে যায় না।"

কবিকে গিয়ে বলতাম এসব কথা। কবি খুব মন দিয়ে শুনতেন। কিন্তু আমার মনে আছে এ সময়ে তিনি একটু যেন দ্বিধামতন বোধ করতেন কারণ পড়াশুনোর আমার ক্ষতি তো একটু হ'তই এই ধর্মচর্চা করতে গিয়ে।

এই দ্বিধা তাঁর একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার মাতুলরা ত্রস্ত হ'য়ে তাঁকে বলছিলেন ছেলেকে স্কুলে ভরতি ক'রে দিতে। কবির ইচ্ছা ছিল না আমাকে স্কুলে দিতে। কিন্তু এ সময়ে হঠাৎ আমারও সাধ হ'ল স্কুলে ভরতি হ'তে কারণ

মুখে হাজার ফুটুনি করি না কেন বয়সে ছেলেমানুষ তো—আশে পাশে মামা মামি ভাই বোন সবাইকে দেখতাম ইস্কুল যাচ্ছে—একা "আমিই শুধু রইব প'ড়ে?" তার উপর এই সময়ে ভ্যাংচা যে-ভ্যাংচা সে-ও কি না স্কুলে ভরতি হ'য়ে বীরদর্পে ইংরিজিতে বুকনি কাটতে আরম্ভ করল! আর তো মান থাকে না। কবিকে বললাম—আমাকে স্কুলে ভরতি করে দিতেই হবে।

কবির ইচ্ছা ছিল আমাকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেওয়াবেন কিন্তু আমি বায়না ধরতে তাঁকে রাজি হ'তে হ'ল।

বেশ মনে আছে মেঘেনদা আমাকে নিয়ে যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে তখন তার নাম ছিল Metropolitan Institution: ভ্যাংচা এই স্কুলেই পড়ত তখন ফোর্থ ক্লাসে।

কাজেই আমি ধরলাম আমাকে থার্ড ক্লাসে ভরতি করাই চাই।

আমাকে মাষ্টারেরা পরীক্ষা ক'রে বলল: "বাংলা ভালো। সংস্কৃত মন্দ নয়। অঙ্ক চলনসই। তবে ইংরিজিতে একেবারে কাঁচা। কাজেই ফোর্থ ক্লাসে ভরতি হ'তে হবে।"

আমি কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললাম: 'কক্ষনো না'। ভ্যাংচা পড়ে যে ফোর্থ ক্লাসে!—ধরলাম কবিকে: "থার্ড ক্লাস বাবা' লক্ষ্মিটি। ইংরিজি শিখে নেব।" কবি কা করেন ব'লে পাঠালেন।

মাষ্টারেরা প্রথমে একটু আপত্তি করলেন, কিন্তু কবি আমার ব্যাপারটা বুঝে ওদের ব'লে পাঠালেন যে আমাকে থার্ড ক্লাসেই নেওয়া হোক। ইংরাজি কখনো পড়িনি ব'লেই কাঁচা আছি—দুদিনে শিখে নেব, ছেলের বুদ্ধির ধার আছে।

স্বয়ং ডি এল রায়ের অনুরোধ, ওরা রাজি হ'ল, তবে রফা হ'ল: ইংরাজিতে যদি বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করি তবে থার্ড ক্লাসে রাখবেন না ফোর্থ ক্লাসে নাবিয়ে দেবেন।

কিন্তু বিপদ এল সাংঘাতিক—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা দিতে হয় জানতাম না। তাই হাফ ইয়ারলির কিছু আগেই ভরতি হয়েছিলাম, পরে হ'লে সময় পেতাম শিখতে।

ক্লাসে গিয়ে কান্না পেত। আমার বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদের একটু দয়া হ'ল। সে ছিল ফার্ষ্ট বয়। ডেকে বসাল তার পাশে। ব'সে দেখি—ওমা, কোথায় সে আর কোথায় আমি। সে পড়ছে ডিকেন্সের পিকুইক পেপার্স! আমি সবে রবিন্সন ক্রুসো কোনমতে শেষ করেছি।

মাথা ঘুরে গেল। হাফ ইয়ারলিতে বাংলায় খুব ভালো নম্বর পেলাম। আর সব বিষয়েও পাশ করলাম কোনোমতে। কিন্তু ইংরাজিতে একেবারে একশোর মধ্যে আঠারো। পাবো না? বেশ মনে আছে—একটা প্রশ্ন ছিল এই এই passage-গুলির মানে লিখ ইংরাজিতে। তার মধ্যে একটি passage এখনো ভুলিনি: "Men like you are gems of England." আমি মানে লিখলাম: Men like you are stars of England." এর পরে আঠারো পাবো না কি আটাত্তর পাবো? ওদিকে ক্ষিতীশ পেল আশি।

দারুণ অভিমানী পুত্রের বাড়ি ফিরে সে কী কান্না! কবি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে হো হো ক'রে হেসে বললেন: "তা ইংরিজি তো তুই পড়িসই নি কোনো দিন —একশোর মধ্যে ক্ষিতীশের মতন আশি পাবি কী ক'রে?"

আমি ফুপিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম কোনোমতে "কিন্তু তা ব'লে মোটে আঠারো?"

কবি বললেন: "হ'লই বা। তুই তো ইংরেজ নোস। ইংরেজরা কি বাংলা ভাষা জানে? জানে ইংরিজি। তুই বাঙালির ছেলে বাংলা ভাষাটা তো খুব ভালো ক'রেই শিখেছিস, তবে?"

একটু সান্ত্বনা পেলাম, তবু ঘাড় নেড়ে বললাম: "উঁহুঃ।"

কবি হেসে বললেন: "আচ্ছা উঁহুঃ উঁহুঃ-ই সই। তবে শেখ্ ভালো করে ইংরিজি আমি নিজে পড়াব।"

বার্ষিকীর শেষে শুধু ইংরাজিতে নয় অন্য সব বিষয়েই এত ভালো নম্বর পেলাম যে ক্ষিতীশের পরেই স্থান পেলাম। আমার নাম হল "সেকেণ্ড বয়"। কিন্তু ক্ষিতীশকে কিছুতেই হারাতে পারি নি। ফার্স্ট বয় ও হবেই হবে প্রতি পরীক্ষায়। কবি প্রবোধ দিয়ে বললেন: "তা হোক - তুই তো গানে ফার্স্ট—ইস্কুলে কে আছে তোর মতন গাইতে পারে শুনি?"

"কিন্তু গান তো আর একটা subject নয়?"

"কিন্তু একটা মস্ত object তো—" ব'লেই সেই দিলদরিয়া অট্টহাসি।

অমন প্রাণখোলা হাসি কি আর কখনো শুনব এজীবনে? জীবনে হাসি যে কত বড় সম্পদ আর কার কাছে কবে জেনেছি এমন ক'রে?

* * * *

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে ধরল ইংরিজির নেশা। কিন্তু অঙ্ক ভালো লাগে না কিছুতেই কোনোমতে পঞ্চাশ পেলাম বুঝি মধ্যবার্ষিকীতে। ক্ষিতীশ পেল নব্বইয়ের ওপর নম্বর।

কবি বললেন: "ক্ষিতীশের মতনই অঙ্ক শেখাই চাই। ইংরিজি তোর হবেই— ভাষায় সিদ্ধি জানিস তোর বংশগত" বলেই সেই সরল উদার গর্ব—কোথাও ঢাকাঢাকি নেই সে গর্বে।

"অঙ্কে আরো ভালো হ'তে পারিস না কেন?"

"ভালো লাগে না যে।"

"না না অঙ্কটা শেখাই চাই। আমি অঙ্কে বরাবরই কাঁচা ছিলাম—ও ঠিক না। সায়েন্স শিখতেই হবে তোকে। নৈলে বুদ্ধি খোলে না।"

সব বিষয়েই তাঁর ছিল এই ধরণের ভেবে চিন্তে গ'ড়ে তোলা মতামত। আর শিক্ষা দেবার সময়ে ভাবতেন না তিনি ভুলেও চাকরির কথা, ভাবতেন শিক্ষার কথা পৌরুষের কথা, চরিত্রের সম্পূর্ণতার কথা। আজো মনে পড়ে আমার ইংরাজি শিক্ষার সুবিধা হবে, ব'লে "Lesson in English" ব'লে একটি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রণয়ন করলেন তিন ভাগে। ইচ্ছা আছে পরে এ বইটি ফের ছাপব। কারণ শেখাবার পদ্ধতিটি ছিল তাঁর বড় সুন্দর। নৈলে—তাঁর বংশ নিয়ে গৌরব করা সত্ত্বেও আমি অত শীঘ্র ইংরাজি শিখতে পারতাম না কখনই।

তাঁর দেহাবসানের পরে শুধু তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্যেই আমি অঙ্কে মন দিই। কারণ অঙ্ক আমার বরাবরই খারাপ লাগত—শুধু তিনি চাইতেন ব'লেই শিখেছিলাম। পরীক্ষার ফল খুব ভালোই হ'ল। তবে সে কথা থাক। পরীক্ষায় ভালো ছেলে ছিলাম ব'লে যে একদিন গর্ব করতাম এজন্যে আজ আসে সত্যিই লজ্জা। কারণ যে-মানুষ ভক্তির স্বাদ পেয়েছে সেও কিনা এই অতি অসার পরীক্ষা পাশের গৌরব করতে পারে। তবু করতাম—নিছক অহঙ্কারে। স্বভাব যায় না ম'লে। কিন্তু যা বলবার জন্যে এ লেখা।

* * * *

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠলাম—অর্থাৎ বয়স আমার যখন পনের তখন আমি নতুন ক'রে সংস্কৃতে মন দিলাম। কবির খুব উৎসাহ ছিল। ওঁর বরাবরই ইচ্ছা ছিল সংস্কৃতই আমি optional নিই। কিন্তু আমি নিয়েছিলাম অঙ্ক ও ইতিহাস। টেস্ট পরীক্ষার পরে আমি সংস্কৃত optional নিলাম—ম্যাট্রিকে সংস্কৃতে বেশি নম্বর পাব এই ভরসায়। পেলামও—কারণ সংস্কৃতে আমি দ্রুত উন্নতি করলাম তিন মাসেই এমন শিখে ফেললাম যে যা যা অনুবাদ করতে দিয়েছিল (ইংরাজি থেকে সংস্কৃত) তা গদ্যে ক'রে ফের অনুষ্টুপে অনুবাদ করেছিলাম। দুঃখ এই—যাঁর সবচেয়ে

আনন্দ হ'ত আমার সংস্কৃতে এতখানি কৃতিত্ব অর্জন করার জন্যে তিনি তখন এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

তাঁর দেহাবসানের পরে "সুরধাম" ভাড়া দেওয়া হ'ল। আমি ও মায়া গেলাম থিয়েটার রোডে আমার দাদামহাশয় ও দিদিমার তত্ত্বাবধানে।

এক একটি ক'রে পরীক্ষা পাশ করতাম আর গান শিখতাম। কারণ গানে প্রীতি জন্মেছিল অহৈতুকী। কিন্তু যতই গান শিখতাম ততই মনে পড়ত তাঁর সেই একদিনের কথা যখন বলেছিলেন তিনি দুঃখ ক'রে: "ওরে একদিন বুঝবি কী সব গান আমি বেঁধে গেলাম।"

সত্যি। কারণ এ তো আমি জানি আমার চিত্ত দিনে দিনে কতখানি সমৃদ্ধিলাভ করেছিল তাঁর গানের প্রভাবে, সুরের আলোয়। নৈলে আমি আর পাঁচজনের মতই হয়ত আজ শুধু ড্রয়িংরুম সঙ্গীত গাইতাম কিম্বা ওস্তাদি গান। কিন্তু তিনি যে সব গান বেঁধেছিলেন তাদের মধ্যে শতাধিক গান আমার মুখস্থ ছিল। প্রায়ই গাইতাম সে সব গান। আর তখন বুঝতাম কতবড় সুরেলা কবি ও ভক্ত ছিলেন তিনি।

*

সঙ্গে সঙ্গে কেবল একটা কথা মনে হয় আজ। কথাটা হয়ত সর্বৈব ভুল। ত ভাবতে ভালো লাগে যে শেষ জীবনে ভক্তির দিকে তাঁর স্বভাবের টান হয়ত একটু প্রবল হ'য়ে থাকবে আমার পৌত্তলিক কৃষ্ণভক্তি দেখে। এ-পৌত্তলিকতায়ও তাঁর কাছে কী ভক্তিরই সমর্থন পেতাম যখন তিনি গাইতেন তাঁর ব্রজভাষায় রচিত কৃষ্ণস্তব সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে:

গিরি গোবর্ধন গোকুলচারী   যমুনা তীর নিকুঞ্জ বিহারী।
শ্যাম সুঠাম কিশোর ত্রিভঙ্গিম   চিত্তবিনোদন কারী॥
পীতাম্বর বনপুষ্প বিভূষণ   চন্দনচর্চিত মুরলীধারী।
যিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন   উছলত যমুনা বারি॥
নূপুর শিঞ্জিত নৃত্য বিমোহন   কপট চপল চতুরালী।
প্রেম নিমীলিত নয়ন বিলোল   কদম্বতলে বনমালী॥
নন্দকি নন্দন মাই যশোদা   নয়নাঞ্জন ব্রজ-বাল-পিয়ারী।
যিসি লাগি থি কুল ছোড়ি   রাধা আওল সব ব্রজনারী॥

কংসবিনাশক মথুরাপতি জয় নিখিল-ভকত-জন-শরণ।
দুর্জন-পীড়ক, সজ্জন-পালক সুরনর বন্দিত চরণ ॥
জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভব ভয়হারী।
জয় কেশব মধুসূদন জয় গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারি ॥

মনে পড়ে আজো কত খুঁটিনাটি কথা—কী ভাবে একটু একটু ক'রে ভক্তির জোয়ার জেগে উঠছিল তাঁর বিচারপ্রবণ মনের বন্ধ্যা বালুচরে। তাই না এ গানটি গাইতে গাইতে তাঁর সুগৌর মুখ উঠত রাঙা হ'য়ে আর বুদ্ধিদৃপ্ত চোখদুটি আসত শরণাগতির আবির্ভাবে কোমল হ'য়ে যখন তিনি গাইতেন উচ্ছ্বসিত আবেগে: "জয় নারায়ণ শ্রীশ জনার্দন জয় পরমেশ্বর ভবভয়হারী!" সে কী অপরূপ দৃশ্য!

ভারতের শ্রেষ্ঠ মনের উদ্ধত বিচারের তলায় যে প্রায়ই এই ভক্তির তৃষ্ণা অন্তঃশীলা ধারায় বয় এ আমি উপলব্ধি করেছিলাম প্রথম—তাঁর ও মেশোমশায়ের পরিবর্তন দেখে, পরে আর একজন অতি মহৎ অথচ সংশয়ী মানুষকে চিনে। তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাচিত্রী শরৎচন্দ্র। আজও ভুলতে পারি নি তাঁর একদিনের কথা। একটি বাউল গেয়ে চ'লেছিল একতারা বাজিয়ে সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে। কোথায় মনে নেই—তবে সম্ভবত তাঁর গ্রামেই—শাম্‌তাবেড়ে। শরৎচন্দ্র নানা কথা কইছিলেন নানা মনীষীকে নিয়ে, সংশয় বিচার তর্ক এসবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। নাস্তিক তীক্ষ্ণধী বার্টাণ্ড রাসেলের কথাও হ'ল যাঁর খরশান বুদ্ধির দীপ্তিতে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মুগ্ধ হ'তেন। কিন্তু সেদিন কি হ'ল, হঠাৎ ঐ বৈরাগী বাউলের গান শুনে তিনি আমাকে বলেছিলেন (এ একটুও অত্যুক্তি নয়, বিশ্বাস করবেন) "মণ্টু! বুদ্ধি বিচার প্রতিভা জানাশোনার পথে যত আনন্দ পেয়েছি সব আমি একজোটে বিকিয়ে দিতে রাজি যদি তার বদলে ঐ বৈরিগির ভক্তি পাই।"

ভাগবতের একটি গল্প মনে পড়ল। কৃষ্ণ বলরাম ও গোপ বালকেরা যমুনাতটে এক উপবনে ক্ষুধিত। কৃষ্ণ গোপবালকদের পাঠালেন কাছেই একদল ব্রাহ্মণের কাছে যাঁরা খুব ধুমধাম ক'রে "আঙ্গিরস" যজ্ঞ করছিলেন। তাঁরা ছিলেন "বহুজ্ঞ", কাজেই গোপবালকদের কাছে কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত শুনে কানেই তুললেন না। শিশুদূতগুলি ফিরে এসে কৃষ্ণকে জানালো দুঃখের কথা। তখন কৃষ্ণ হেসে বললেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নী-মণ্ডলীর কাছে আবেদন জানাতে। ব্রাহ্মণপত্নীরা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অন্নপ্রার্থী শুনে গুরুজনদের বাধা বারণ ডিঙিয়ে ভূরিভোজ নিয়ে ছুটে এলেন 'সাগরমুখী নদীর মতন।" বললেন:

"তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্‌গতিররিন্দম, তদ্বিধেহি।"
চরণে তোমার শরণার্থিনী প্রার্থে করুণাময়!— •
তোমা বিনা আর কোনো গতি যেন তাহাদের নাহি রয়।

তখন "দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্"—চৈতন্য হ'ল "ক্রিয়াদক্ষ বহুজ্ঞ" মহাপুরুষদের, জাগল আত্মধিক্কার:

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"
ধিক্ তাহাদের বিদ্যায়, কুলে, বহুজ্ঞতায়, ব্রতে, বিধানে
চিনিল না যারা কৃষ্ণে, ভক্তি চাহিল না হায় দুরভিমানে!

কিন্তু কী এ ভক্তি যা "জন্মকোটি সুকৃতৈর্নলভ্যতে"—কোটি জন্মের সুকৃতিরও অলভ্য? কে বলবে—এক ভক্ত ছাড়া?

গত বৎসর এক রিক্ত নিঃস্ব হিন্দুস্থানি কবি আমারি ঘরে এসে শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসবে গেয়েছিলেন তাঁর একটি স্বরচিত অপূর্ব গান:

উন শরদচন্দ্রকী শোভাকা ক্যা অর্থ—চকোরণকো পূছো।
ঘন গর্জ গর্জ ক্যা কহতা হৈ—যহ প্যারে মোরণকো পূছো॥
মকরন্দ ফুলোকা কৈসা হৈ—যহ বার্তে ভৃঙ্গোসে পূছো।
ক্যোঁ দীপশিখা পর্ জ্বলতে হৈঁ—যহ রাহ পতঙ্গোসে পূছো॥
ক্যোঁ অগাধ জলমে তরতী হৈ—যহ বাত মছলিযোসে পূছো।
ভকতীকী রঙ্গৎ কৈসী হৈ—যহ বার্তে ভক্তনকো পূছো॥

How throbs the heart of beauty of the moon?
Ask the *chakore* who loves her loveliness.
What message sends the mystic thunder-cloud?
Ask the plumed peacock dancing to her grace.

What is the honeyed secret of the bloom?
Ask of the bee who woos her virgin deeps.
How plumb the spell and mystery of the flame?
The moth ask who for her lone vigil keeps.

How sleeps the main beyond the billows' surge ?
The fish ask who into her bosom dives.
What is devotion's soul of ecstacy ?
Ask the devotee who God ever lives.

সমাপ্ত